অপরাজিতা রাধারাণী

ড. বাসন্তী দেব (মজুমদার)



পারুল প্রকাশনী
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ২০০০

প্রচ্ছদ : শিবেন্দু সরকার

বর্ণ সংস্থাপন : পারুল প্রকাশনী

পারুল প্রকাশনীর পক্ষে ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে
রত্না সাহা কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত

পূজনীয় মা-বাবা এবং
আমার বড়ো আদরের নাতি-নাতনি
প্রকুন, প্রমা ও প্রাপ্তি মজুমদারকে
অনেক অনেক ভালোবাসা সহ—

দু-কথা

রাধারাণী দেবীর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে শ্রীমতী বাসন্তী দেব (মজুমদার) যখন গবেষণা করার উৎসাহ আমার কাছে প্রকাশ করলেন, আমার মনে স্বভাবতই তাঁর প্রতি স্বজন-সুলভ প্রীতি জন্মালো, কেননা আমি নিজেও রাধারাণী দেবীর জীবন ও সাহিত্যিকর্মের একজন মুগ্ধ ভক্ত। কিন্তু নিজে তাঁর সন্তান হওয়ার প্রাকৃতিক কারণে তাঁকে সদাসর্বদা কাছাকাছি পাবার ফলে তাঁকে এত সহজে মেনে নিয়েছিলাম যে, নিজের কলমে তাঁর অসামান্য মেধার ও ক্ষমতার যথাযথ অ্যাকাডেমিক মূল্যায়ন করার কথা চিন্তাতেও আসেনি। এখন অত্যন্ত গভীর অনুশোচনা হয় যখন লেখিকা ও অসামান্যা চিন্তাবিদ রাধারাণী দেবীর জীবন ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে মনে নানা প্রশ্ন ওঠে, অথচ উত্তর দেবার মানুষটি আর চোখের সামনে নেই। সংসারের মা জননীর সংকীর্ণ আলোতেই শুধু তাঁকে চিনেছি, বাংলা সাহিত্যের এই উজ্জ্বল রত্নটিকে জানতে চেষ্টাও করিনি। এত কাছাকাছি থেকেও তাঁকে, তাঁর কাজকে, তাঁর সময়কে ভালো করে চেনবার জানবার শোনার সুযোগ হেলায় হারিয়েছি বলে আত্মসমালোচনার শেষ নেই আমার অন্তরে। আমার ভিতরে এই একই আপশোশ আছে আমার পিতা নরেন্দ্র দেবের সম্পর্কেও। কাছে ছিলাম বলেই তাঁর সাহিত্যকৃতির অসামান্য বিস্তার ও বৈচিত্র্য বিষয়ে আমি ঠিক একই রকমের উদাসীন ছিলাম। যত দিন যাচ্ছে ততই তাঁকেও নতুন করে আবিষ্কার করছি। এখন বুঝতে পারি নানা ভাবেই জীবনে ও সাহিত্যে, জ্ঞানে ও বিদ্যার উৎসাহে তাঁর মুক্ত মানসিকতার কারণে তিনি তাঁর সমকালের থেকে অনেকখানি এগিয়ে ছিলেন। তাঁকে নিয়ে এখনও কোনো কাজ হয়েছে বলে জানি না, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর গুরুত্ব হয়তো এখনও ধরা পড়েনি। কবি রাধারাণী দেবী এবং কবি অপরাজিতা দেবীকে নিয়ে যদিও তুলনামূলক একটি পি এইচ ডি গবেষণার কাজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে সম্পূর্ণ হয়েছে কয়েক বছর আগে। কিন্তু হৃষিতা গুপ্ত বক্সীর কাজটি বই হয়ে বেরিয়েছে বলে জানি না। সেই কাজটির লক্ষ্য বাসন্তীর কাজের থেকে আলাদা।

শ্রীমতী বাসন্তী দেব যখন রাধারাণী দেবীকে নিয়ে কাজ করার জন্য বইপত্রের অসুবিধার কথা আমাকে জানালেন, তখন আমার সাধ্যমত বইপত্র দিয়ে তাঁকে যৎসামান্য সাহায্য করেছি মাত্র, তার চেয়ে বেশি কোনো সহায়তা তিনি তাঁর গবেষণা কর্মের জন্য

আমার কাছে প্রার্থনা করেননি। তাঁর বইটিই তাঁর কাজের কথা বলবে, আমার এই বিষয়ে কিছু বলা সাজে না। শুধু আমি আশা করবো যে ভবিষ্যতে যাঁরা রাধারাণী সম্পর্কে কিছু কাজ করতে চাইবেন, তাঁকে জানতে, বুঝতে চাইবেন, শ্রীমতী বাসন্তী দেবের এই শ্রমসাধিত গবেষণা গ্রন্থটি তাঁদের প্রয়োজনে লাগবে। কাজটি ভালোবেসে শুরু ও সম্পূর্ণ কবার জন্য বাসন্তীকে আমার অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

নবনীতা দেব সেন

ভালো-বাসা

১২/৪/০৭

প্রসঙ্গ রাধারাণী দেবী

সাধারণভাবে বলা যায়, A poem is produced by a poet, takes its subject matter from the universe of men, things and events and is addressed to, or made available to, an audience of hearers or readers. একথা যে-কোনো কালের, কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কথাটা সৃজন সাহিত্যের অন্য শাখা সম্পর্কেও কমবেশী প্রযোজ্য, পুরুষ বা নারীর রচনার ক্ষেত্রেও। তবে, যুগ বদলায়, কবিতা বা সাহিত্যের রীতিনীতি বদলায়, পাঠক-পাঠিকার প্রত্যাশার ধাঁচটাও বদলে বদলে যায়। কিন্তু তবুও 'হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে' (রবীন্দ্রনাথ)। অনুভূতি প্রশান্তির সরোবরে সুস্থির হয়ে জেগে ওঠে, জাগায়, আর তার অস্থির ভেতরে যদি কালজ্ঞান থেকে যায় তা, সেই কবিতা, সংবেদী পাঠকের হৃদয়ে কড়ানাড়া দেবেই। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন সাহিত্য-রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকহৃদয়ে যেমন সুবিমল আনন্দ সৃষ্টি করা যায়, তেমনি আঘাত দেওয়া যায় বহু কুসংস্কারকে। রাধারাণী দেবী এই দুটি দিকেই ছিলেন মনোযোগী। প্রথম চৌধুরীর মতো রাধারাণীও বিশ্বাস করতেন মানুষের দর্শন বিজ্ঞান ধর্মনীতি অনুরাগ বিরাগ আশা নৈরাশ্য তার অন্তরের সত্য ও স্বপ্ন এ সবের সমবায়ে জন্ম হয় সাহিত্যের। কবিতা ও কথাসাহিত্য এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিবার স্বাক্ষর রেখেছেন। সর্বোপরি প্রবন্ধ ও বিতর্ক। নারী লেখিকা এই বিশেষণটি আমার পছন্দ নয়। কিন্তু এটাও ঠিক, কোনো কোনো লেখিকা নারী মনোভাবটি, তাঁর সর্বংসহা কোমল ভাবটি ফোটাতে অধিকতর মনোযোগী হন।

উনিশ শতকে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন, ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, শিক্ষিত মানসিকতার বিকাশের পথ ধরেই নারী চেতনার জাগরণ ঘটে। পুরুষের কবিতায় এল নারীর প্রতি প্রেম উদ্বেলিত সম্ভ্রমময় দৃষ্টি, কখনও নারীমুক্তির স্বপ্ন। বিহারীলাল তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০) কাব্যে নারীকে স্থাপন করলেন সৌন্দর্যস্বর্গে, রবীন্দ্রনাথের উর্বশী কল্পনায় যা আরও বিশিষ্টতায় মণ্ডিত। কৌতুকাবহ কথা হল—নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভুবনমোহিনী দেবী এই ছদ্মনামে কবিতা লিখে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন।

উনিশ শতকের সপ্তম দশকে কৃষ্ণকামিনী দাসী, কৈলাসবাসিনী দেবী, অন্নদাসুন্দরী দেবী, ইন্দুমতী দাসী, নবীনকালী দেবী, কামিনীসুন্দরী দাসী, এমনকি মুসলমান নারী

ফৈজুন্নিসা চৌধুরাণীর কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ বেশ চমকে দেয়। তারপর গার্হস্থ্য ও কাব্যসাধনায় যুগপৎ ব্রতী হন অনেকে—প্রসন্নময়ী দেবী। স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রমীলা নাগ, সরোজকুমারী দেবী, বিনয় কুমারী ধর, সরলাবালা সরকার প্রভৃতি। এঁরা অনেকেই ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে পরিচিত কিন্তু তাঁদের কবিতার গড়পড়তা বিষয়—হিন্দু কুলবধূর মর্মকথা, বৈধব্যযন্ত্রণা স্বামিভক্তি কিংবা পারিবারিক জীবন অথবা প্রকৃতি বন্দনা। কেউ কেউ অবশ্য প্রেম ও বিষাদকে কাব্যময় ভাষায় ব্যক্ত করতে এগোন। ভারতী পর্বে আবির্ভূত হলেন, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, যাঁরা অবশ্য কবিতা নয়, কথাসাহিত্যেই মনোযোগী। কিন্তু পাশ্চাত্যপন্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবর্তে তাঁরা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমা প্রচারে, হিন্দু নারীর জীবনাদর্শ উপস্থাপনায় নিঃশেষিত হয়েছেন। ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিতা দুই লেখিকা, শান্তা দেবী ও সীতা দেবী চেষ্টা করলেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাত কীভাবে শহরের নারী জীবনকে আবর্ত্ত সংকুল করে তোলে তা দেখাতে। আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে নারীর চিদাকাশ—'রামায়ণ-মহাভারতের সীতা সাবিত্রী বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজে অচল। বাইশ পঁচিশ-আঠাশ বছরের মেয়ে চাক্‌রেরা সীতা সাবিত্রীর কাহিনি-মাফিক জীবন চালাতে পারে না।....বঙ্গ সমাজে এ এক বিপুল যুগান্তর।' (বিনয় সরকারের বৈঠকে, ২য় ভাগ)

'ভারতী' গোষ্ঠীর পুরুষ লেখকরা পতিতা নারী, দেহাশ্রিত প্রেম, সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেম নিয়ে লেখা শুরু করলেন, যদিও তাতে রোমান্সের ভাবোচ্ছ্বাসই বেশী, এই রোমান্স প্রবণতার সুর মেলাতে নারীর ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। তবে নারীচেতনাকে এরা এগিয়ে দিলেন কল্লোল কালের দিকে। শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ এই চেতনায় সাহস সঞ্চার করল।

কল্লোলের অস্ফুট বিকাশ ফোর আর্টস ক্লাবে, যেখানে নারীপুরুষ সদস্য ছিল ; এর আগে মানতে ক্লাবেও নারীর প্রবেশাধিকার ছিল। ফোর আর্টস ক্লাবের একটা লক্ষ্য ছিল পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে একটি আধুনিক রুচিসঙ্গত ও মনোভাবসম্পন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা। সুনীতি দেবী, নিরুপমা দাশগুপ্তা, উমা দাশগুপ্তা প্রমুখের নাম করা যায় এ প্রসঙ্গে। কল্লোলে গল্প কবিতা লিখেছেন যে মেয়েরা তাঁরা হলেন—সুনীতি দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, রাধারাণী দেবী (দত্ত), চামেলী প্রভা ঘোষ, নিরুপমা দেবী, কল্যাণী ঘোষ, কেতকী দেবী, সান্ত্বনা বসাক, নৃসিংহদাসী দেবী, অহল্যা গুপ্ত, সুরুচিবালা রায়, সরোজকুমারী দেবী, মিনতি দেবী, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়, নীলিমা বসু, শান্তা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রীতি সেন, বিমলা দেবী, মায়া বসু, উমা মিত্র, অদিতি দেবী, সুরমা দেবী, অনিন্দিতা দেবী, অমিয়া চৌধুরী, রাণী সুরুচিবালা চৌধুরাণী, তারা মুখোপাধ্যায়, মায়া দেবী, কল্যাণী পাল ইত্যাদি। নরেন্দ্র দেবও কল্লোলে লিখতেন, যিনি পরবর্তী কালে

রাধারাণী দেবীকে বিবাহ করেন। নারী লেখিকার যেন প্লাবন দেখা গেল 'কল্লোল'-এর পাতায়। যদিও স্বাভাবিক ভাবেই এদের অধিকাংশ বিস্মৃতির মধ্যে চলে গেছেন। কিন্তু বেশ কয়েকজন তাঁদের সমুজ্জ্বল প্রতিভা নিয়ে আজও আলোচ্য হয়ে আছেন।

কল্লোলে রাধারাণী দেবী যেসব লেখা লিখেছেন তা হল—পুরুষ (গল্প) (পৌষ, ১৩৩১), নারী (কথিকা) (আষাঢ়, ১৩৩৩), মা (গল্প) (কার্তিক, ১৩৩৪), তোমার ঐ ঝরণাতলার নির্জনে (কবিতা) (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫), পাতানো মা (গল্প) (শ্রাবণ, ১৩৩৫), প্রেম প্রশস্তি (কবিতা) (পৌষ, ১৩৩৫), ফাল্গুন মাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে (কবিতা) (ফাল্গুন, ১৩৩৫), প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নের রূপ-মাধুর্য (সমালোচনা) (বৈশাখ, ১৩৩৬) প্রভৃতি। কালি কলম বা প্রগতিতে তিনি লিখেছিলেন কি না বলতে পারছি না। তবে শ্লীলতা ও অশ্লীলতা নিয়ে বিচিত্রা ভবনে যে সভা হয়েছিল তাতে নব্য পন্থীদের নেতৃত্ব দেন তিনি। অপরাজিতা দেবী এই ছদ্ম নামে 'বুকের বীণা' (১৯৩০) লিখে রীতিমত দুঃসাহস ও আত্মদর্পিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। সংস্কৃত, ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। মাত্র বারো বছর বয়সে সেজদার হাতে লেখা পত্রিকা 'সুপথ'-এ তাঁর সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত। প্রথম কবিতা প্রকাশ—'মানসী ও মর্মবাণী'তে। তাঁর কবিতা বেরিয়েছে কল্লোল ছাড়াও ভারতবর্ষ, উত্তরা, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায়। তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বনবিহগী'র চিত্রাঙ্কন করেন অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু, আর প্রুফ দেখে দেন রাজশেখর বসু। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বাংলা কাব্য সংকলন 'কাব্যদীপালি' প্রকাশ করেন ১৯২৭-এ। এই প্রতিভাময়ী কবিতার জগতে নিয়ে আসেন বিদ্রোহের দ্বিধাহীন সুর, শব্দে চিত্রকল্পে প্রকাশ প্রকাশ পায় দুঃসাহসিকতা। ভালোবাসার সুরই তাঁর কবিতায় মৌল সুর বলে মনে হয়। অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখতেন পদ্যে, রবীন্দ্র উত্তরও ছিল পদ্যে। রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি আমরা পাব 'প্রহাসিনী' কাব্যগ্রন্থে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ছিল তাঁদের সুদীর্ঘ পরিচয়। শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' তিনিই সম্পূর্ণ করেন। ছোটদের জন্য লিখেছেন—'নীতি ও গল্প', এবং 'গল্পের আলপনা', স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন বাংলা গল্পের সংকলন—'কথা শিল্প'। অনেকেই জানেন না যে, বিয়ের মন্ত্রগুপ্তির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছিলেন তিনি 'মিলনের মন্ত্রমালা' নামে। এই বহুমুখী প্রাণোচ্ছলতা এবং সুদৃঢ় জীবন জিজ্ঞাসা দুঃখের বিষয় তেমন করে আলোচনার গুরুত্ব পায় না।

অত্যন্ত আনন্দের কথা মান্য শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বাসন্তী মজুমদার এই দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। বিদ্যাদান, সংসার নির্বাহ, অতিথিচর্যার ফাঁকে ফাঁকে তৈরি করেছেন এই অসামান্য গ্রন্থটি। তাতে রাধারাণী দেবীর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য জীবন যেমন যথোচিত গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি তাঁর কবিতা গল্প, প্রবন্ধ, সম্পাদিত গ্রন্থ, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অপ্রকাশিত রচনাবলীর মূল্যায়নও এসেছে। কোনো সমাজ ও

সাহিত্যের আবহে গড়ে উঠেছিল এই মনস্বিনীর মানসিকতা সেটিও তিনি উপস্থিত করেছেন আমাদের কাছে। রাধারাণীর ভাব প্রকাশ ছিল সরল সহজ, কখনো বা আটপৌরে, অবশ্য প্রবন্ধে বা বিতর্কে তাঁর পৌরুষ সঞ্চারিত হয়েছে ভাষার মধ্যে। সংলাপ আশ্রিত, সম্বোধিত ভঙ্গিমা তাঁর কবিতাকে দিয়েছে প্রাণদীপ্তি। সনেট রচনার কঠিন নিবন্ধ রসপ্রকাশে যেমন তেমনি গীতিকবিতার নির্ঝরে তিনি অচিরেই বাংলা আধুনিক সাহিত্যে স্থান করে নেন। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি ভারতী ও কল্লোল পর্বের পূর্ববর্ত্তী নারী রচয়িতাদের এবং চল্লিশ ও পঞ্চাশ ষাটের নারী রচয়িতাদের মধ্যবর্ত্তী পর্বেই রাধারাণীর প্রোজ্জ্বল অবস্থিতি। শ্রীযুক্তা মজুমদারও সেই কথা বলেন। রাধারাণী দেবীর এই সর্বতোমুখী উপস্থাপনা মারফত তিনি একটি বহুদিনের প্রতীক্ষিত কর্তব্য পালন করলেন। এর জন্য তিনি সহৃদয় সমাজের কাছে সাধুবাদ পাবেন। বাসন্তী দেবীর প্রকাশরীতি অত্যন্ত সহজ সরল, তাই হৃদয়ঙ্গমে অনায়াস হওয়া যায়। আর একটি কথা, আলোচ্য প্রতিভাময়ী রাধারাণী এবং আলোচক পরিশ্রমী বাসন্তী দুজনেরই বালিকাজীবন কাটে কোচবিহারে। পরবর্তী পর্যায়ে কলকাতা তাঁদের বিকাশভূমি। অতএব কোচবিহারের মানুষও এ ব্যাপারে খুশী হবেন। বাসন্তী দেবীর এটি প্রথম বিস্তৃত রচনা, সমগ্র সারস্বত সমাজের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই, তাঁর লেখনী বহুবিস্তৃত হোক, তিনি এরূপ অনালোচ্য কিন্তু আলোচনাযোগ্য ভুবনে আমাদের পথ প্রদর্শন করান এই কামনা করি।

নিবেদন

রাধারাণী দেবী (৩০/১১/১৯০৩—৯/৯/১৯৮৯) রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা সাহিত্যজগতের এক উল্লেখ্যযোগ্য উজ্জ্বল কবিব্যক্তিত্ব। কিন্তু এ কথা তো সত্যি যে — বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অসংখ্য পুরুষ সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটলেও — সে তুলনায় নারী সাহিত্যিকের সংখ্যা বড় অল্প। আসলে গৃহকোণে আবদ্ধ থাকায় নারী চেতনার ততটা প্রসার ঘটেনি। নারীর লেখার সুযোগও বড় একটা আসেনি। স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতি সমসাময়িক লেখিকা ও কবিবৃন্দ অতীত ইতিহাস ও ব্যক্তিগত জীবন ক্ষেত্রের সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেছেন। তাঁরা নারীজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবন-জটিলতা, সমস্যা-সংগ্রাম, ব্যর্থতা বেদনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারেন নি। সেদিক থেকে নারী জীবনের অন্তর্লীন সমস্যার প্রতি যে সকল লেখিকা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন — রাধারাণী দেবী তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য রূপেই অন্যতম।

বাঙালী নারী আজও যে আদ্যিকালের মতো গৃহবন্দিনী, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে পদে পদে করতে হয় লড়াই — তা রাধারাণী প্রকাশ করেছেন নিজের ভাষায়। এবং এ ভাষা তাঁর নিজের সৃষ্টি। এ ভাষার মধ্যে আছে জীবনের নির্মোহ বর্ণনা, গভীর অন্তর্জ্বালা, তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও করুণ বেদনা। তিনি এক আশ্চর্য নারী-সংগ্রামের উত্তরাধিকারী। বাঙালী মেয়েদের জন্য রেখে গেছেন স্বাধীকার অর্জনের উত্তরাধিকার। তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সমাজ-সচেতন মানসিকতা আর চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উপস্থিতি। শুধু তাই নয়, কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-সমালোচনা-কিশোরপাঠ্য রচনা—সাহিত্যের নানা শাখায় যেমন তাঁর ছিল অনায়াস সৃষ্টিসুখের উল্লাস, তেমনি 'কলাকৈবল্যবাদে' (Art for Art's sake) আত্মসমর্পিত না হয়ে — মানবমনের, (বিশেষ করে নারীহৃদয়ের!) অন্তর্লীন জিজ্ঞাসা ও সমস্যার বিষয়টিও আদৌ উপেক্ষিত হয় নি; বরং যথাযথ প্রাধান্যে তা পাঠকের কাছে আকর্ষক ও কৌতূহলী বিষয় হয়ে উঠেছে। পাঠক-পাঠিকা তাঁর রচনা পাঠে, অনুমান করি, অধর ওষ্ঠে ফুটিয়ে তুলেছেন মৃদু হাসির ঢেউ ; আর একই সঙ্গে কপালে ভ্রু-কুঞ্চনের সবিস্ময় চিহ্ন। একুশ শতকের শুরুতে পাঠকের অনুরূপ অনুভূতি — কবির কাব্য নির্মাণের ক্ষমতার স্বীকৃতি বৈ কি!

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরীর মত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ছিল তাঁর সাহিত্যিক অন্তরঙ্গতা। এখনও, তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র কয়েকটি বছর অতিক্রান্ত। অথচ কি আশ্চর্য, বিশেষ করে বাংলা পুস্তক সংগ্রহের কেন্দ্রভূমি — কলেজ স্ট্রীটে বা অন্যত্রও তাঁর একখানি গ্রন্থও লভ্য নয়। এ বেদনা সত্যিই বিচলিত করে আমাদের, লজ্জাবোধ করি আমরা। সুতরাং, রাধারাণী

দেবীর সাহিত্যকর্মের, তাঁর রচনার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং মূল্যায়নের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই বাংলা সাহিত্যের এই উপেক্ষিত দিকটার প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাতের এই সনিষ্ঠ প্রয়াস।

এই আলোচনাকে ভূমিকা সহ মোট সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। ক্রম অনুযায়ী — ভূমিকা, জীবনী, সমকালীন সমাজ পরিবেশ, বাংলার মহিলা কবি, রচনার শ্রেণীবিভাগ এবং সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। সর্বশেষে অধ্যায় — সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহার — বলেই চিহ্নিত হয়েছে।

প্রতি অধ্যায়ের আলোচনাতেও অবশ্যই আবার নানা উপবিভাগে বিষয়কে বিস্তারিত করা হয়েছে। সমসাময়িক লেখক-কবি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা ও বিচারও এখানে আছে। অনেক আপাততুচ্ছ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয় এই সকল — উপবিভাগে যতটা সম্ভব যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে ব্যাখ্যাও হয়েছে। এবং বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্যও নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও পত্র-পত্রিকার। সে সকল পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থ ইত্যাদির নাম এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা পরবর্তী পর্যায়ে যথানিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও প্রতি অধ্যায়ের শেষে সেই অধ্যায়ে ব্যবহৃত পুস্তক ও রচনাসমূহের নামোল্লেখ করা হয়েছে।

এ আলোচনায় প্রথম উৎসাহী হই আমাদের পারিবারিক প্রিয়জন ড. রবিন পালের অনুপ্রেরণায়। বিদ্যোৎসাহী এই অন্তরঙ্গজনের উৎসাহদানের সঙ্গে যুক্ত হয় ড. নির্মল দাসের উদ্যমী অনুপ্রেরণা। ড. সুবোধ কুমার যশ আর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং পুত্রবৎ ড. সত্যেন দাসের কুণ্ঠাহীন সহায়তা ছাড়া কি এক পা-ও অগ্রসর হতে পারতাম! পারিবারিক অন্তরঙ্গজন শ্রীগৌরদাস সাহা এবং প্রতীপ মজুমদার-এর আন্তরিক ও সক্রিয় উৎসাহও এখানে অবশ্য উল্লেখ্য। এঁরা সকলেই বড় কাছের মানুষ। তবু সকৃতজ্ঞ চিত্তে এঁদের কথা স্মরণ করি — নিয়তই।

অবাক হবারই মত বিষয়! যখন বাজারে রাধারাণী দেবীর একটিও বই নেই, প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী সমূহে সব বই সহজলভ্য নয় — তখন একদিন কবিকন্যা নবনীতার বাড়ী যাই — এ বিষয়ে কথা বলতে। যেন বহুদিনের চেনা মানুষের মতই দীর্ঘ আলাপে (আড্ডা!) সহজ হয়ে উঠতে দেরি হয় না; অধিকাংশ বই-ই বাণ্ডিল বেঁধে হাতে তুলে দেন ; ফেরৎ পাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আর 'টুকরো চিঠির' একটি পুরোনো কপি বড় আদরে উপহার দেন। এও স্মরণীয় স্মৃতি। প্রসঙ্গত জানাই এই গ্রন্থের নামকরণেও শ্রীমতী দেবসেনের সানন্দ অনুমোদন আমাকে প্রাণিত করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মূল্যবান গ্রন্থাগার, বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউট, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ-এর সহায়তার কথাও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

সূচী

প্রস্তাবনা

বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে যে কয়েকজন মহিলা সাহিত্যিক আপন বৈশিষ্ট্যে ও প্রতিভায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন রাধারাণী দেবী তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

'ভারবি' থেকে প্রকাশিত "রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা" সংকলন গ্রন্থের ভূমিকার প্রথম বাক্যটি নিম্নরূপ; এবং ভূমিকাটির রচয়িতা অধ্যাপক সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য:

> "রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল মহিলা-কবির নাম রাধারাণী দেবী।"[১]

একথা অনস্বীকার্য যে রাধারাণী দেবী যখন সাহিত্য জগতে প্রবেশ করলেন তখন বাংলা সাহিত্য জগতে মহিলা কবি বা সাহিত্যিকের সংখ্যা কম ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে সময় পুরুষ প্রতিভারই প্রাধান্য ছিল বেশী। অসংখ্য পুরুষ সাহিত্যিকদের দ্বারা বাংলা সাহিত্য নানাভাবে সমৃদ্ধ হলেও তুলনামূলকভাবে নারী-প্রতিভার স্বাক্ষর ও স্বল্পতা বিস্ময়করভাবে কম বলা যায়। সে যুগের প্রচলিত ধারা অনুযায়ী গৃহকোণে আবদ্ধা ও বহির্জগতের শিক্ষায় বঞ্চিতা নারীর মধ্যে শিক্ষা ও চেতনার তথাকথিত অপ্রতুলতা থাকায় নারীর পক্ষে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করা সহজে সম্ভব হয় নি। যদিও তাদের মধ্যে জ্ঞান ও প্রতিভার কোন অকুলান ছিলনা। এক্ষেত্রে সমাজ ও পারিবারিক জীবনের নির্দিষ্ট গণ্ডী ও অনিচ্ছা অবশ্য—বহুল পরিমাণে দায়ী। আসলে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-এর মতো উল্লেখযোগ্য খ্যাতনামা সহিত্যকারেরা যখন উন্নত মূল্যবোধগুলি এদেশের সাহিত্যে তুলে ধরতে চাইলেন—তখন আমাদের দেশের সমাজটা ছিল অন্ধ কুসংস্কারের নাগপাশে জর্জরিত। সমাজের বন্ধ্যাদশা ঘোচাতে শুধু পুরুষের ভূমিকা নয়, নারী জাতিরও যে বিশেষ ভূমিকা আছে—এ কথা বাংলাসাহিত্যে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। নারীর বিভিন্ন রূপ নানাভাবে ধরা পড়েছে আমাদের সাহিত্যে। কখনও সে জননী, কখনও সে জায়া, কখনও সে আবার কন্যারূপে নিজেকে মেলে ধরেছে। এ বড় বিস্ময়ের যে—সামাজিক বিবর্তনের মধ্যেও কিন্তু বারে বারে নারী হয়েছে লাঞ্ছিতা, নির্যাতিতা। পুরুষশাসিত সমাজে সামাজিক অনুশাসন আর শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের জাঁকজমকের তলায় গোটা নারী সমাজকে পদদলিত করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধেও বাংলা সাহিত্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। এরই মধ্যে সেই সময়ের যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় লেখিকা

সাহিত্য জগতে নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই সমাজের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ এবং তাঁরাও নিজেদের নির্দিষ্ট শিক্ষা ও গন্ডীর মধ্যে পুরুষশাসিত প্রাতিষ্ঠানিক জীবন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রসঙ্গতঃ কবি আনন্দ বাগচীর এই বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> *রাধারাণীর জন্ম ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহারে। সহজাত কবি প্রতিভার অধিকারে যে সময় তিনি সারস্বতচর্চায় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন তখন বাংলার রক্ষণশীল সমাজে, মধ্যবিত্ত ঘরাণায় অবগুণ্ঠন অনিবার্য ছিল। সে যুগে গল্প-উপন্যাসের নায়িকা ছিল কল্পনায় ধার করা, প্রেমের ঘটনাবহুল উপাখ্যান রোমান্সমাত্র। পথে-ঘাটে ঘোমটা-খসা নারীর দেখা পাওয়া সহজ ছিল না। অবশ্য পশ্চিমী শিক্ষা সংস্কৃতির হাওয়া লেগেছিল যে বিশেষ সমাজে, যে উঁচুতলার ধনী পরিবারে তাদের কথা আলাদা। সামাজিক, পারিবারিক এই পটভূমিতে রাধারাণী অশেষ ভাগ্যবতী এই জন্যে যে তিনি পেয়েছিলেন ঘরে বাইরে অকৃপণ স্বাধীনতা, পুরুষের দুর্লভ বন্ধুত্ব আর শিক্ষার অবাধ সুযোগ। এবং সেই সঙ্গে আজীবন সাহিত্যের আবহাওয়া ও সচ্ছলতা। এত সত্ত্বে ও অনেক বাধা তাকে নিজের হাতে ঠেলে সরাতে হয়েছে। এগোতে হয়েছে অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে।*[২]

মূলতঃ পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের শোক ও হতাশা থেকেই তাঁদের সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, অনুরূপা দেবীরা সে যুগের উল্লেখযোগ্য লেখিকা হলেও তাঁদের সাহিত্যসাধনাকে অতীত ইতিহাসের স্মৃতিচারণা ও ব্যক্তিগত জীবনের সীমিত অভিজ্ঞতার মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছেন। কেননা সে যুগের রীতি অনুযায়ী তাঁদের সাহিত্যচর্চা নারী জীবনের সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনার ও ঘর-গৃহস্থালীর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। সে সময়ে র সমাজ-অনুশাসনের বাইরে কোন ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নেওয়া বা চিন্তা করা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। আধুনিক নারীর জীবন-সংগ্রাম, জটিলতা, সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনার ও তদুপরি সামাজিক ও পারিবারিক অবক্ষয়ের বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাঁদের বিচরণ করতে হয়নি। তাই তাঁদের সাহিত্য-সাধনা নারীর সুকোমল হৃদয়বৃত্তি ও ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। একথা ঠিক যে কালের বিবর্তনে নারী আজ শুধু গৃহধর্মেই আবদ্ধ নয়, আধুনিক শিক্ষা ও চেতনার হাত ধরে সে পুরুষের মতো পুরুষের সঙ্গেই বহির্জগত ও কর্মজগতে প্রবেশ করেছে। জীবন ও কর্মক্ষেত্রে সে পুরুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের স্বাধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছে। কিন্তু কোন কোন সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা ও জটিলতার ক্ষেত্রে নারী আজও লড়াই করে চলেছে সম্পূর্ণ এককভাবেই। এই লড়াইয়ে কেউ তার শরিক নয়, এমন কি তার নিজের পরিবারের নারী-পুরুষেরাও নয়।

'আসলে পুরুষ প্রধান এই সমাজে এক পক্ষের প্রতিরোধ, প্রতিবাদবিহীনতা এবং ক্রমাগত মেনে নেবার মানসিকতা থেকে উদ্ভূত যে যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি — সেখানে 'মুক্তি' কথাটা অর্থহীন। সমাজ তাই নিষ্ঠুর অমানবিক, অকারণ, অর্থহীন হাজারো সংস্কার ও সামাজিক বিধানে নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

সমাজ বা পরিবারের কল্যাণার্থে একসময় কন্যা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে অথবা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত। বিয়েতে কন্যাপক্ষের পণ দেবার রীতি। আবার সেই পণের কারণেই প্রতিদিন কতশত বউ বলি হয়। সম্পত্তি নিয়ে যেখানে নারীর মূল্য বিবেচিত হয়, সেখানে এমনটাই বুঝি স্বাভাবিক। পোষাক ইত্যাদির আবর্তে নারীই ভিষণভাবে বাঁধা; যেমন ঘোমটা, বোরখা, শাঁখা, সিঁদুর, লোহা ইত্যাদি। 'সতী' কথাটার পুং প্রতিশব্দটাই নেই। অগত্যা নারীকেই সতী হতে হয়। তাই এই অতি আধুনিক যুগেও মেয়ে নয়, সতী হবার কারণেই রূপ কানোয়ার চিরবন্দিতা। বৈধব্য-যন্ত্রণা — তাও এই নারীর জন্যেই বরাদ্দ। (অবশ্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৈধব্য পালন করেছিলেন। কিন্তু এমন উদাহরণ তো বিরল।) বউ মরুক না মরুক ইচ্ছা করলেই (আইন থাকলেও!) কোন স্বামী একাধিক বিয়ে করতে পারে। সমাজ এটাকে স্খলন মনে করে না। পুরুষের প্রতি এক্ষেত্রে সমাজ বড়ই সহিষ্ণু। কিন্তু কোন বিবাহিতা নারী কি এই দুঃসাহস দেখাতে পারবেন? সমাজ "তাই নারীর স্খলন" কিছুতেই মেনে নেবে না। যুগ যুগ ধরে কত শত সাহিত্য, নাটক, গান, কবিতা, গল্প ইত্যাদি সমৃদ্ধ হয়েছে অবৈধ প্রেমকে ঘিরে। সেই অবৈধ প্রেমের অধিকারও শুধু পুরুষের। স্বামীর বা পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকার পুত্রের। তবে এসবের উপশমে "আইন" বলে একটা কথার প্রচলন আছে। সমাজ ও পুরুষ কিন্তু চূড়ান্ত ব্যঙ্গে প্রত্যাখান করে সেই আইনকে। এখানে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উল্লেখ্য:

> *ধর্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না; ... কেবল অসতী বিষয় পাইবে না; কেন না, সে স্ত্রী। ইহা যদি ধর্মশাস্ত্র, তবে অধর্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন হয়, তবে বে আইন কি?*[২ক]
>
> *হোক না স্ত্রী, সে তো নারী। তাই তার ক্ষেত্রে অধর্মটাই ধর্ম, বেআইনটাই আইন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সেই সত্যটাকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তাঁর প্রশ্নটির উত্তর নয়, প্রেক্ষিতে এটুকু বলা যায় — স্বভাবগত, অধিকারগত, সমাজগত বৈষম্য যতদিন না নির্মূল হচ্ছে — ততদিন, আত্মবিমুখ স্ত্রী বা নারীজাতির সহিষ্ণুতা এবং মৌনতা ভিন্ন গতি নেই। তাঁরা তো মনুষ্যপদবাচ্যই নন। তাঁরা দলিত; আলাদা এক জাতি, আলাদা সমাজ, যে সমাজ পুরুষের মর্জির ওপর নির্ভরশীল।*[৩]

নিজের জীবন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আজ নারী অর্জন করেছে। যদিও রাষ্ট্র আজ তাকে কিছু আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে। তবুও নারীর এই সংগ্রাম একক বা রাষ্ট্রীয় নয়। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নারীর ভিন্ন ভিন্ন ধরণের সংগ্রাম থেকেই এই সফলতা এসেছে। তাই অন্যান্য সুবিধার মত সাহিত্য জগতেও নারীর প্রতিষ্ঠা বহু পরে ঘটেছিল।

মূলত পুরুষতান্ত্রিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব আপন সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে সাহিত্য-রসিকের কাছে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন রাধারাণী দেবী তাঁদেরই অন্যতম। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীলতা তাঁর সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ। নারীসুলভ রচনাভঙ্গী দ্বারা সাহিত্য সাধনা শুরু হলেও আধুনিক মানসিকতায় সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের এক সুচারু সংযোজন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়:

> *কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই যে, রাধারাণী দেবীর সাহিত্য ও সমাজচিন্তার যে দীপ্তি এই শতকের দুইয়ের এবং তিনের দশক থেকে বাংলাসাহিত্যজগৎকে আলো করে রেখেছিল, তা বেশিরভাগ বাঙালী পাঠকই ভুলে যেতে বসেছিল।* [৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ আরো সহজ ও স্পষ্ট করে বললে বিশের দশকের প্রিয়ম্বদা দেবী, কামিনী রায়, মানকুমারী বা কুসুমকুমারী দাসের মত প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান মহিলা সাহিত্যিকদের রচনার যে ধারা সে সময় পাঠক সমাজে আদৃত ও প্রশংসিত হয়েছিল তা থেকে সুস্পষ্টভাবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ধারার বা ভিন্ন গোত্রের সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত হন রাধারাণী দেবী। প্রচলিত রোমান্টিক বা শোকাচ্ছন্ন সম্বলিত কাব্যধারায় বা কাব্যবিষয়ে সহজ অনুগমন বা সীমাবদ্ধ পরিবেশকে সাবলীলভাবে দূরে সরিয়ে রেখে অনায়াসে ও অনাড়ম্বর স্বাচ্ছন্দ্যে তিনি তাঁর সাহিত্য-রচনায় এক নতুন ও ব্যাপ্ত দিগন্ত উন্মোচন করেন। তৎকালীন বঙ্গসমাজে, এমনকি নগরজীবনেও, নারী আজকের যুগের নারীর মত স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ছিল না। সামাজিক অনুশাসনে তাঁর গৃহজীবন এমনকি ব্যক্তিগত জীবনও নিয়ন্ত্রিত ছিল। স্বাধীনভাবে নারীর কোন মতামত প্রকাশ বা কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল না। জন্মার্জিতসংস্কার, ধ্যানধারণার বশবর্তী, ঈশ্বরবিশ্বাসী ও সামাজিক আচারবিধি সর্ববিষয়ে তার আচরণ ছিল পুরুষকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ।

এই সামাজিক ও আচারবিধি অনুশাসনের মধ্যেই বালবিধবা রাধারাণী দত্ত মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর 'লীলাকমল' গ্রন্থ প্রকাশ করে নিজের ব্যতিক্রমী চরিত্রের পরিচয় দিলেন। অনায়াস স্পষ্টতায় ও সহজ স্বাভাবিকতায় একটি নারীহৃদয় জীবনদেবতার উদ্দেশে আত্মনিবেদন করলো। তাঁর সমাজ সচেতন মানসিকতা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি বাংলা সাহিত্য-জগতকে আলোড়িত করল। কেবল কাব্য নয় — কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ-সমালোচনা, কিশোর পাঠ্য রচনা-সাহিত্যের নানা শাখায়, এমনকি সনেট রচনায়ও ছিল

তাঁর অনায়াস বিচরণ। শুধু তাই নয় 'কলাকৈবল্যবাদ'-এ (Art for Art's Sake) আত্মসমর্পণ না করে মানব মনের বিশেষ করে নারী হৃদয়ের অন্তর্লীন জিজ্ঞাসা ও সমস্যার বিষয়টি আদৌ উপেক্ষিত না হয়ে বরং যথাযথ প্রাধান্যে তা পাঠকের কাছে আকর্ষক হয়ে উঠেছে। একটি নারীহৃদয় দিয়ে নারীসমস্যা ও জটিলতার বিষয়টির সাহিত্যরূপ পাঠককে কৌতূহলী করে তুলেছে। তাঁর রচনা পাঠে পাঠক একই সঙ্গে উপভোগ করেছেন অনাবিল হাসি ও আনন্দের খোরাক। মননশীলতার সঙ্গে জ্ঞান-বুদ্ধির গভীর ব্যঞ্জনার সংমিশ্রণ, কৌতুক ও সংশয়ের যুগপৎ অনুভূতির যথাযথ প্রকাশকে সাহিত্যিকের সৃষ্টি ক্ষমতার অন্যতম কৃতিত্ব বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য রাধারাণী দেবী তথা অপরাজিতা দেবীর রচনায় তার অভাব দেখা যায়নি কখনও। রাধারাণী দেবী অপরাজিতা ছদ্মনামে লিখেছেন। দীর্ঘ ষোল বছর তিনি এই নামে লিখতেন। সে সময় তাঁর এই রচনাগুলিকে অনেকেই শরৎচন্দ্রের রচনা বলে মনে করতেন। রাধারাণীর ভাষা ও ভঙ্গি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। এ ভাষার মধ্যে আছে জীবনের নির্মোহ ও নির্মম বর্ণনা, গভীর অন্তর্জ্বালা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও করুণ বেদনা। তাঁর মিতভাষিতা, বৈদগ্ধ্য, গভীর জীবনদৃষ্টি, যুক্তিবাদী মানসিকতা ও পরিচ্ছন্ন রসবোধ বাঙালী পাঠকের কাছে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি শুধু বাঙালী নারী নন, যেন সমগ্র নারীসমাজেরই সংগ্রামের প্রতিনিধি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ না পেলেও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত এই নারী — নারী-সচেতনতার মূর্ত প্রতীক। আজ দেশে দেশে নারীর স্বাধিকারের জন্য যে সংগ্রাম ও নারীমুক্তির কথা শোনা যায়, বলা যায়, একশো বছর আগে রাধারাণী দেবী তাঁর জীবন ও সাহিত্যের মাধ্যমে তার শুভ সূচনা করে গেছেন। বাঙালী নারীর জন্য রেখে গেছেন স্বাধিকার-অর্জনের সংগ্রামী মনোভাব ও উত্তরাধিকার। স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরীর মত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ছিল তাঁর সাহিত্যিক অন্তরঙ্গতা। এই অন্তরঙ্গতা শুধু ব্যক্তিগত সখ্য নয়। সাহিত্যিক আলোচনা ও জীবন চর্চায় তাঁরা অভিনন্দিত করেছেন এই ব্যতিক্রমী নারী সত্তাকে।

দুঃখের বিষয় তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র দশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপিত হবে। অথচ কি আশ্চর্য তাঁর একখানি পুস্তকও এখন বাজারে লভ্য নয়। বলতে দ্বিধা নেই, তাঁর কোন গ্রন্থই প্রাপ্য নয়; এ বেদনা ও লজ্জা সাহিত্যের ইতিহাসকারদের বা সাহিত্যের গবেষকদের নয়; এ বেদনা উৎসাহী পাঠকদের এবং লজ্জা আমাদের সকলের।

অতি সম্প্রতি (২০০২) কবিকন্যা অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেন সম্পাদিত "রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা" প্রকাশিত হয়েছে 'ভারবি' থেকে। সেই গ্রন্থের প্রাক-কথন অংশের সামান্য উদ্ধৃতি :

> *ভারবি'র উৎসাহে ১৯৩৭-এর পরে, ২০০২ তে রাধারাণী দেবীর কবিতার বই আবার প্রকাশিত হচ্ছে।...*

> *... ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৪-এর মধ্যে রাধারাণী দেবীর তিনটা ও অপরাজিতার চারটা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।... 'সিঁথিমৌর' ও 'বনবিহগী' প্রকাশের প্রায় চল্লিশ বছর পরে রাধারাণী দেবী তাঁর নিজের ব্যবহৃত কপিতে কিছু সংযোজন করেছিলেন। ... 'মিলনের মন্ত্রমালা' তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ। ... এই বইতে তাঁর সেই কাজটির পরিচয় নেই, শুধুই মৌলিক কবিতা আছে।... রাধারাণী ও অপরাজিতা পৃথকভাবে সংকলিত হলেন।...*

সুতরাং রাধারাণী দেবী তথা অপরাজিতা দেবীর সাহিত্য কর্মের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও মূল্যায়নের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই বাংলা সাহিত্যের এই আপাত উপেক্ষিত দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টিপাতের প্রার্থনায় এই বিনীত প্রয়াস।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রস্তাবনা

১. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — রাধারাণী দেবী (প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৪০৮)
২. সাহিত্যের নানারকম — আনন্দ বাগচী (প্রথম সং. ১৯৮৭)
৩. রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১ — রাধারাণী দেবী
৪. লৌকিক উদ্যান: মানবী সংখ্যা — সম্পাদক: প্রেমেন্দ্র মজুমদার (শ্রাবণ ১৪০৬)
৫. বঙ্গ সাহিত্য অভিধান — হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
৬. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান — সংযোজন খণ্ড
৭. আত্মস্মৃতি — সজনীকান্ত দাস (প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ: ১৩৮৪)
৮. শরৎচন্দ্র: মানুষ এবং শিল্প — রাধারাণী দেবী (আনন্দ পাবিলিশার্স — ১৯৭৬)
৯. রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত — জগদীশ ভট্টাচার্য
১০. জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র — ড. অজিত কুমার ঘোষ
১১. শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার — ড. অজিত কুমার ঘোষ
১২. শরৎচন্দ্র: দেশ কাল সাহিত্য — উজ্জ্বল কুমার মজুমদার
১৩. বঙ্কিমচন্দ্রের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ — অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
১৪. এ মণিহার — উজ্জ্বল কুমার মজুমদার

প্রসঙ্গসূত্র: প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায়:.জীবনী

(ক) ব্যক্তিজীবন

রাধারাণী দেবীর জন্ম কোচবিহারে ১৯০৩ সালের ৩০শে নভেম্বর বাংলা ১৩১১ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণ। সেদিনটি ছিল শুক্লাচতুর্দশী। পিতা মাতার চোদ্দটি সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন একাদশ। নাতনির সুন্দর মুখশ্রী দেখে ঠাকুমা কামিনীসুন্দরী নামকরণ করেন রাধারানী। পিতা স্বর্গীয় আশুতোষ ঘোষ তৎকালীন স্বাধীন কোচবিহার রাজ্যের শাসন বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পিতামহ পঞ্চানন ঘোষ বর্তমান দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামের জমিদার ছিলেন। পরে তিনি Lanlon কোম্পানির বেনিয়ান বা ইংরেজ সরকারের ব্যবসা বিভাগের এজেন্ট হন। মূলতঃ শহর কোলকাতার বনেদী ও বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলির মধ্যে ঘোষ পরিবার ছিল অন্যতম। তৎকালীন কোলকাতার বাদুড়বাগান অঞ্চলের মির্জাপুর ষ্ট্রিটের প্রায দুই বিঘা জমির উপর নির্মিত বাড়িটিতে এই পরিবারের বসবাস ছিল। সেকালের খ্যাতনামা একজন মুৎসুদ্দি পঞ্চানন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ও সফল মানুষ ছিলেন। তাঁর নামে রাস্তা অর্থাৎ উত্তর কলকাতার বাদুড়বাগান অঞ্চলের পঞ্চানন ঘোষ লেন আজও তার সাক্ষ্য বহন করে। পঞ্চানন ঘোষের প্রথমা স্ত্রী দুটি পুত্রসন্তান রেখে প্রয়াত হলে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। পাত্রী ছিলেন হাওড়া কুমিরমহা গ্রামের গোবিন্দ দত্তর একমাত্র মেযে কামিনী সুন্দরী। রাধারাননী দেবীর পিতা আশুতোষ ছিলেন— এই পঞ্চানন ঘোষ-কামিনীসুন্দরীর সন্তান।

এই বর্ধিষ্ণু ও মার্জ্জিত রুচির শিক্ষিত পরিবারের প্রতিবেশটুকুও ছিল যথেষ্ঠ উজ্জ্বল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন আশুতোষের বিদ্যালয-সহপাঠী। আর ঠাকুর বাড়িতে স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল সেই বালক বযস থেকেই। অবার আর এক প্রতিবেশী সিমলার নরেন দত্ত ছিলেন আশুতোষের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই বন্ধুত্ব এতই গভীর ছিল যে মা কামিনী সুন্দরী আদর করে এদের জগাই-মাধাই বলে ডাকতেন। আসলে আশুতোষের বাড়িতে দোতলায় একটি ঘরে এই দুই বন্ধু হুঁকো হাতে যখন আড্ডা দিতেন তখন আর সময়েরও হিসাব থাকত না। আরও একটি অতি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে সে সময়ে এই বাড়িরই একতলায

থাকতেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তিনি তখন সেখানে ভাড়ায় থাকতেন। তাঁদের গতিবিধি ছিল ব্রাহ্মসমাজকেন্দ্রিক, তাঁরা কখনো যেতেন ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা শুনতে বা কখনো যেতেন কেশবচন্দ্র সেন বা শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়িতে। আর এসব দেখেই মা কামিনীসুন্দরীর উৎসাহে ছাত্রথাকাকালীন অবস্থাতেই আশুতোষের বিয়ে হয়ে গেল হাটখোলার দত্ত বংশের রমানাথ দত্তর একমাত্র কন্যা নারায়ণীর সঙ্গে আশুতোষের পড়াশোনায় কিন্তু ছেদ পড়েনি। বিয়ের পরই আশুতোষ আইন পাশ করলেন।

পিতা আশুতোষ ঘোষ (জন্ম আনুমানিক ১৮৬২) শিক্ষান্তে কোচবিহার রাজ্যের শাসন বিভাগের কাজে যোগদান করেন ও পরবর্তী কালে ম্যাজিস্ট্রেট হন। পিতৃদেব আশুতোষ ঘোষ ছিলেন কেশবচন্দ্রের অনুগামী। রবীন্দ্রসাহিত্যেও তাঁর ছিল আন্তরিক অনুরাগ। প্রাত্যহিক জীবনে তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ ও বেশ রাশভারি লোক। কেশবচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে পরিবারের আবহটি ছিল স্বচ্ছ সুন্দর ধর্মনিষ্ঠ ও সাহিত্য প্রেমময়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একটি জেলা কোচবিহার তখন দেশীয় রাজার অধীন ছিল। কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে দিনহাটা শহরে রাধারাণী দেবীর জন্ম হয়। পিতা মাতার চোদ্দ সন্তানের মধ্যে একাদশ সন্তান রাধারাণী।

জন্ম থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত কোচবিহারের দিনহাটায় ও মাথাভাঙ্গায় উন্মুক্ত ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যময় আবেষ্টনের মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছিলেন রাধারাণী। সেখানেই তাঁর পাঠ্য জীবন ও সাহিত্য জীবন শুরু হয়। রাধারাণী দেবীর স্মৃতিচারণায় (কথাসাহিত্য-বিংশ বর্ষ—আষাঢ় শ্রাবণ ১৩৭৬-পৃষ্ঠা ১২৫৯) :

"যখন যেখানে আমরা গিয়েছি সেখানেই বাবা একটা করে গার্লস স্কুল খুলেছেন, আর আমি সেই স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করেছি। তখনকার কোচবিহারে জল আর জঙ্গল চারিধারে। ছেলেবেলার সবটুকুই কেটেছে হয় মাথাভাঙ্গায় নয় দিনহাটায়। ও অঞ্চলে বর্ষায় নদীর কুল ছাপিয়ে বন্যার ঢল নামতো প্রতি বছর। আমরা বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িযে বন্যার সেই গোঁ গোঁ আওযাজ শুনতাম অর মনে মনে কামনা করতাম—আহা, জল আরো বাড়ুক। বাড়তে বাড়তে একেবারে আমাদের বাড়ির উঠোনে ঢলে আসুক, তাহলে আর স্কুলে যেতে হবে না। কাগজের নৌকো ভাসানোর জন্য একটুও মেহনত করতে হবে না।"

পিতা আশুতোষ ঘোষ ছিলেন সংস্কৃতি মনা ও সাহিত্য অনুরাগী। তখনকার শিশুপাঠ্য পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকাগুলি তাঁর বাড়িতে নিয়মিত আসত। পিতার শিক্ষানুরাগ সাহিত্যপ্রিয়তা ও রবীন্দ্রানুরাগ কন্যা রাধারাণীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

এই বিবাহে তাঁর ঘোর অাপত্তি ছিল। পাঠপ্রিয় রাধারানী এই বিবাহ করতে চান কি। কিন্তু সামাজিক রীতি অনুসারে ও মাতৃদেবীর কঠোর অনুশাসনে ও সিদ্ধান্তে এই বিয়ে হয়।

সেই যুগে ও সেই সময়ে মানুষের জীবনে এত ব্যস্ততা ছিল না। পারিবারিক বন্ধনও ছিল অনেক অকৃত্রিম ও ব্যাপক। গ্রামীণ সারল্য ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে অখণ্ড অবসরভোগী মানুষ সাহিত্যের রূপ ও রস খুঁজে পায়। এই ইতিবাচক পরিবেশের মধ্যে মনের ব্যাপকতা স্ফূটনের যে অনাবিল সুযোগ আছে তাতে সন্দেহ নেই। রাধারাণী দেবীর সাহিত্য অনুরাগ বর্ধিত হয় বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। দিনহাটার ছবিরুন্নিসা বালিকা বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর শিক্ষানুরাগকে তৃপ্ত রাখতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে নিজ গৃহে এবং স্বশিক্ষায় — সংস্কৃত, ইংরাজি ও ফরাসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁরই সেজদার, আশুতোষ-নারায়ণীর চতুর্থপুত্র বটকৃষ্ণ ঘোষের হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা 'সুপথে'। এ কাজে সেজদার প্রধান সহায়ক ছিলেন রাধারানী প্রায় একই সময়ে 'মানসী ও মর্মবাণী' সাময়িক পত্রে তাঁর কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতার নাম 'দেবতা', প্রকাশকাল — মাঘ ১৩২২।

১৩২৪ সালে (১৯১৬) মাত্র ১৩ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। * স্বামীর নাম সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত দত্ত বংশের সন্তান, উচ্চ শিক্ষিত; পেশায় কৃতী ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ার। পিতা প্রয়াত জয়গোপাল দত্ত, মাতা সুশীলাবালা দত্ত, অদি নিবাস-নদীযা জেলার ছোট জাগুলিয়া। মধ্য ভারতের একটি স্বাধীন রাজ্য রামপুর স্টেটে তিনি দায়িত্বপুর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মাত্র আট দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসে বিবাহান্তে বালিকা বধূকে কলকাতায় রেখেই তিনি তাঁর কর্মস্থানে ফিরে যান। বিয়ের পরের কয়টি মাস বেশ মাথাভাঙা ও কলকাতায় কাটছিল রাধারানীর। কিন্তু হঠাৎই দুঃসংবাদ পেলেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ মাস তিনেকের মধ্যেই সুদূর প্রবাসে সামান্য এশিয়াটিক 'ফ্লু' রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হয়।

সংবাদটি কলকাতা থেকে মাথাভাঙ্গায় আনেন এক ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গেই রাধারানীকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রাধারানী যখন রামপুরে পৌঁছলেন তখন সবই শেষ। বিয়ের কটি দিনের কথা মনে পড়ে যায়। ব্যথিত চিত্ত কিশোরী কাঁদতেও যেন ভুলে যান্য পাষাণবৎ দাঁড়িয়ে থাকেন শুধু।

তেরো বছর বয়সে রাধারাণীর বৈধব্য জীবনের শুরু। প্রাথমিক পর্বে ব্যথিতচিত্ত বালিকাবধূর জীবনটা তার পিতৃগৃহে কেমন কেটেছিল — তার এক করুণ বিবরণ পাই কবিকন্যা নবনীতার লেখায়:

> *তেরো বছর বয়সে বিধবা হওয়া রাধারাণী দত্তের স্বামীরও ওই এশিয়াটিক ফ্লু-তে মৃত্যু ঘটেছিল। বই-পাগল রাধারাণী তাঁর মায়ের চোখে কোনকালে প্রিয় ছিলেন না। বৈধব্যের কঠোর নিয়মকানুন জোর করে সধবা মা-ই পালন করিয়েছিলেন বালিকা কন্যাকে। একাদশীর দিন স্নানের সময়ে রাধারাণীর*

> *সঙ্গে স্নানঘরে একটি দাসী, কিংবা কোনো দিদিকে পাহারায় পাঠাতেন — বিধবা মেয়েটি যাতে লুকিয়ে স্নানের জল পান করে পাপকর্ম না-করে ফেলে। একাদশীর উপবাসটি নির্জলা হওয়া চাই তো? রাধারাণীর দীর্ঘ চুল কেটে ফেলে, তাকে নিরলংকার করে, থান পরানো বাপের বাড়িতেই হয়েছিল।*[১]

মামাশ্বশুর সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কাছে রাধারাণী দেবী নিজ স্বভাবগুণেই অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ভাগ্য বিড়ম্বিত এই বালিকা বধূর প্রতি তাঁদের সহানুভুতি ছিল অকৃত্রিম। এই অকৃত্রিম সহানুভুতির বড় প্রীতিস্নিগ্ধ উল্লেখ পাই কবিকন্যার রচনায়:

> *শ্বশুরগৃহে গিয়ে রাধারাণীর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। অন্য একটি নতুন ভূমিকা হলো তাঁব। সেখানে বালিকাটির প্রতি সকলেরই অসীম মমতা। তার লেখার জন্যে টেবিলচেয়ার খাতাকলম এলো। শ্বশ্রূমাতার নির্দেশে চুলগুলি সযত্নে আবার বড় করা হলো, থানধুতি ছাড়িয়ে লালপেড়ে শাড়ি পরানো হলো। নির্জলা উপবাস বন্ধ করা হলো। হাতে গলায় কানে সামান্য সোনা উঠলো। তার শূন্যতা ভরাতে চেয়ে সংসারের সব ব্যাপারেই রাধারাণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক, অনিবার্য করে তুললেন তাঁর শ্বশুরবাড়ির মানুষরা। এমনকি সংসারের আর্থিক হিসাবরক্ষার দায়িত্ব দিয়ে 'বাড়ির বড় ছেলে'র সম্মানটুকু দেওয়া হলো তার বিধবা বৌটিকে।*[২]

মামাশ্বশুর সুরেন্দ্র নাথ মল্লিককে রাধারানীর লেখা একটি চিঠির উল্লেখ করলে এ কথাটি পরিষ্কার হবে—

> *শ্রীচরণ কমলেষু,*
> *বড় মামাবাবু আপনি কেমন আছেন? আপনি ও মামীমা আমার বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। আপনার শরীর পূর্বাপেক্ষা একটু সারিয়াছে কিনা জানাইবেন। আপনি কবে কলিকাতায় আসিতেছেন? হাজারিবাগে এখন শীত কেমন?*
>
> *মামাবাবু! তিনি স্বর্গে ভগবানের নিকট গিয়াছেন ও বেশ সুখে আছেন। আপনারা কাঁদিবেন না। মামীমাকেও তাঁহার জন্য কাঁদিতে বারণ করিবেন। কাঁদিলেও আর ফিরিয়া আসিবেন না। আমরা কাঁদিতেছি দেখিলে তাঁহার মনে কষ্ট হইতে পারে। তিনি এখন তাঁর বাবা, দাদাবাবু সবাইকে দেখিতে পাইতেছেন ও ভগবানের কোলে খুব সুখে আছেন। ছোট মামাবাবু বলিয়াছেন যে আমরা সকলেই একদিন তাঁহার নিকট যাইব। তখনতো আর তিনি আমাদের ছাড়িয়া পলাইতে পারিবেন না। সে ভারি মজা হইবে। আর বড় মামাবাবু! ছোট মামাবাবু বলিয়াছেন যে আমি না কাঁদিলে আমাকে যেমন জামাইবাবু রামপুরে*

আনিয়াছিলেন তেমনি ছোট মামাবাবু তাঁর কাছে দিয়া আসিবেন। আমাকেও ঐ রকম লাল কাপড় ঢাকা দিয়া ভগবানের কাছে ছোটমামাবাবু দিয়া আসিবেন। সে ভারি মজার কথা না মামাবাবু?

আমার কিন্তু মোটে আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। শীঘ্রই তাঁর কাছে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বড় মামাবাবু, আর একটি কথা আপনাকে শুনিতেই হইবে। আপনি এখন স্বর্গে পলাইয়া যাইবেন না। ছোট মামাবাবু বলিয়াছেন আমাকে স্বর্গে তাঁর কাছে পাঠাইয়া তবে যাইবেন। মামাবাবু! আপনিও তাই করিবেন। আমাকে ফেলিয়া আগে স্বর্গে যাইবেন না। আমি বাবাকে জামাইবাবুকে মাকে সবাইকে বারণ করিয়াছি। আর মামাবাবু! আমি আপনাদের মনে কষ্ট হবে, বাবা মার মনে কষ্ট হবে বলে ছোট মামাবাবুর কথা মত আবার চুড়ি পরিয়াছি, বিছানায় শুই, বামুন ঠাকুরের রান্না খাই! ওসব করিলে আপনাদের মনে কষ্ট হবে কিনা।

আমি আর কারও মনে কষ্ট দিব না, তাহলে ভগবান আবার এই রকম কষ্ট দিবেন। আমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে হব; তবে তাঁর কাছে যেতে পারব। আমাকে ছোট মামাবাবু আগের চেয়েও খুব বেশিই ভালবাসেন। কলিকাতার সেই বাবার মতই আর ভাল কথা শিখান, আমার খুব ভাল লাগে। আর বড় মামাবাবু! আপনিতো একজন বড় মামাবাবু! আবার এখানে আর একজন বড় মামাবাবু ও মামীমা হয়েছেন, তাঁরাও আমাকে খুব ভালবাসেন। আর সকলেই বলেছেন আমার ছেলেমেয়ে হবেন। আপনিও। ছোট মামাবাবু বলেন আমি সবাইকার মা হয়েছি।

আপনারা দুঃখ করবেন না। দুঃখ করে কি হবে? তিনি ত ভাল আছেন। আপনি ভগবানকে বলবেন তাঁকে খুব সুখে রাখেন। এখানে সবাই ভাল আছেন। আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের মেয়ে
বউমা[৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কবিকন্যা প্রখ্যাত কবি ও কাহিনীকার, অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেন এই চিঠিটি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে — এই চিঠিটি থেকেই রাধারাণী দেবীর "...গল্প-প্রবন্ধগুলির পটভূমি বোঝা কিছুটা সহজ হয়ে যাবে।"[৫]

চিঠিতে দুর্ভাগিনী বালিকা বধূটির শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিকাঠামো ও রীতিনাতির মর্মান্তিকতা পাঠকের চিত্তকে ব্যথিত করে। মৃত্যুর বাস্তবতা সম্পর্কে শিশুসুলভ অজ্ঞতার পাশাপাশি তাকে যে চুড়ি পরানো হচ্ছে, প্রথা ভেঙ্গে বিছানায়

শোয়ান ও ঠাকুরের হাতে রান্না গ্রহণ করান হয়েছে এই খবরটিও পাই এবং এর সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে যায় মেয়েটির মনের সাংসারিক গুরুত্ব ও পরিতৃপ্তি ও মনগড়া মাতৃত্ব লাভের সুপ্ত আকাঙক্ষাটি। এই চিঠির বছর পাঁচেকের মধ্যেই পরিণত মনস্কা রাধারাণী পত্র পত্রিকায় গল্প ও প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন।

> *বাল্য -কৈশোরের সন্ধিক্ষণে প্রতিকূল দৈবের এই নির্মম আঘাত বুকে নিয়ে রাধারাণী সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর পুনর্বিবাহের জন্য পিতামাতা ও অগ্রজগণের প্রয়াসের ত্রুটি ছিল না। শ্বশুর পরিবারও এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা বলিকা-বধুর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য আন্তরিক আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু পুনর্বিবাহের প্রতি কবি-কিশোরী কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করেননি। রবির আলোর তার চিৎকমল বিকশিত হয়েছিল। বাগ্‌দেবীর আরাধনাই হল তাঁর জীবনের ব্রত। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে, ১৩৩০ সাল থেকেই ভারতী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণীতে তরুণী কবি রাধারাণী দত্তর কবিতা প্রকাশিত হতে লাগল।*[৬]

তাঁর চিন্তায়, কলমের ভাষায় ক্রমশই আশ্চর্য ও তীক্ষ্ণ পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তীক্ষ্ণত্ব ও পরিণতিবোধ পুরানো মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়নি। সেইসময়কার গল্পে, কবিতায় ও প্রবন্ধে পুরানো মূল্যবোধের চিহ্ন থেকে গেছে। 'লীলাকমল' কাব্যগ্রন্থে দয়িতের প্রতি প্রেম আকাঙক্ষায় এবং বিরহের বেদনায় সেই মনোভাব অতি সুস্পষ্ট। 'সাবিত্রীচরিত্রের' মধ্যেও (শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে) সেই জীবনের ছবিটি যেন খুঁজে পাওযা যায়।

বালিকা বয়সেই পতি হারানোর সুতীব্র বেদনা আর সেই সঙ্গে মাতৃত্বের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ — সমগ্র বিষয়টিকে বড় মরমী আন্তরিকতায় কবিকন্যা নবনীতা খুবই সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> *(রাধারাণী দেবীর) গল্প ও প্রবন্ধ থেকে আরও বুঝতে পারি, যে এই মহিমময়ী, আত্মত্যাগী, দুঃখিনী মেয়েটিকে খোলসের মতো পরিত্যাগ করে তার ভস্মাবশেষ থেকে পুনর্জাত হয়েছিল দ্বিতীয় জন্মের রাধারাণী দেবী। যার পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যেও মহত্বের, নিঃস্বার্থতার, স্নেহ-মমতার অভাব দেখিনি। কিন্তু এই সব প্রবন্ধ পড়বার পরে বুঝতে পারছি মাতৃত্ব তাঁর কাছে আকৈশোর কতটা জরুরি ছিল। বালিকা রাধারাণীর মধ্যে বালবিধবা জীবনের প্রধান ব্যর্থতা, এই বাধ্যকরী বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ। হয়তো দ্বিতীয় বিবাহটির জন্য অনেকখানি দুঃসাহস তাঁকে জুগিয়েছিল সেই মাতৃত্ব অর্জনের স্বপ্নই।...*[৭]

'কিন্তু পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত ও চর্চিত সাহিত্যানুরাগ এই দুঃখিনী বাল বিধবাকে যেন মায়ের মতই কোল দিল। সকল বেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করে তিনি অতঃপর সাহিত্যসংসারে

প্রবেশ করলেন। এই বালবিধবার পুনর্বিবাহের জন্য একদিকে যেমন তাঁর পিতামাতা ও অগ্রজেরা আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন, তেমনি তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিক থেকেও সে বিষয়ে উৎসাহের অভাব ছিল না। কিন্তু রাধারাণী, সেই বালিকা কবি কিন্তু তখন এই পুনর্বিবাহে আদৌ উৎসাহী হন নি। বরং সহজ স্বাভাবিকতায় তিনি এরপর সাহিত্যসেবায় ব্রতী হলেন। মাত্র কয়েকটি বছরের আন্তরিক ও সুনিবিড় প্রস্তুতি। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ থেকেই তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত সাময়িকপত্র সমূহে, ভারতী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতার প্রায় নিয়মিত প্রকাশ শুরু হল।

এই কাব্য-প্রকাশের সূত্রেই কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারাণী দত্ত-র অন্তরঙ্গতা ঘটে। নরেন্দ্র দেব ঠনঠনিয়ার দেব-বংশের সন্তান। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন নবাব আলিবার্দী খাঁ-র দেওয়ান। নরেন্দ্র দেবের জন্ম ১৮৮৮ সালে। সাহিত্যক্ষেত্রে ভারতী গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যেই তাঁর যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। 'কল্লোল' যখন প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে। কবি ও কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর শক্তি সাহিত্যিক-সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে।

নরেন্দ্র দেব ছিলেন রাধারাণী দত্তর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। বয়সে পনের বছরের বড়ো। ভাগ্য-বিড়ম্বিতা এই প্রতিভাশালিনী আত্মীয়াটিকে সহিত্যক্ষেত্রে সর্বভাবে উৎসাহিত করা ছিল তাঁর স্নেহকৃত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কল্লোল-কালিকলমে উভয়েরই লেখা প্রকাশিত হতে লাগল — প্রেমের কবিতা ও গল্প। কিন্তু আত্মীয়তা সত্ত্বেও উভয়ের অন্তরঙ্গতা পরিজন-মহলে বিরূপ সমালোচনা সৃষ্টি করল। রাধারাণী দুরন্ত হাঁপানি রোগে প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। তাঁর যথাযথ শুশ্রূষার অসুবিধা ঘটতে লাগল। সামাজিক কলগুঞ্জনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য নরেন্দ্র দেব বিবাহের প্রস্তাব করলেন। সম্পর্কের দিক দিয়ে শাস্ত্রসম্মত বিবাহে সামাজিক কোন বাধা ছিল না। কিন্তু দেব-পরিবার সম্বন্ধে রাধারাণীর পিতা আশুতোষ ভালো ধারণা পোষণ করতেন না। বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি পাওয়া গেল না। বাইরের প্রতিকূলতায় রাধারাণী নিজের অন্তরের দিকে ফিরে তাকালেন। শ্রদ্ধায়-কৃতজ্ঞতায়, সাহিত্যিক সমপ্রাণতায় তিলে-তিলে যে পরম অনুরক্তি গড়ে উঠেছে তার নির্দেশই তিনি মেনে নিলেন। ১৯৩১ সালের একত্রিশে মে দুই কবি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। বিবাহের সময় নরেন্দ্র দেবের বয়স তেতাল্লিশ; রাধারাণীর আটাশ। বাংলার সারস্বত সমাজ এই বিবাহকে স্বাগত জানাল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র দেব দম্পতিকে আশীর্বাদে অভিনন্দিত করলেন। বিবাহের এক বছর পরে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হল। শিশুটিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তৃতীয় দিনেই সে মায়ের কোল শূন্য করে চলে যায়। কয়েক বছর পরে কবি-দম্পতি একটি কন্যারত্ন লাভ করেন — কবিগুরুই তার নামকরণ করেন, নবনীতা।

নরেন্দ্র দেব তাঁর যথার্থ সাহিত্য-সাথী ছিলেন। নরেন্দ্র দেবের একক সম্পাদনায় সুবিপুল সাহিত্য কাব্য গ্রন্থ 'কাব্য-দীপালি' প্রকাশিত হয়। এই সংগ্রেহের সম্পাদনা ও সংকলনের নরেন্দ্র দেবকে রাধারাণী দেবী সক্রিয় সহযোগিতা করেন। ১৯৩১ সালের ৩১শে মে কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বাংলা ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮। তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজে "এই বিবাহ বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। কাব্য সাধনার সূত্রে একজন যশস্বিনী মহিলা কবির সঙ্গে আর এক সতীর্থ কবির বিবাহ একটি অনন্যপূর্ব ঘটনা। এই বিবাহে রবীন্দ্রনাথের ও শরৎচন্দ্রের বিশেষ সমর্থন ছিল। তারা কবি দম্পতিকে আন্তরিক আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে বিশেষ তারবার্তায় এই বিবাহে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তৎকালীন প্রায় সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই বিবাহ সংবাদ বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। লিলুয়ায় অনুষ্ঠিত হয় এই বিবাহ অনুষ্ঠান। হিন্দু বিবাহ রীতি অনুসারে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন খ্যাতনামা সম্পাদক লেখক শ্রী জলধর সেন।" এই বিবাহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কন্যার আত্মসম্প্রদান। এই বিবাহ সভায় যোগদান করেন শ্রী ও শ্রীমতী পি. চৌধুরী, শ্রী ও শ্রীমতী সুন্দরীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রী ও শ্রীমতী চারু রায়, শ্রী ও শ্রীমতী প্রেমাঙ্কুর আতর্থি, শ্রী ও শ্রীমতী গিরিজারঞ্জন বসু, শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রী নলিনীরঞ্জন সরকার, কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী, সুবোধ রায় ও জলধর সেন। লিলুয়ার দেব পরিবারে প্রাসাদোপম 'দেবালয়ে' নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী বিবাহের পরবর্তী কয়েকটি বছর অতিবাহিত করেছিলেন।

কবি নরেন্দ্র দেবের জন্ম ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সম্মুখস্থ ১ নং রমেন্দ্র দেব রোডের বনেদী দেব বংশে। তাদের পূর্ব পুরুষ নবাব আলীবার্দী খাঁর দেওয়ান ছিলেন। নবাবী খেতাব ছিল সরকার। নরেন্দ্র দেব সুপরিচিত সাহিত্যিক, বসুধারা ও ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। মেঘদূত ও ওমর খৈয়ামের কবিতাগুলির অনুবাদক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সদা হাস্যময়, সুরসিক নরেন্দ্র দেব দেব সাহিত্য কুটিরের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে দেবদম্পতির কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ সাদর আশীর্বাদ সহ নাম দিলেন নবনীতা।

শৈশবের সেই কোচবিহারের গ্রামের প্রকৃতি — তাঁর স্মৃতিকথায় কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তার একটি লেখাতে তা প্রকাশ পেয়েছে।

> *আমার ছেলেবেলা, কৈশোর কেটেছে উত্তরবঙ্গে। চারদিকে নদী মাঝখানে একটা দ্বীপ যেন, সেখানে আমরা থাকতাম। জায়গার নাম মাথাভাঙ্গা। বাবা ছিলেন জেলার হাকিম। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি গ্রামের হাটে দুর্গা ঠাকুর। মাটির প্রতিমা, এক চালার। পেছনে সুন্দর চালচিত্র। ধুপধুনোয় দেবীমূর্ত্তির চেহারাই যেত বদলে। ঢাকি, ঢাকের বাদ্যি, পুরোহিত, তন্ত্রধারকদের গমগমে গলায় মন্ত্রপাঠ সব মিলিয়ে দারুণ। সবাই নতুন জমাকাপড় পড়ত, আমরাও। কলকাতা*

থেকে পার্শেলে শাড়ি আসত আমাদের। ডুরেপার, রঙীন সুতোয় বোনা শান্তিপুরী। কলকাতা থেকে আত্মীয়রা পাঠাতেন। একখানি করেই শাড়ি হত আমাদের, তা নিয়েই কত আনন্দ। চারদিন ধরে সেই শাড়ি পড়েই ঘোরা। আবার বাড়ী এসে সেটাকে সুন্দর পাট করে গুছিয়ে রাখা। আরও ছেলেবেলায় আসত পাছাপেড়ে শাড়ি। ভাইদের জন্য নতুন ধুতি। আর আসত কলকাতা থেকে নতুন জুতো। পায়ের মাপ-ছাপ তুলে পাঠান হোত। তারপর পার্শেলে চলে আসত জুতো। সারা বছর আমরা অবশ্য আশপাশের দিশি মুচিদের তৈরী জুতো কিনতাম। এমনি সময়, আর পুজোতে মা খুব চওড়া পাড় সাদা শাড়ি পরতেন।...

...তখন, সেইসব পুজোর দিনে আমরা খুশী থাকতাম একটা শাড়ীতে, অথচ এ যুগে দেখি জামার ওপর জামা, শাড়ীর ওপর শাড়ী, পোষাকেও ওপর পোষাক অথচ কারুর মুখে সেই হাসির ঝলক নেই, যা আমরা দেখেছি ছোটবেলায়। আমাদের বাল্যবয়সে বাড়ীর কাজের লোকেদেরও কোন জিনিষ দিলে তারা কত খুশী হত। এখন সব একেবারে বদলে গেছে। — ('পুজোর স্মৃতি ' রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন - ১, পৃঃ ২৮৯)[১]

১৯৪৮ সালে W.B.P.E.N. (West Bengal Poets Essayists Novelists)-এর যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত হলেন নরেন্দ্র নাথ দেব ও রাধারাণী দেবী মনোনীত হলেন। ১৯৫০-এ PEN এর কনফারেন্সে স্বামী-স্ত্রী দুজনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রূপে ইওরোপ যাত্রা করেন। বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে প্রায় ছ মাস পরে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। এই সফরকালে কন্যা নবনীতাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। ১৯৫৫ সালে পূর্ব্ব ইওরোপ ও সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করেন। পুনর্বার ফিনল্যণ্ডের পীস কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী যাত্রা করেন একই বৎসরে। ঐ সময়ে বিখ্যাত বিপ্লবী হো-চি-মিন, বিশ্ববিখ্যাত রহস্য লেখিকা আগাথা ক্রিস্টি, মিখাইল সালোকভ, ইলিয়া এলেনবুর্গ প্রভৃতি ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৯ সালে কন্যা নবনীতা উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে ১৯৬০ সালে নবনীতার বিবাহ হয়। এক বছর অগেই বাগ্‌দান পর্ব হয় কেমব্রিজে। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর দৌহিত্র অমর্ত্য সেন। সে সময় আচার্য ক্ষিতিমোহন জীবিত ছিলেন। ভাবী নাতবউ নবনীতা পেয়েছেন তাঁর অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক স্নেহ; পেয়েছেন তাঁর কাছ থেকে অনেক চিঠি। এমন সুন্দর মেয়ে-জামাই নিয়ে বড়ো সুখে, বড়ো আনন্দে দেবদম্পতি তৃপ্ত ছিলেন। নবনীতা অমর্ত্যর দুই কন্যা অন্তরা-নন্দিনী—তাঁদের এ সময়ের সুখী জীবনকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল। একটি দশক কাটে পরম সুখে, পরম আনন্দে।

রাধারানীর জীবনে এরপরই এলো নিদারুণ আঘাত। ১৯৭১ সালের ১৯শে এপ্রিল কবি নরেন্দ্র দেব দেহত্যাগ করেন। রাধারাণী পুনরায় বিধবা হলেন। "ভালো-বাসা" যেন অপূরণীয় শূন্যতায় পরিব্যাপ্ত আজ। তাঁর স্থিতধী চিত্ত কিন্তু পরম দৃঢ়তায় একে মেনে নিলো।

মাত্র একটি বছর। এবারের আঘাত যেন তীব্রতর। নবনীতা বিদেশ থেকে ফিরলেন দুটি শিশুকন্যা সহ। কবিকন্যা নবনীতা দেবসেন লিখছেন:

> *জীবনের শেষ পনেরো বছর তিনি প্রায় ঘরের বাইরে বের হননি — ১৯৭৫-৭৬ - এ শরৎ শতবার্ষিকীর — ঐ একটা বছরে মা যেন নতুন করে জেগে উঠেছিলেন। তারপরে একেবারেই অন্তরীণ জীবন। বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মা স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী থাকতে পছন্দ করতেন। সভাসমিতি কোনকালেই তাঁর মনের মতো ছিল না, বাবা ছিলেন সভাসুন্দর স্বভাবের মানুষ। কিন্তু শরৎ শতবর্ষে মায়ের নানা জায়গা থেকে ডাক এসেছিল, তিনি সানন্দে সেই ডাকে সাড়াও দিয়েছিলেন।*
>
> *১৯৭৫ বছরটা বিশ্বের নারীবর্ষ ছিল, মা তাতে উদ্বুদ্ধ বোধ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র বিষয়ে এবং নারীমুক্তি বিষয়ে বিভিন্ন সভাসমিতিতে মূল্যবান বক্তৃতা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন সেই বছর ১৯৭৫-৭৬ - এ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ছোট বড়শহরে বক্তৃতা দিয়েছেন — লক্ষ্ণৌ, কানপুর থেকে কোচবিহারে, রায়গঞ্জে।*[১০]

১৯৭৫ সালে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালায় বক্তৃতা দেন। ১৯৭৬ সালে ধারাবাহিক ভাবে 'দেশ' পত্রিকায় 'শরৎচন্দ্র — মানুষ ও শিল্প' লিখতে থাকেন। ১৯৮৩ সালে তাঁর ৮০ বছর পূর্ণ হলে বিশেষ জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁর 'ভালোবাসা' বাড়ীতে বিশিষ্ট জ্ঞানী গুণী জনের সমাবেশ ঘটে। ১৯৮৬ সালে রাধারাণী দেবী 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' ভূষিত হলেন। ১৯৮৮ সালে বালিগঞ্জের "ভালো-বাসা" বাড়িতে নরেন্দ্র দেবের জন্মশতবর্ষ উদযাপন করা হয়। রাধারাণীর সানন্দ উপস্থিতিতে সে অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত হোয়েছিল। ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সালে, ৮৬ বছর বয়সে রাধারাণীর তিরোধান ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি কন্যা নবনীতা, দুই দৌহিত্রী অন্তরা ও নন্দনাকে রেখে গিয়েছেন। অধ্যাপিকা নবনীতাও বাংলা সাহিত্যের জগতে একটি প্রতিষ্ঠিত নাম।

মায়ের রচনার প্রতি কী অসীম শ্রদ্ধায় আর গভীর মমতায় বিদুষী কন্যা নবনীতা বলেন :

> *নিজের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে যদি তাকিয়ে দেখি রচনাগুলির দিকে — কী দেখি? কাকে দেখি? মাকে নয়। আমার মা রাধারাণী দেবীকে আমি দেখেছি সাম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে। যশস্বী, প্রিয়মাণ স্বামী, ও অনুগত সন্তান-সমেত সুচারু*

একটি সংসার-জীবনে সম্পূর্ণ, আপন মননশীলতার গুণে সুধীমণ্ডলে সম্মানিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ব্যক্তিত্ব, যাঁর প্রতিটি কথার মূল্য আছে, যাঁর প্রতিটি পদ-চয়নে আত্মবিশ্বাস ঝল্‌সে ওঠে।

এই রচনাবলীর ভূমিকা লিখতে গিয়ে যে তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, এখনও আমার পক্ষে আমার মা রাধারাণী দেবীর সঙ্গে তাঁকে মেলাতে পারা শক্ত, যদিও তাঁর জীবনস্মৃতির সঙ্গে এই মেয়েটির গল্পের চরিত্রগুলির অসামান্যরকম মিল রয়েছে। গল্প এবং প্রবন্ধগুলি থেকে আরও বুঝতে পারি যে, এই মহিমময়ী, আত্মত্যাগী দুঃখিনী মেয়েটিকে খোলসের মতো পরিত্যাগ করে তার ভস্মাবশেষ থেকে পুনর্জাত হয়েছিলেন দ্বিতীয় প্রজন্মের রাধারাণী দেবী। যাঁর পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যেও মহত্ত্বের, নিঃস্বার্থতার, স্নেহমমতার অভাব দেখিনি। কিন্তু এইসব প্রবন্ধ পড়ার পবে বুঝতে পারছি মাতৃত্ব তাঁর কাছে আকৈশোর কতটা জরুরি ছিল। বালিকা রাধাবাণীর মনে বালবিধবা জীবনের প্রধান ব্যর্থতা, এই বাধ্যকরী বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ। হয়তো দ্বিতীয় বিবাহটিব জন্য অনেকখানি দুঃসাহস তাকে জুগিযেছিল এই মাতৃত্ব অর্জনের স্বপ্নই। এবং দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করি, মা হবার পর থেকেই রাধারাণী দেবীব কলম ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে আসে। অভাব কিসের ছিল, সময়ের, না অন্তরের তাগিদের, আমাদের এখন তা আর জানবার উপায় নেই।'[১১]

(খ) সাহিত্য জীবন

অতি বাল্যকাল থেকেই রাধারাণী সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর সাহিত্য-সাধনার বিকাশ ঘটে মেজদার হাতে লেখা পারিবারিক পত্রিকা 'সুপথে'। প্রায় একই সময়ে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সাময়িক পত্রে তাঁর একাধিক কবিতাও প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ থেকে রাধারাণী দেবীর রচনা ভারতবর্ষ, বসুমতী, 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', কল্লোল, উত্তরা, প্রবাসী, বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ হতে থাকে। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। এ সময়ে তিনি রাধারাণী দত্ত নামে লিখতেন। ১৯২৯ সালে যখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লীলাকমল' প্রকাশিত হয়। মানব হৃদয়ের চির তৃষ্ণাতুর মনোভাব প্রকাশের খণ্ডকাব্য এই 'লীলাকমল'। প্রসঙ্গত অধ্যাপকজগদীশ ভট্টাচার্য কথিত ও বিশ্লেষিত স মজাতীয় পাশ্চাত্য এক কবিদম্পতির কথাও উল্লেখযোগ্য :

বাংলার সহৃদয় কাব্যরসিক-সমাজে দেবদম্পতিকে বাংলার ব্রাউনিঙ-দম্পতি বলে সম্মানিত করেছেন। ইংরেজ সমাজে ব্রাউনিঙ দম্পতির প্রেমনিষ্ঠা সকলেরই শ্রদ্ধার বস্তু। বাংলার কবি-দম্পতিও তাঁদের চারুশীলিত জীবনচর্যায়

বিদগ্ধ রসিক সমাজের ভালোবাসা অর্জন করেছেন। তা ছাড়া রবার্ট ব্রাউনিঙ্ (১৮২২-১৮৮৯) এবং এলিজাবেথ ব্যারেটের (১৮০৬-১৮৬১) সঙ্গে বাংলার কবি দম্পতির জীবনের যেন আরও কিছু সাদৃশ্য আছে। এলিজাবেথ ব্যারেট অবশ্য রবার্ট থেকে বয়সে ছ-বছরের বড়ো ছিলেন। সেক্ষেত্রে রাধারাণী নরেন্দ্র দেবের পনেরো বছরের ছোটো। উভয় ক্ষেত্রেই হৃদয়ের আকর্ষণ গড়ে উঠেছে সাহিত্য-জীবনের সমপ্রাণতা থেকে। রবার্ট তেত্রিশ বছর বয়সে ইতালি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এলিজাবেথের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৪৫ সালের একুশে মে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হয়। রবার্ট ও এলিজাবেথের এই প্রেমকে 'one of the most romantic literary love stories' বলা হয়ে থাকে। এলিজাবেথ বয়সে শুধু ব্রাউনিঙের থেকে বড়োই ছিলেন না, ছেলেবেলায় মেরুদণ্ডে আঘাত লাগায় তিনি চলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং সারা জীবন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়েই কাটাচ্ছিলেন। তাঁর গতিবিধি বিছানা থেকে সোফার মধ্যেই গন্ডীবদ্ধ ছিল। এই শারীরিক অক্ষমতা নিয়েই এলিজাবেথ কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। রবার্ট তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই তাঁকে ভালবেসে ফেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এলিজাবেথের পিতার কাছে তাঁর কন্যার পাণি প্রার্থনা করেন। পিতা এডওয়ার্ড ছিলেন অত্যন্ত একগুঁয়ে জেদি পুরুষ। তাঁর ইচ্ছা ছিল, পঙ্গু এলিজাবেথ আজীবন কুমারীই থাকেন। কাজেই তিনি বিবাহের প্রস্তাবে বিরক্ত হলেন। তাঁর সম্মতি পাওয়া গেল না। এলিজাবেথ রবার্টকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর অনুরাগ গোপন করেই রাখতেন। অবশেষে রবার্টেরই জয় হল। প্রথম সাক্ষাতের ষোলমাস পরে উভয়ে গোপনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এডওয়ার্ড কন্যার এই গোপন বিবাহের কথা কিছুই জানতে পারলেন না। বিবাহের এক সপ্তাহে পরে এলিজাবেথ নীরবে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে গেলেন। সে-গৃহে তিনি আর আর কোনোদিনই ফিরে আসেননি। রবার্ট এলিজাবেথকে নিয়ে চলে গেলেন প্রেমের দেশ ইতালিতে। সেখানেই তাঁদের মিলিত জীবনের আনন্দময় বাকি দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। ইতালির আলো-হাওয়ায় এলিজাবেথ কিন্তু অনেকটা সেরে উঠেছিলেন। দু-বছর পরে পাঁচ মাইল ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারতেন। বিবাহের তিন বছর পরে কবি-দম্পতির একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিবাহের সময় এলিজাবেথের বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁদের দাম্পত্য-জীবন পনেরো বছরের। ১৮৬১ সালে এলিজাবেথ যখন শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তাঁর বয়স ছাপ্পান্ন, রবার্ট সবে পঞ্চাশে পড়েছেন। পত্নীর মৃত্যুর পরে তিনি ইতালি পরিত্যাগ করে ব্রিটেনে ফিরে আসেন। জীবনের বাকী আঠাশ বছর বিপত্নীক কবি প্রিয়তমা পত্নীর প্রেমের স্মৃতিকেই অন্তরে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। প্রেমের কবি হিসাবে ব্রাউনিং ইংরেজি সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

পঙ্গু এলিজাবেথ যেমন রবার্টের প্রেমের স্পর্শে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছিলেন, রাধারানী দেবীও তেমনি প্রেমের স্পর্শে শুধু দুরারোগ্য হাঁপানির প্রকোপ থেকেই নিষ্কৃতি পাননি, অভিশপ্ত জীবনের বন্দীদশা থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন। প্রেমই 'লীলাকমল'-এর কবির জন্ম দিয়েছে।[১২]

এরপর ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হল অপরাজিতা দেবী নামে লিখিত ১৩টি কবিতায় সমৃদ্ধ 'বুকের বীণা'। এই কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্য জগতে আলোড়নের সৃষ্টি হল। ১৯৩০। তৎকালীন সমস্ত সাময়িক পত্রে খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকগণ এই ব্যতিক্রমী কবিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বলা যেতে পারে অপরাজিতা ছদ্মনামের আড়ালে কবির আসল পরিচয়ের সন্ধানে তাঁরা দীর্ঘকাল সচেষ্ট থাকেন।

এই কাব্যের ব্যতিক্রমী কবিতাগুলি 'ড্রামাটিক মনোলগের' আকারে মেয়েলি ভাষায় লেখা। কলেজ বোর্ডিংয়ে থাকতেই অথবা নববধূটির অনুরাগ সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী তাদের মুখে বসিয়ে দিয়েছেন। 'কৈফিয়ৎ', 'আঁধারে আলো' কবিতাগুলির বাস্তবতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভোলবাব মত নয়। ১৯৩১ সালে কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহের পর যুগ্মভাবে সম্পাদিত 'কাব্য দীপালির' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৯২৭ সালে নরেন্দ্র দেবের একক সম্পাদনায় সুবিপুল কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থ 'কাব্য দীপালি'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশনার কাজে সম্পাদনা ও সংকলনে নবেন্দ্র দেবকে রাধারাণী সক্রিয় সহযোগিতা করেন। বিবাহের প্রথম বার্ষিকীতে (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) ৩৪টি মিলন বিষয়ক সনেট-সংগ্রহ 'সিঁথি-মৌর' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি রাধাবাণী 'কবিভগিনী স্বর্গীয়া এলিজাবেথ ব্যাবেট ব্রাউনিঙ'-কে উৎসর্গ করেন। বাংলা সনেটের ইতিহাসে রাধারাণীর সনেট প্রতিভাব প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই 'সিঁথি-মৌর'। এই কাব্যে সেক্সপীয়র ও পেত্রাক্রিয় দুই রীতর সনেটই লেখা হয়েছিল। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ অভিজ্ঞতার চমৎকার নিদর্শন এই 'সিঁথি-মৌর'। ১৯৩৪ সালে দশটি কবিতার সংগ্রহ 'আঙিনার ফুল' অপরাজিতা দেবী নামে প্রকাশিত হয়। এখানেও নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা হয়েছে। শব্দ ব্যবহার, বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য ও নারীর ব্যক্তিগত চিন্তাধারার প্রতীক যেন এই কবিতাগুলি। লিরিকাল মুহূর্তগুলি নাটকীয় ঘনঘটায় সমৃদ্ধ। শুধু কবিতাই নয় এই কাব্যগ্রন্থটিকেসমসাময়িক সমাজের চলমান রূপরেখাও বলা চলে। ১৯৩৫ সালে ১৮টি কবিতার সংগ্রহ 'পুরবাসিনী' কাব্যগ্রন্থ (অপরাজিতা দেবী নামে লিখিত) প্রকাশিত হয়। কথপোকথনের ভঙ্গীতে রচিত এই গ্রন্থে বিচিত্র জীবনের কাহিনী অশ্রু হাসিতে মাখামাখি হয়ে আছে। এ যেন নারীর নিজস্ব চোখে দেখা বাঙালী সমাজের চরিত্র চিত্রণ। সংসারে নারী-পুরুষের ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্ক এই কবিতায় ধরা পড়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য চিরন্তন বাঙালী দিদির মনোবেদনা এই কাব্যের 'দিদি' কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। ১৯৩৭-এ নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে যুগ্ম সম্পাদনায় দেব সাহিত্য কুটির থেকে

ছোটদের পূজা বার্ষিকী 'সোনার কাঠি' প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সেই অপরাজিতা দেবী নামে লিখিত চতুর্থ ও শেষ কবিতার সংকলন 'বিচিত্ররূপিনী' প্রকাশিত হয়। এতে মোট ১৩টি কবিতা ছিল। বৈষ্ণব রসশাস্ত্র উজ্জ্বল নীলমণিকে অনুসরণ করে নায়িকার ৮টি রূপ বা লক্ষ্মণকে বর্তমান সময়ের মতন করে সাজিয়ে উপস্থাপিত করেছেন কবি। 'পূর্বরাগ' থেকে 'অভিসারিকা' বা কলহান্তরিতা সমসাময়িক পরিবেশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ১৯৩৮ সালে 'বনবিহগী' কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের চিত্রাঙ্কন করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসু এবং গ্রন্থের প্রুফ দেখেছিলেন রাজশেখর বসু। ১৯৪৬এ 'কথাশিল্প' নামে একটি ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। এটি মূলতঃ নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে সহ-সম্পাদনা এবং এতে মোট চোদ্দজন লেখক-লেখিকার গল্প ছিল। প্রকাশক ছিলেন এম. সি. সরকার।

স্বতন্ত্রভাবে রাধারাণী কোন উপন্যাস রচনা করনেনি। কেবল ১৯৩৫ এ কাত্যায়নী বুকস্টল থেকে প্রকাশিত ৮ জন লেখকের লেখা 'অষ্টমী' নামাঙ্কিত উপন্যাসটির একটি অধ্যায় তিনি লেখেন। অনুরূপভাবে কালিদাস রায় সম্পাদিত 'রসচক্র: বারোয়ারী উপন্যাস'এর (১৯৩৬) নবম পরিচ্ছেদ রাধারাণীর লেখা। ১৯৩৯এ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অসমাপ্ত উপন্যাস 'শেষের পরিচয়' প্রকাশিত হয়। এই অসমাপ্ত উপন্যাসখানি সমাপ্ত করবার ভার শরৎ-সাহিত্যের খ্যাতনামা প্রকাশকগণ রাধারাণী দেবীর উপরই দিয়েছিলেন। এই অতি দুরুহ কাজটি তিনি এমন ক্ষমতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করেন যে অনেকেই বিস্ময়বোধ করেছিলেন। বইখানি পড়ে বোঝা যায় না যে কোনখানে শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে রাধারাণীর লেখার সংযোগ ঘটেছে। এর ১৬ থেকে ২৬ অধ্যায় রাধারাণী দেবীর রচনা। কিন্তু এমন কৃতিত্বের সঙ্গে এর সৃষ্টি কর্মটি সম্পাদনা করা হয়েছে যে পূর্বে বলে না দিলে এটি যে দুই লেখকের দু সময়ের রচনা তা কখনই পাঠকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ১৯৪৪ সালে 'মিলনের মন্ত্রমালা' প্রকাশিত হয়। বেদ সংহিতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি থেকে হিন্দু বিবাহের মন্ত্রগুলোকে অনুবাদ করে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এটি কেবল অনুবাদই নয় ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। এখানেও ভাবনার এবং রচনাশৈলীতে কবির দক্ষতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত।

১৯৫৩ তে ইউ. এন. ধর থেকে প্রকাশিত 'নীতি ও গল্প' ও ১৯৫৫তে একুশটি কিশোরপাঠ্য গল্প-কাহিনীর সংকলন 'গল্পের আলপনা' প্রকাশিত হয় (মহালয়া ১৩৬২)। ১৯৭১এ 'সাহিত্যতীর্থ' পত্রিকায় একগুচ্ছ বিরহ-বিষয়ক সনেট প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত বিরহ অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ বলে এটি বই হয়ে কখনও প্রকাশিত হয়নি। ১৯৭৬এ আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয় 'শরৎচন্দ্র: মানুষ এবং শিল্প'। এটি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছিল। এটি তাঁর একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ। এটি আসলে শরৎচন্দ্রের

শতবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত 'শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতা মালা'। ১৯৮৩ সালে তার ৮০ বছরের জন্মোৎসবে 'তাঁকে লিখিত থলে থেকে সামান্য এক গোছা তুলে নিয়ে' 'টুকরো চিঠি' নামে প্রকাশিত হয় (৩০শে নভেম্বর ১৯৮৩, ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৯০)।

রাধারাণী দেবীর সমগ্র সাহিত্য-জীবন পর্যবেক্ষণ করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবন কখনই একমুখী নয়। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বিভিন্ন দিকে তাঁর প্রতিভা পরিস্ফুট হয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যথা ভারতবর্ষ, প্রবাসী, উত্তরা, মানসী ও মর্ম্মবাণী, বিচিত্রা, মাসিক বসুমতী, জয়শ্রী, প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হলেও তৎকালীন বহু আলোচিত 'শবিনারের চিঠি' পত্রিকায় সর্বদাই তাঁকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কবিতনয়া সুকবি নবনীতাকে স্মরণ করা যেতে পারে:

> *রাধারাণী দত্ত নামে দুঃসাহসী তরুণীটির সাহিত্যজীবন সরল হয়নি, 'শনিবারের চিঠি'র অনেক আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর গল্প থেকে, 'মণি-মুক্তা' অংশে উদ্ধৃত করবার মতো আপত্তিজনক অংশ খুঁজে পেতেন সম্পাদক, যদিও বালবিধবা মেয়েটির লেখা গল্পগুলিতে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সর্বদাই প্লেটনিক। এমনকি রাধারানীর লেখা প্রবন্ধেও বিদ্রূপের রসদ তাঁরা খুঁজে পেতেন। 'অন্তঃপুরের রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের জন্য 'শনিবারের চিঠি' কার্টুন বের করেছিল — রাধারাণী বসে কুটনো কুটছেন, ইজিচেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা কবি। কিন্তু মানুষের দেহজ রিপুতাড়না ও আত্মিক প্রেমভাবকে রাধারাণী পৃথক করে দেখেছেন, দেহ ও মনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন জীবনযাপনে, রিপু জয় করাকেই মনুষ্যোচিত কাজ বলে সম্মান দিয়েছেন। প্রেমে দেহের জিৎ তাঁর চোখে মনুষ্যত্বের পরাজয়।*[১৩]

তাঁদের এ সমালোচনা কেবল সাহিত্যিক সমালোচনা নয়। অনেকসময়ই তা ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে গিয়েছে। তাঁর গল্প থেকে 'মণিমুক্তা' অংশে উদ্ধৃত করার মত আপত্তিজনক অংশ সন্ধান পেয়েছিলেন। যদিও রাধারাণী দত্ত নামক বালবিধবা মেয়েটির লেখা গল্প ও প্রবন্ধ সর্বদাই ছিল প্লেটনিক ও যুক্তিগ্রাহ্য। তথাপি, এমনকি প্রবন্ধেও, বিদ্রূপের অংশ তাঁরা কী গভীর আগ্রহে খুঁজে বার করতেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা মানুষের দেহজ কামনা ও আত্মিক প্রেমভাবকে রাধারাণী সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখেছেন। তাঁর নায়িকারা প্রেমে পড়ে বটে কিন্তু তারা সনাতন সংজ্ঞায় সতী। অনায়াসে দেহকে উত্তীর্ণ করে যেতে পারে তাদের প্রেম। বরং তাঁর বহু গল্পে দেখতে পাই, বালবিধবা, কুমারী ও বিবাহিতা নারীর একাকীত্ব ও অসহায়তার কথা। তারা সাহস করে প্রতিবাদ করে না। সামাজিক নিয়ম কানুন ভাঙ্গে না। আত্মিক বলে দৃঢ় ও ঋজু থাকে।

এইসঙ্গেই উল্লেখ্য 'কল্লোল' গোষ্ঠীর অসহযোগিতাও রাধারাণী বহন করেছিলেন। বিশেষ করে নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহের পূর্বে এবং পরে অনেক ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। তাই 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে' পাঠিত প্রবন্ধ 'সাহিত্য বিচারে পুরুষ নারী ভেদ' (১৩৩৭) এখনও সমান জরুরী। এবং একথাও অস্বীকার কররা নয় যে বাংলা সাহিত্যের সমালোচকদের চোখে আজও পর্যন্ত নারী ও পুরুষ—সাহিত্যকার হিসাবে সমান গুরুত্ব পান না। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখাগুলি তাই বহু প্রশংসিত হয়েছিল, প্রচুর খ্যাতিও পেয়েছিল। বিশেষকরে অপরাজিতা দেবী নামে লেখাগুলিতে তিনি পুরুষ লেখকদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং সেই চ্যালেঞ্জে তিনি সার্থক হয়েছিলেন। এই অপরাজিতা দেবী মানুষটি কে, কী তাঁর পরিচয়, তা জানবার জন্য সকল শ্রেণীর পাঠকের মধ্যেই যথেষ্ট কৌতূহল লক্ষ্য করা গিয়েছিল্য

(গ) পুরস্কার ও সম্মান লাভ

বাংলা সাহিত্যে মৌলিক অবদানের জন্য ১৯৫০ সালে রাধারাণী দেবী 'ভুবন মোহিনী' পুরস্কার পান।

১৯৫০এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'লীলাপুরস্কার' প্রদান করে তাঁর সাহিত্য সাধনাকে সম্মানিত করেন।

১৯৮৬ সালে 'অপরাজিতা রচনাবলীর' জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা কবি আনন্দ বাগচীর একটি রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে পারি:

> *পঞ্চাশ বছরের বাংলা-সাহিত্যের পলিমাটির তলা থেকে অপরাজিতা দেবীর কাব্যচতুষ্টয়কে উদ্ধার করে যাঁরা পুনর্জীবিত করার প্রয়াস পেলেন এবং যে নির্বাচক মণ্ডলী সে রচনাবলীকে দর্শনমাত্রেই রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করলেন তাঁরা উভয়েই যে সেই সশ্রদ্ধ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। এক দেহে ভিন্ন আত্মা অপরাজিতা দেবী নিজের অজ্ঞাতসারেই একদিন কবি রাধারাণী দেবীর যে অপরিসীম ক্ষতিসাধন করেছিলেন, এবারে রবীন্দ্র পুরস্কারে তারই পরোক্ষ ক্ষতিপূরণ লক্ষ্য করা গেল। বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী জুড়ে পুরুষতান্ত্রিক বাংলা সাহিত্যে এক সমান্তরাল, সচল ও রমণীয় ব্যক্তিত্ব রাধারাণী দেবীর এই পুরস্কার এক অর্থে সমগ্র নারী সমাজেরই পুরস্কার। অন্যথায় অশীতিপর সাহিত্যচেতন অথচ নিরাসক্ত এই মহিলার জীবনে এই ঘটনা কোন নতুন মাত্রা যোজনা করল এমন মনে হয় না। বহু খ্যাতি তিনি ইতিপূর্বে পেয়েছেন। পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লীলা পুরস্কার' ও 'ভুবনমোহিনী পদক'।*[১৪]

১৯৭৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালায় ভাষণ প্রদানের জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করেন।

রবীন্দ্র-শরৎ যুগের সঙ্গে কল্লোল পরবর্তী যুগের এবং পি.ই.এন সূত্রে আন্তর্জাতিক লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতীয় তথা বাংলা সাহিত্যের সংযোগ সাধনে তিনি সক্রিয় ছিলেন।[১৫]

(ঘ) অপরাজিতা দেবী

সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত কবিকন্যা নবনীতা দেবসেন লিখছেন:

রাধারাণী ও অপরাজিতা পৃথকভাবে সংকলিত হলেন। কেননা কবি স্বয়ং দুটি ব্যক্তিত্বকে সযত্নে আলাদা করে রেখেছিলেন শুধু কাব্যলক্ষণেই নয়, হস্তাক্ষরে পর্যন্ত। সেই হস্তলিপি এতই আলাদা, যে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে অপরাজিতাকে উৎসাহ দিয়ে একের- পর-এক পত্র লিখেছেন রাধারাণীর ঠিকানায়।[১৬]

রাধারাণী দত্ত বা রাধারাণী দেবী যখন সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত নাম তখন অপরাজিতা দেবীর আবির্ভাব ঘটে। কবি হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসিত ও আলোচিত হন। এই অপরাজিতা দেবীর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে একটা বিশেষ ঘটনা। আশ্চর্যের ব্যাপার অপরাজিতা দেবীর পরিচয় নিয়ে সেসময়ে সাহিত্য জগতে তীব্র বিতর্ক—বিবাদ ঘটে। কেউ কেউ শরৎচন্দ্রের ছদ্মনামে লেখা বলে মনে করতেন। অনেকে অ-প-রা-জি-তা অর্থে পাঁচজন অপরাজিতা দেবীর লেখাকে লেখকের ছদ্মনাম বলেও মনে করতেন।

এমনকি যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের লেখা 'বঙ্গের মহিলা কবি'[১৭] গ্রন্থেও রাধারাণী দেবী ও অপরাজিতা দেবীদু—জন পৃথক কবি বলে স্বতন্ত্র ভাবেই লেখা হয়েছে।

পরবর্তী কালে রাধারাণী দেবী এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। দীর্ঘ ১২ বছর অপরাজিতা দেবী নামে লেখার পব তিনি অপরাজিতা নামে লেখার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নেপথ্য কাহিনীটি রহস্য গল্পের মতই। অতঃপর একটি উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি:

বোধ হয় এর বছরও হয়নি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লীলাকমল' বেরিয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর চায়ের মজলিশে মহিলাদেব সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী একটি কঠোর মন্তব্য করেছিলেন 'মেয়েদের কোনো নিজস্ব ভাষা নেই, তারা শুধু পুরুষদের অনুকরণে লেখে...' কথাটা রাধারাণী দেবীকে গভীরভাবে বিদ্ধ করে। এই কথাটিকেই তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে দীর্ঘ বারো বছরের জন্য 'অপরাজিতা' নাম্নী এক কাল্পনিক চরিত্রের জনান্তিকে চলে গেলেন। শুরু হয়ে গেল রাধারাণীর নতুন একস্‌পেরিমেন্ট — নারীর চোখে দেখা অন্তরঙ্গ সংসারচিত্র নারীর বয়ানে। দৃষ্টিকোণ বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিষয় কল্পনা, আঙ্গিক

> *এবং কৌতুককটাক্ষ-কন্টকিত ভাষা ও ছন্দের নতুন চাল বাংলা সাহিত্যে এক নতুন স্বাদের চমক এনে দিল। কাল্পনিক অপরাজিতা চরিত্রের নিপুণ অভিনয় ভালোই জমেছিল সেদিন। সাময়িক সাহিত্য ইতিহাসের সেই আলোড়িত পৃষ্ঠার জীবন্ত নায়িকা অপরাজিতা দেবী আধুনিককালের চোখে বিস্মৃতা এবং প্রয়াতা হলেও তিরিশের দশকের গোড়ায় এবং সেই দশকব্যাপী তিনি ছিলেন বহু-নিন্দিত, অভিনন্দিত এবং অনুকৃত এক নতুন রীতির পথিকৃৎ। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ছদ্মবেশী নারী বিদ্রোহের সূচনা, এদেশে ফেমিনিস্ট আন্দোলনের মুখবন্ধ তিনিই রচনা করে গিয়েছিলেন সেই পঞ্চাশ বছর আগে।*[১৮]

ঘরোয়া কথাবার্তা, সাদামাটা শব্দ চয়ন তাছাড়া পয়ারের মাপ মেপে নিয়েও ছড়ায় ছন্দের ঝিলিক। আমাদের সংসারের দৈনন্দিনতার মধ্যে যে হাসিকান্নার কৌতুকের ফুলঝুরি সেই ফুলঝুরিকে কাব্যে সাজানো। যে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ- মধ্যবিত্তদের ঘরোয়া সমস্যা ও বিষয় নিয়ে অপরাজিতা দেবীর কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল সে রকম অনেক পরিবারের ছেলেমেয়েরা তখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সন্ত্রাসে দীক্ষা নিয়েছে। স্বাধীনতা ও নতুন সমাজের স্বপ্ন তাদের চোখে। আইন-অমান্য, অসহযোগ ও ভারতছাড়ো আন্দলোনের উতরোল ঢেউয়ে রাজবন্দীদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। অপরাজিতা দেবীর কাব্যে বাইরের এই উথাল পাতাল ঝড় বাদলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব নেই। তবু তিরিশের দশকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের বাঙ্গালী অন্দরের চিত্র এই কবিতাগুলিতে পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত। সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসের সে আলোড়িত দিনগুলির নেপথ্যচারিণী অপরাজিতা দেবী আধুনিক কালের চোখে বিস্মৃতা ও প্রয়াতা হলেও তিরিশের দশকে শুরুতে ও সেই দশক ব্যাপী তিনি ছিলেন বহু নিন্দিত ও বহু আলোচিত ও বহু অভিনন্দিত ও অননুকৃত এক ব্যতিক্রমী পথিকৃত। বলা যায় বঙ্গভূমির সাহিত্যজগতে এ যুগের নতুন নারীবাদী আন্দোলনের মুখবন্ধ বা ভূমিকা তিনিই রচনা করেছিলেন।

এ কথাও বলা প্রয়োজন যে সাহিত্যের এই চরিত্র বদল কোন আকস্মিক বা সাময়িক ঘটনা নয়। রাধারাণী দেবীর সমগ্র জীবন ও স্বভাবের মধ্যেই এই দ্বৈত সত্তার অস্তিত্ব ছিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিধবা হওয়া একটি বালিকা তার দুর্ভগ্যকে মেনে নিতে রাজি হয়নি। সে ভাগ্য পরীক্ষায় বদ্ধপরিকর। পরিবারের সচেতন সম্ভ্রম ও মমতার আড়ালে প্রবাহিত করুণা ও কৃপার মধ্যে নিহিত অপমান তাকে স্পর্শকরে ফেলে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, উপার্জন ক্ষমতা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিছুই তাঁর ছিল না। তাঁর হাতে ছিল কেবল একটি ঈশ্বর দত্ত চাবি। প্রতিভা, যুক্তি ও জেদ, যা দিয়ে তিনি বহির্বিশ্বে দাঁড়ানোর সাহস সংগ্রহ করেছিলেন। তাই স্বনামে গভীর লিরিক কবিতা লিখছিলেন। সেই বিচিত্র হৃদয়-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার উপলব্ধিকে জীবনের রসে জারিত করে রক্ষণশীল সমাজের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করার সাহস অর্জন করেছিলেন। কবি নরেন্দ্র দেবকে বিবাহ করে তাঁর

দুঃসাহসী সততা ও প্রেমের একনিষ্ঠ মূল্যবোধকে প্রমাণিত করেছিলেন নতুন করে। অপরাজিতা নামের আড়ালে তাঁর আকস্মিক আত্মগোপন ও সেই অজ্ঞাতবাসকে একটানা বার বছর চালিয়ে যাওয়া নেহাতই একটা চ্যালেঞ্জের ফসল এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। এর পেছনে আরও একটি কারণ ছিল। ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাধারাণী দেবীর স্বগৃহে আহূত এক প্রীতি সভায় অভিনন্দনের উত্তরে লেখিকা বলেছেন "সাহিত্যে ঠিক দেখতে পাওয়া, বলতে পারা আর ঠিক জায়গায় থামা — তিনটি জিনিষই সমান কঠিন।"

কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কলমের ও জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়ার পর সংবরণের চেষ্টা যে কোন সফল ও উচ্চমানের সাহিত্যিকের একটি বড় গুণ। নতুন সাহিত্য জীবন, তথা সুখী দাম্পত্য জীবন তাঁকে এতই আবিষ্ট ও সুখী করেছিল যে তিনি স্বেচ্ছায় অন্তরীণ হয়েছিলেন। আমরা পুনরায় স্মরণ করি কবিকন্যা অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেনকে :

> *আমার মা রাধারাণী দেবীকে আমি দেখেছি সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে। যশস্বী প্রিয়মান স্বামী, ও অনুগত সন্তান-সমেত সুচারু একটি সংসার জীবনে সম্পূর্ণ, আপন মননশীলতার গুণে সুধীমণ্ডলে সম্মানিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ব্যক্তিত্ব, যাঁর প্রতিটি কথার মূল্য আছে, যাঁর পদ-চয়নে আত্মবিশ্বাস ঝলসে ওঠে।*[৯]

অপরাজিতা দেবীর চারটি কবিতার বই 'বুকের বীণা'(১৩৩৭), 'আঙিনার ফুল'(১৩৪০, 'পুরবাসিনী'(১৩৪২) এবং 'বিচিত্ররূপিণী'(১৩৪৩), তিপ্পান্নটি কবিতায় যে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবমুখীনতা, তার প্রধান বিষয় হল নারীর পারিপার্শ্বিক সমাজ ও সংসারজীবন। বলতে গেলে নারীর চোখে দেখা নারীর জীবন। সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকায় নারী নিজেকে ও পুরুষকে দেখতে গিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের সংস্কার ও মূল্যবোধগুলিকে পরিস্কার করে দেখতে পেয়েছে।

অসংখ্য চরিত্রের মুখচ্ছবি ও সামাজিক রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতে তিনি ব্যবহার করেছেন মুখের ভাষাকে যার নাম 'কলোকয়াল'। ড্রামাটিক মানোলগ বা নাটকীয় সংলাপের সঙ্গে তাৎক্ষণিকতাকে যুক্ত করে একদিকে লিরিক মুহূর্তের নাট্যধর্মী 'ডিটাচমেন্ট' ভেঙেছেন অন্যদিকে অ্যান্টি রোমান্টিক অভিঘাত দিয়ে কবি কল্পনাকে বাস্তবভূমিতে দাঁড় করিয়েছেন। অপরাজিতার কবিতা প্রচন্ড জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ দ্রুত নিঃশেষিত সংস্করণ। এ ছাড়াও তৎকালীন নানা সাহিত্যের আড্ডায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার সে যুগের কিছু রক্ষণশীল মানুষ কবিতাগুলির মধ্যে শালীনতার অভাবও লক্ষ্য করেছিলেন। আনন্দ বাগচী এ বিষয়ে লিখছেন:

> *শরৎচন্দ্র অপরাজিতার কবিতাকে অশ্লীল বলেছিলেন। সে যুগের বেশ কিছু রক্ষণশীল মানুষ কবিতাগুলির মধ্যে স্ত্রীসুলভ শালীনতার অভাব লক্ষ্য করলেও রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর পরিমুখ সাহিত্যরসিক কিন্তু অভিনন্দনই*

জানিয়েছিলেন সেদিন। এই ধরণের কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ 'সোসাইটি ভার্সেস' আখ্যা দিয়ে একটা কথা অকপটে অপরাজিতাকে জানিয়েছিলেন, 'এদের নৈপুণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প।' রাধারাণীও জানতেন সে কথা। তাই আয়ু ক্ষয় হবার অনেক আগেই তিনি সাহিত্যের বাজার থেকে অপরাজিতার খাতা তুলে নিয়েছিলেন নির্মম হাতে। কিন্তু কবিতা হিসেবে এই কাব্যগ্রন্থগুলির স্থায়িত্ব যাই হোক এর অন্য মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই।[২০]

কিন্তু যশস্বী ও প্রতিষ্ঠিত সমকালীন শিল্পী ও সাহিত্যিকরা তো একে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে এর সঙ্গে এ ধরনের রচনার স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অপরাজিতা জানতেন সে কথা। তাই 'বিচিত্ররূপিনীর' সংস্করণ নতুন করে প্রকাশ হবার আগেই তিনি সাহিত্যের বাজার থেকে 'অপবাজিতার খাতা' তুলে নিয়েছিলেন নির্মম হাতে। কিন্তু কবিতা হিসেবে এর মূল্য যতই কম হোক না কেন ব্যঞ্জনা বা গভীরতা না থাকলেও এর অন্য মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কবিতাগুলি পঞ্চাশ ষাট বছর আগের ঘরোয়া ছবিই শুধু নয়, জীবন যাপনের তথ্য হিসেবেও এর গুরুত্ব কম নয়, যার ঐতিহাসিক মূল্য কোনদিনই ম্লান হবে না। সামাজিক বিবর্তনের অনেক ইঙ্গিত, হারিয়ে যাওয়া অনেক সম্পর্ক ও বিস্মৃতপ্রায় বহু উদাহরণ এর মধ্যেই বিদ্যমান। আর ছন্দের ক্ষিপ্র অথচ নমনীয় গতিশীলতাও নজর এড়িয়ে যায় না। যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে প্রয়োজন-অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারেও কবির নৈপুণ্য অসাধারণ। তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি মেয়েদের নিজস্ব সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার প্রথম এবং এখন পর্যন্ত পথিকৃৎ হিসেবে অপরাজিতার কবিতা আজও অভিনন্দিত হবে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে অপরাজিতার কবিতাই রবীন্দ্রনাথকে দুটি দীর্ঘ কৌতুক-কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেছিল। আর সেদিক থেকে পত্র সাহিত্যের ভাণ্ডারেও দুখানি অন্তরঙ্গ চিঠি আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারের মর্যাদা বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। এ কৃতিত্বও অপরাজিতারই প্রাপ্য।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমরা এই পর্ব শেষ করব। উদ্ধৃতিটি আয়তনে তুলনায় দীর্ঘ হলেও — এ বিষয়ে পাঠকের বহুবিধ কৌতূহল নিরসনে একান্তই সহায়ক:

১৩৪১ সালের মাঘ মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'নারী-প্রগতি' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তার উত্তরে অপরাজিতা দেবী কবিকে তাঁরই ব্যবহৃত ছন্দে একটি উত্তর লিখে পাঠান। 'প্রহাসিনী'র 'আধুনিকা' কবিতাটি তারই প্রত্যুত্তরে রচিত। অপরাজিতা দেবীর উত্তর 'সে-কালিনী ও আধুনিকা' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর 'আধুনিকা' নামে ১৩৪১ সালের চৈত্রমাসের প্রবাসীতে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিগুরুর সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও অপরাজিতা দেবী আত্মপ্রকাশ করেননি। এই উত্তর-প্রত্যুত্তর বছর তিনেক পরে লেখা কবির চিঠি (৩০/৩/৩৭) থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অপরাজিতা দেবীর এই রহস্যময় অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে রাধারাণী দেবী, 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থের লেখককে যে পত্রখানি লেখেন তা অপরাজিতা রহস্য-উন্মোচনের সহায়ক।

রাধারাণী দেবী বলেছেনে, 'অপরাজিতার ছদ্মনামে নতুন গঠনের কবিতায় হাত দিয়েছি যখন, মনে তখন দুরন্ত আবেগ। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলাম, দ্বাদশ বর্ষ নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে ছদ্মনামে ও ছদ্ম-পরিচয়ে এই পরীক্ষা করব, বচনা তার শক্তি ও উৎকর্ষের দ্বারা যথার্থ মূল্য পেতে পারে কিনা। এই আত্মপরীক্ষায় আমাকে বহু কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বহু দুঃখ সইতে হয়েছে।'

রাধারাণী দেবীর সবচেয়ে অগ্নিপরীক্ষার দিন এল যখন রবীন্দ্রনাথকে জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলে এলেন যে, অপরাজিতা মেয়ে নয়, পুরুষ। ক্রুদ্ধ কবি রাধারাণী দেবীকে ডেকে পাঠালেন। সেদিনও রাধারাণী দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে কবিকে বললেন, 'অপরাজিতা আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। এখন আত্মপ্রকাশ করার উপায় নেই তার। তবে অপরাজিতা তার আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হলেই সে আপনার সামনে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে আপনাকে প্রণাম করে ধন্য হবে।'

রাধারাণী দেবীর এই আত্মগোপন-ক্ষমতা অসামান্য। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহের পূর্ব থেকেই তিনি অপরাজিতা নামে কবিতা লিখতেন। হাতের লেখাও একেবারে আলাদা করে ফেলেছিলেন। অপরাজিতার প্রথম গ্রন্থ 'বুকের বীণা' বিবাহের আগেই প্রকাশিত হয়। বিবাহের পরেও কিছুদিন নবেন্দ্র দেব জানতে পারেননি, তাঁর স্ত্রী-ই অপরাজিতা দেবী। একদিন মধ্যরাতে পড়ার ঘরে স্ত্রীর সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর টেবিলে দুই ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা কবিতার খসড়া ও তার অনুলিপি দেখে প্রথম বুঝতে পারেন রাধারাণীই অপরাজিতা। বিস্ময়ের বিষয়, নরেন্দ্র দেবও গৃহিণীর এই গোপন কথা কোনোদিন কাউকে প্রকাশ করেননি।[২১]

গ্রন্থপঞ্জী: প্রথম অধ্যায়

১. রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ১ — রাধারাণী দেবী (প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৯৯)
২. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — রাধারাণী দেবী (প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৪০৮)
৩. লীলাকমল — রাধারাণী দেবী — ১৩৩৬
৪. বুকের বীণা — অপরাজিতা দেবী — ১৩৩৭
৫. কাব্যদীপালি — সম্পাদক: নরেন্দ্র দেব — ১৯২৭
৬. সিঁথি মৌর — রাধারাণী দেবী — ১৩৩৯
৭. আঙিনার ফুল — অপরাজিতা দেবী — ১৩৪০
৮. পুরবাসিনী — তদেব — ১৩৪২
৯. বিচিত্ররূপিনী — তদেব — ১৩৪৩
১০. কথাশিল্প — সম্পাদক: নরেন্দ্র দেব — ১৯৪৬
১১. বনবিহগী — রাধারাণী দেবী — ১৩৩৯
১২. শরৎচন্দ্র: মানুষ এবং শিল্প — তদেব — ১৯৭৬
১৩. পুরোনো বাংলা গদ্য — আনিসুজ্জামান (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
১৪. মধ্যযুগের বাংলা কাব্যপাঠ — ড. নির্মল দাশ
১৫. বঙ্গের মহিলা কবি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রসঙ্গসূত্র : প্রথম অধ্যায়

১.	রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ১ (রাধারাণী দত্ত ও রাধারাণী দেবী এবং আমরা — নবনীতা দেবসেন)	১২-১৩
২.	তদেব	১৩
৪.	তদেব	১৮ ১৯
৫	তদেব	১৮
৬.	রাধারাণী দেবীব শ্রেষ্ঠ কবিতা: ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য	৭
৭.	রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ১: নবনীতা দেবসেন	২০
৮.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা: ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য	৮
৯.	রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১ (পুজোর স্মৃতি)	২৮৯
১০.	রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১: নবনীতা দেবসেন	৫ ৬
১১.	তদেব	৭, ১০, ২০
১২.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা: ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য	৮-৯
১৩.	রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ১: নবনীতা দেবসেন	১
১৪.	সাহিত্যের নানারকম — আনন্দ বাগচী	৫২
১৫.	তদেব	৫২
১৬.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা: প্রাক্কথন: নবনীতা দেবসেন	৬
১৭.	বঙ্গের মহিলা কবি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৩৪৯-৩৬৪
১৮.	সাহিত্যের নানাকরম — আনন্দ বাগচী	৩৬৪-৩৭৪
১৯.	রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১: নবনীতা দেবসেন	৫২-৫৩
২০.	সাহিত্যের নানারকম — আনন্দ বাগচী	৫৫-৫৬
২১.	রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য	১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ক) সমকালীন সমাজ ও সাহিত্যের পরিবেশ

সাহিত্য—দেশকাল সম্পর্করহিত, বৃন্তহীন, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। সাহিত্য বলতে আমরা উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, রম্যরচনা, নাটক এই শিল্পরূপগুলোকে বুঝে থাকি। সাহিত্যের অবলম্বনীয় বিষয় মানবজীবন আর একটু বৃহৎ ভাবনায় মানবসভ্যতা। কোন বিশেষ দেশের, বিশেষ সমাজের, বিশেষ ভাবের বা বিশেষ দিক রূপায়িত হলেও যদি তা মানবজীবনের কোন চিরন্তন বৃত্তি বা সমগ্র সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয় তবেই তা যথার্থ সহিত্যের মর্যাদা পেতে পারে। সমাজকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রেও সাহিত্যিকের ভূমিকা তাই অসামান্য। তাই গোর্কীর 'মাদার' বা টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা' ও শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' ব্যবস্থা বা অব্যবস্থারই সাক্ষ্য দেয়। একথা মনে রাখতে হবে যে সহিত্যের জীবন মহাকাব্যের আদর্শময় জীবন নয়। এ জীবন বাস্তব কাল প্রভাবিত ও স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত। যতদিন না জীবনের রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে ততদিন যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়নি। আধুনিককালে যখন গণতন্ত্রভিত্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি হ'লো তখনই এই সাহিত্যের সূচনা হলো। তাই যে কোন সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরালে দেশকালের অমোঘ প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সৃষ্টি-রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তাকে স্বীকৃতি জানালেও শিল্পী-মানসের ওপর সমকালীন সমাজ; পরিবেশ, রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণকে গুরুত্বহীন বলা যায় না। কেননা শিল্পের উপাদান সংগ্রহে পরিবেশকে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হয়। এরই মধ্যে দিয়ে শিল্পী বা সাহিত্যিক জটিল জীবনরূপকে আবিস্কার করেন। কেননা a real literary interest is an interest in man, society and civilization

রাধারাণী দেবীর সমসাময়িক সমাজ ও সাহিত্যিক পরিবেশ আলোচনায় আমরা তাই বিশেষ এক কালপর্বের মধ্যেকার সাহিত্যের বিচিত্র প্রবণতাকে আলোচনা করব। সে কাল বিশ শতকের সূচনা থেকে ১৯৪০ সাল অবধি। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভিক মুহূর্তের মধ্যবর্তী সময়। তার আগে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখব যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্বাপর সম্বন্ধকে কখনই অস্বীকার করা চলে না। কোন ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য বা শিল্পকে তাই সময়ের মানদন্ডে সীমিত রাখা যায় না।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত জন্মলাভ ঘটেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ এই আলোচনাব পর্বের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে। তবু এই পর্ব প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে—তখনকার শান্ত সমাহিত জীবনের উপর এসে পড়া পরিবর্তনের হাওয়ার কথাও। এবং এই পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক লগ্নে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙালী চিন্তাধারায় ও প্রচলিত মূল্যবোধের ওপর প্রথম আঘাত হানলো। পরাধীন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে পারলো না। শুরু হলো সারা দেশ জুড়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। আবাব এই অশান্ত পরিবেশ হঠাৎ করে কিছুটা তলিয়ে যায় গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে।

এর পরেই আমাদের আলোচনা সূত্রেই এসে পৌছই ১৯১৪ সালে। পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয সময়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে দীর্ঘদিনের সহজ শান্ত জীবনস্রোত প্রবল ঘূর্ণাবর্তের রূপ গ্রহণ করে। ভারতবর্ষ এই অভিঘাতের প্রত্যক্ষ রূপ বা স্পর্শ পায়নি বটে। কিন্তু পরোক্ষভাবে সেই বেদনাদীর্ণ অভিঘাতের চিহ্নকে অস্বীকারও করতে পারেনি। বিশেষতঃ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিগূঢ়। বিশেষতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজসাধ্য হওয়ায় সংবাদ আদান- প্রদান সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল নয়। সর্বোপরি, বড় কথা হোল ভারতবর্ষ তখন বৃটিশ পদানত। স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বরাজের কথা চিন্তা করে বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশের পক্ষ সমর্থন করেছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালে যখন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা হলো তখন ব্রিটিশের রাজনৈতিক চালে স্বরাজ এল না ভারতবর্ষে; পরিবর্তে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড পরিকল্পনা (১৯১৯) কায়েম হলো। প্রদেশগুলি স্বায়ত্বশাসন লাভ করল বটে, কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যয়-নির্বাহের জন্য সরকারের কোন দায়িত্ব থাকলো না, পরিবর্তে আয়ের একাংশ ভারত সরকারের রাজস্ব হিসেবে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতে হল। যুদ্ধকালীন দুর্মূল্যতার চাপে দেশবাসী তখন বিপন্ন। সেই সময় এই অর্থনৈতিক চাপ বাঙলার বুকে জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসল। ঠিক এই অবস্থার সময় এল নিষ্ঠুর দমননীতিমূলক 'রাওলাট আইন'। এই আইনের প্রতিবাদে জলিয়ানওয়ালাবাগের বিশাল জনসমাবেশ ও নরহত্যালীলা (১৯১৯) ও প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ দেশব্যপী বিক্ষোভেরই এক বিমূঢ় রূপ। দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ বিক্ষোভ এবার বোঝাপড়ার প্রত্যাশায় গান্ধীজীর ডাকে 'অসহযোগ আন্দোলনে' (১৯২০) সামিল হলো। বৈপ্লবিক চেতনায় সঞ্জীবিত জাতির জীবনে পারিপার্শ্বিক দিক-পরিবর্তনের সূচনা হল। প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে দেখা দিল সুতীব্র সংশয়। সংশয় জর্জরিত জাতির জীবনের এই ক্রান্তিকালে বাঙলার যুবচিত্ত অশান্ত, বিহ্বল ও হতাশ হয়ে পড়ে। আর এই হতাশার ছবি ফুটে উঠেছে তৎকালীন সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশে রচিত সাহিত্যে এমন ছবিই প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক।

বাঙালী জনমানসের এই মানসিক সংকটের যুগে আর একটি পরিবর্তন সূচিত হল 'সবুজপত্র' প্রকাশের কালে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় এই সাহিত্য পত্রিকায় সর্বপ্রথম তারুণ্যের জয় ঘোষিত হল উচ্চকণ্ঠে। প্রমথ চৌধুরীর মতে — একটা নতুন কিছু করার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসেছে, ইউরোপের স্পর্শে, তা প্রকাশ করার জন্যে। এর প্রধান লক্ষণ গতিশীলতা। প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রের মাধ্যমে সমকালীন জীবনবোধে তথা সাহিত্যচিন্তায় এই গতি, মুক্তি ও আনন্দের বাণী ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। আধুনিক বিশ্বের অন্তর্নিহিত জীবনবোধ ও মানসপ্রবণতাকে আমাদের সমাজ ও ব্যক্তির চেতনায় সঞ্চার করার মত গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করল সবুজপত্র।

একালের সাহিত্যে তাই পাশ্চাত্য প্রভাবিত বুদ্ধি ও মননের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সবুজপত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরকালের বাঙলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ে সবুজপত্র বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এই মুক্ত দৃষ্টির পশ্চাতে সবুজ পত্রের ভূমিকা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক্ না কেন, সাহিত্যে উনিশ শতকের রেনেসাঁসের বা পুনর্জাগরণের প্রভাবকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না। উনিশ শতকের মানবপ্রত্যয় যা ছিল সমস্যা কেন্দ্রিক, তাই অভিনবরূপে দেখা দিল। 'ব্যক্তি' যে কেবল সমাজের ছায়ামাত্র নয়, তার যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, — সমাজকল্যাণমুখী ও নীতিবোধ প্রচারে ব্যস্ত বঙ্কিমের সাহিত্যে তা তেমনভাবে পরিস্ফুটিত হয়নি। বিশ শতকের সূর্যোদয়ে সেই প্রবণতার অবসান ঘটলো। সৃষ্টি হলো জীবনধর্মী, দ্বন্দ্ব জটিল বাস্তব সচেতন সাহিত্যের। রবীন্দ্রনাথেব হাতেই এই ধারার সূচনা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় স্নাত রবীন্দ্রনাথের শিল্প-ব্যক্তিত্ব আজন্ম মানবতাবাদে বিশ্বাসী। সুদৃঢ় মানব প্রত্যয় ও শাশ্বত জীবন সত্যে আস্থা —রবীন্দ্রদর্শনের মূল কথা। অন্তরের প্রদীপ্ত বিশ্বাসকে বুকে ধরে তিনি মানবধর্মের বিচিত্র জটিল রূপের অনুসন্ধান করে তাঁর বিপুল পরিমাণ রচনায তার স্পষ্ট ও সুন্দর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

১৯১৪ ও তৎপরবর্তী বছরগুলি রবীন্দ্র প্রতিভার বিশ্লেষণের দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পর্বের সৃষ্ট সাহিত্যে — তা গল্প, কবিতা, উপন্যাস বা প্রবন্ধ যাই হোক্ না কেন, আমরা রবীন্দ্রনাথের অপরূপ ও আশ্চর্য মননদীপ্তি, লাবণ্যময় কবিকল্পনা, সংস্কারমুক্ত উদার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সজীবতা এবং সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর প্রবল আগ্রহ দেখতে পাই।

বাঙালী মনের পুরনো প্রচলিত ধারা, সংস্কার ও বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে প্রবলভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বিশ্বযুদ্ধ ও সবুজপত্র উভয়েই। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং রবীন্দ্র শিল্পসত্তার দিক থেকেও ১৯১৪ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অব্যবহিত পূর্বে তিনি পাশ্চাত্যদেশ পরিভ্রমণ করে এসেছেন (১৯১২-১৩); প্রাক্-যুদ্ধের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্তি তাঁকে এনে দিয়েছে বিশ্বজোড়া

খ্যাতি এবং এটাও সত্য যে তার কিছু কাল আগে পর্যন্ত তিনি একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মহলের তীব্র সমালোচনার পাত্র ছিলেন।

সে যাই হোক যুদ্ধের অভিঘাত সংবেদনশীল কবিচিত্তে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করল, তাঁর বেদনাহত চিত্তের অভিব্যক্তি ঘটল এ সময়কার সাহিত্যে। তাই দেখতে পাই দুঃখ, পীড়ন, ব্যক্তিমনের মুক্তি ও সংগ্রামের ছবি এই পর্বের সাহিত্যে উজ্জ্বল। ১৯১৬র 'চতুরঙ্গ' থেকে তার সূচনাও প্রসারিত। 'তিনসঙ্গী' পর্যন্ত এই পর্বের রচনায় দেখতে পাই কাহিনী রসের প্রাচুর্য। যদিও 'চোখের বালি'তেই এর সূচনা, তবু সমৃদ্ধি যেন এই পরবর্তী পর্বে। ব্যক্তিসত্তার নিগূঢ় জটিল সমস্যা ও ব্যাক্তিস্বরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই যেন এ সকল রচনার মুখ্যবিষয়। শুধু তাই নয়, ভাষা ও বর্ণনারীতির ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই ভাষার একদিকে যেমন বৈদগ্ধ্যের পরিচয় অন্যদিকে lyric -এর মধুর ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ব্যক্তি-স্বরূপের রহস্য ও তাৎপর্য অন্বেষণ করেছেন যেন। কিন্তু একটি কথা না বলে উপায় নেই যে এই পর্বের বাস্তব পটভূমিতে অঙ্কিত চরিত্রগুলিকে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ বাস্তব চরিত্র বলে মনে করতে পারি না। তাদের মধ্যেকার অসাধারণত্বই এদের পরিচিত সাংসারিক সীমানা থেকে এদের সকলকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। কিন্তু এই অসাধারণত্বের উপলব্ধি কেবল এই পর্বে বা কালচিহ্ন বিশিষ্ট সাহিত্যেই অনুসৃত নয়। দেশকালের পটভূমিকা বর্জিত চরিত্রগুলিতেও আত্মসচেতনতাধর্মী মননশীল আত্মসমীক্ষার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। গোরা, চারঅধ্যায় প্রভৃতি রচনায় সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রবণতা ও স্বাধীনতার অভীপ্সা বর্ণিত হলেও তা অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পর যাঁর কথা মনে আসে তিনি হলেন সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। সংস্কারমুক্ত মননধর্মী স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর বিদ্যমান তাঁর রচনায়। রবীন্দ্র-পরবর্তী কালের সাহিত্যকার হলেও প্রমথচৌধুরীর রচনায় স্বকীয়তাও বিদ্যমান। সমকালীন অস্থিরতাময় পরিবেশে তিনি বলিষ্ঠ প্রাণধর্মের উপাসক। তাঁর গল্পের অনেক চরিত্র সহজ আদিম চেতনার প্রতিমূর্তি - ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভ, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির দ্বারা তাড়িত। যা পরবর্তীকালের কল্লোল চেতনা বা কল্লোল পর্বের লেখকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বলা যেতে পারে, যে কল্লোল পর্বের সূচনা তাঁরই হাতে হয়েছিল। 'পূজার বলি', 'যশ', 'অবনীভূষণের সাধনা' প্রভৃতি রচনা তার প্রমাণ। এই সংস্কার মুক্ত সংকীর্ণ নীতি নিয়মের উর্দ্ধে মনের অনন্য প্রকাশের মূলে ফরাসী সাহিত্যের objective দৃষ্টিভঙ্গী ও ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপক প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।

এই কালপর্বে সকল রচনাকারই সকলেই যে প্রচলিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করেছেন তা নয়। অনেক লেখকই অস্থিরতার এই পর্বে উনিশ শতকের সহজ সুস্থ জীবন ও নীতিবোধকে অবলম্বন করেছেন। পাপের পরাজয় ও পুণ্যের শাস্তিবিধানের জন্য তাঁরা অলৌকিক

কাহিনী ধারার অবতারণা করেছেন গল্পে-উপন্যাসে। এমনই একজন লেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর রত্নদীপ (১৯১৫) সিঁদুর কৌটা প্রভৃতি লেখা যেন উনিশ শতকের রক্ষনশীল ধারারই অনুবর্তন। ঘটনা প্রধান এইসব লেখায় সমাজ-সংসারের নীতিনিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এইসব সাহিত্যের চরিত্রে সমগ্রতার অভাব প্রায়শই দেখা যায়।

এই পর্বের প্রাচীন পন্থানুসারী কয়েকজন মহিলা লেখিকার নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য কালপর্বের পূর্বেই এদের সাহিত্যজীবনের সূচনা। পরবর্তী সময়েও এঁরা অজস্র পরিমাণ রচনা করেছেন, কিন্তু দেশকালের এই পরিবর্তনের যুগে এঁদের চিন্তাধারায় বা লেখায় কোন বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়নি। এঁদের মধ্যে নিরূপমা দেবী, অনুরূপা দেবী সমাজ চেতনা ও নীতিবোধের দিক থেকে বঙ্কিম পথানুসারী। পাশ্চাত্যপন্থী আধুনিক জীবনবোধের ও সেই জীবন সঞ্জাত মূল্যবোধের প্রভাব এঁদের লেখায় তেমন সুস্পষ্ট নয়। পরবর্তীকালে এঁদের ধারা অনুসরণ করে চলেন ইন্দিরা দেবী, গিরিবালা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রভৃতি লেখিকারা। অন্তঃপুরবাসিনী রক্ষণশীল সমাজের সনাতন রীতিনীতি ও আদর্শবোধের অমোঘ আবেদনসর্বস্বতাই এঁদের লেখার বৈশিষ্ট্য। তবুও এদের বিশিষ্টতার কারণ এই যে এতদিন পুরুষের দৃষ্টিতে লেখকসমাজ নারীর মনোভাবের পরিচয় দিতেন। কিন্তু পুরুষের কল্পনাকে অস্বীকার করে এদের বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় দান নিঃসন্দেহে মৌল প্রতিভার পরিচায়ক যা পরবর্তীকালের লেখিকাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে বলা যায়।

কিন্তু সব মহিলা সাহিত্যিকই প্রাচীনপন্থী ছিলেন না। বিশ শতকের কালধর্ম ও জীবনপরিবেশের সামগ্রিক অভিঘাত ও অনিবার্য প্রভাব যে বৃহৎ রূপান্তরের সামনে এনে ফেলেছিল তার থেকে নারীসমাজও নিষ্কৃতি পাননি। যুগ পরিবেশের প্রভাবে আত্মপ্রকাশ করল 'প্রবাসী'। প্রবাসী গোষ্ঠীভুক্ত শান্তাদেবী ও সীতাদেবী, ব্রাহ্মসমাজের আবহাওয়ায় লালিত এই দুই সহোদরার লেখনীতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিঘাত নারী সমাজের বিশেষ করে কলকাতা শহরের ওপর কিরূপ মানস-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তারই চিত্র এদের নানান রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। 'চিরন্তনী' (১৯২০) 'রজনীগন্ধা' প্রভৃতি উপন্যাসে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জীবিকা অর্জনের কঠিন সংগ্রামে রত নারীর জীবনে প্রেমের আর্বিভাব যে মানসিক জটিলতা ও প্রবল বিহুলতা সৃষ্টি করেছে, তার মধ্য দিয়েই আধুনিক নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত এই পর্বের 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের মানসিক প্রবণতা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। এই কালসীমার লেখক হলেন মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। বলা বাহুল্য এঁরা সকলেই রবীন্দ্র প্রভাবিত। 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠী সাহিত্যে যে মুক্তিচেতনা ও গতিধর্মের প্রয়োগ সাধনায় আগ্রহী হয়েছিল আলোচ্য লেখকগোষ্ঠী সেই প্রয়াসকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করার প্রয়াস পেলেন।

ভারতীয় এই অভিনবত্বের পথ ধরে আবির্ভূত হলেন শরৎচন্দ্র। কথাসাহিত্যের এই জনপ্রিয় লেখক 'ভাবতী' গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সাহিত্যে সম্পূর্ণ বাস্তববাদী অতিসাধারণ চরিত্রেব সুযোগ করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা ও কল্পনার সমৃদ্ধি ও প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠক সমাজকে অভিভূত করেছিল সত্যি, কিন্তু তৃপ্ত করতে পারেনি। মানুষকে বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষকে যথার্থভাবে জানাব ঐকান্তিক প্রেরণা নিয়ে শরৎচন্দ্র এলেন কথাসাহিত্যে। সংবেদনশীল শিল্পীর মানবীয় দৃষ্টি দিয়ে তিনি সামন্ততান্ত্রিক একান্নবর্তী পরিবারের ও সমাজেব স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। বড়দিদি (১৯১৩) থেকে শুভদা (১৯৩৮) ২৫ বছরে তাঁর ২৫ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরিবেশ-সচেতন ও অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ এই লেখকের রচনায় তাই সমকালীন সব বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে। মনে প্রাণে শরৎচন্দ্র গতযুগের বংশধর হলেও যুগ সংকটের অস্থিরতাময় পরিবেশকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। সমাজকে স্বীকার করেছেন আবার নতুন মূল্যবোধের প্রেরণায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও দ্বিধা করেননি। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের চেতনা উদ্দীপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের যে জীর্ণ কুসংস্কারাচ্ছান্ন নিয়মাবলির পূনর্মূল্যায়ন ও আমূল সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল, প্রথমদিকে শবৎচন্দ্র সে সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯০৫-১২ এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তিনি উপেক্ষা করেননি। ঊনিশ শতকের রেঁনেসাঁসের পটভূমিতে ব্যক্তিচেতনার সাফল্যকেও শরৎচন্দ্র অস্বীকার করেননি। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নির্ণয়ে শরৎচন্দ্র প্রেমের পথকেই বেছে নিয়েছেন যদিও, কিন্তু তা সর্বক্ষেত্রে সমাজ অনুমোদিত প্রেম বা বিবাহিত দাম্পত্য প্রেম নয়। বিশেষভাবে সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশেষ পক্ষপাত ছিল। নারীর ব্যক্তিত্ব, মাতৃত্ব ও প্রেমিকা সত্তাকে শরৎচন্দ্রের লেখায় বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে। এই কালপর্বের যে রাজনৈতিক বিক্ষুব্ধময় জীবন, এই পর্বের যা বৈশিষ্ট্য, —তার চিত্রও দেখতে পাওয়া যায় 'পথের দাবী' উপন্যাসে। দেবদাস, সতীশ, সুরেশ চরিত্রগুলিও আধুনিক যুগের এই অস্থিরতার চিহ্ন বহন করছে। শরৎচন্দ্র তাই মুখ্যত যুগসন্ধির শিল্পী। একদিকে রক্ষণশীল সনাতন সামাজিক আদর্শ, অন্যদিকে নবজাগ্রত ব্যক্তিচেতনা যা আধুনিক যুগজীবনের মুখ্য লক্ষণ, শরৎচন্দ্রের সহিত্যে তার অনুপস্থিতি ঘটেনি।

একদিকে পুরাতনের অবক্ষয়, অন্যদিকে নূতন ভাবধারার ও চেতনার উল্লেখ এই কালপর্বে বাঙলা সাহিত্যে যে যুগ বা পর্বটি বিশেষ চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি করেছিল তা হল কল্লোল যুগ বা কল্লোল পর্ব। মূলতঃ কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে এই পর্বের সূচনা হলেও সাহিত্যের আসরে তা বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করে। তাই বাঙলা সাহিত্য তথা যুগের ইতিহাসে এদের সাফল্য মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। 'কল্লোল', 'কালি-কলম', 'শনিবারের চিঠি', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তী সাহিত্যের আদর্শবাদকে অস্বীকার করে উত্তপ্ত বিদ্রোহের উত্তেজনায় তরুণ সাহিত্যিকরা তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক নীতি ও রুচি এবং শালীনতার সংস্কারের ওপর আঘাত হেনে

মানবজীবনের গোপন অন্ধকারময় বীভৎস, ক্লেদাক্ত দিকগুলি দেখাতে আরম্ভ করেন। শালীনতার আবরণকে অগ্রাহ্য করে সমাজের নগ্ন বাস্তবরূপ উন্মোচনেই তাঁদের প্রবল উৎসাহ দেখা দিল। ফ্লবেয়র, জোলা, প্রভৃতি ফরাসী লেখকদের রচনায় 'ন্যাচারালিজম্' দেখা যায়। কল্লোলযুগের অনেক সাহিত্যিক তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মূলতঃ এঁরা রবীন্দ্রবিরোধী গোষ্ঠী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার অবাস্তবতা বা রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র বর্ণিত দেহাতীত প্রেমকে ব্যঙ্গ করা, নরনারীর সম্পর্কের নূতন মূল্যায়ন ও সমাজের আন্ত্যজ বা অবহেলিত শ্রেণীকে নিয়ে উৎসাহ —এই সাহিত্যধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৩২৯ (১৯২২) সালে গোকুলচন্দ্র নাগের সম্পাদনায় 'কল্লোল', ১৩৩৩ সনে 'কালি ও কলম' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। এর পরপরই প্রকাশিত হলো 'শনিবারের চিঠি', 'প্রগতি', 'ধূমকেতু', 'লাঙ্গল', ইত্যাদি পত্রিকা। কালের গর্ভে সেসব পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে সত্যি। কিন্তু সেকালের সাহিত্য পরিবেশকে উত্তপ্ত ও সক্রিয় রাখতে এদের তৎকালীন ভূমিকাকে বা অস্বীকার কোনো মতেই অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা যায় না কোন মতেই। শুধু বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে নয়, জীবন-জিজ্ঞাসার তীক্ষ্নতা ও জীবনবোধের গভীরতায়, এবং আঙ্গিক নৈপুণ্যে সাময়িকতার গন্ডী অতিক্রম করে এ সব সাময়িক পত্র বাঙলা সাহিত্যের চিরস্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে। এই পর্বের লেখকদের মধ্যে জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বনফুল, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাম। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দের লেখা একটি রচনা উল্লেখ করা যেতে পারে—

> *রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বছর আগেই একটা নতুন পদ্ধতির আভাস পাওয়া যাচ্ছিল বাংলা সাহিত্যে। সেটা কল্লোলের সময়। কল্লোলের লেখকরা মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন কিন্তু তিনি যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে কবিতা লেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। যদিও তাঁর কোন কোন কবিতায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়। তিনি ভারত ও ইওরোপের অনেক জ্ঞাত ও অনেকের মতে শাশ্বত বিষয় নিয়ে শিল্পে সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের নানারকম সঙ্কেত আছে যা তিনি ধারণা করতে পারেননি বা করেন নি। নতুন উপায়ে নতুন বিষয়ের অবতারণা করে কবিতা লেখবার প্রয়োজন বোধ করলেও রবীন্দ্রনাথ যা দিচ্ছিলেন কল্লোলীয় কাব্যে তার অনুলিখনই বেশী চলছিল। কবিতার ছন্দ বা আঙ্গিকে কোনো নতুন আবিষ্কার হয়েছিল বলে মনে হয় না তবে গদ্য কবিতার একটা বিশেষ ভঙ্গি — যা ঠিক রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় না — তার ভিতর কল্লোল নিজের মন খুঁজে পেয়েছিল বোধহয়।*[*]
>
> *— কবিতার কথা: জীবনানন্দ দাশ পৃঃ — ১১৩-১১৪*

বাংলা সাহিত্যের এই কালপর্বে রাধারাণী দেবী সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লীলাকমল' (১৯২৯) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা পুনরায় সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যকে স্মরণ করি:

> *লীলাকমল' রাধারাণী দেবীর প্রথম গ্রন্থ। 'লীলাকমল'ই স্বনামে তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।*
>
> *'কল্লোল-যুগ'-এ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত লিখছেন,*
>
> *'তিনি কল্লোল-যুগেরই কবি। ইদানীন্তন কালে তিনিই প্রথম মহিলা যাঁর কবিতায় বিপ্লব আভাত হয়েছে। তখনও তিনি দত্ত, দেবদত্ত হননি। এবং রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রাগৃহে আধুনিক সাহিত্যের যে বিচারসভা বসে তাতে ফরিয়াদী পক্ষে প্রথম বক্তা রাধারাণী। সেদিনকার তাঁর এই দার্ঢ্য ও দীপ্তি ভোলবার নয়।' (কল্লোল-যুগ, চতুর্থ সং, পৃ. ১৫৪।)*
>
> *এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্যে সহযাত্রী কবির কণ্ঠে রাধারাণী দেবীর ব্যক্তিত্ব এবং কবিমানস সম্পর্কে দুটি সার্থক উক্তি উচ্চারিত হয়েছে। এক: 'সেদিনকার তার সেই দার্ঢ্য ও দীপ্তি ভোলবার নয়'। দুই. 'ইদানীন্তন কালে তিনিই প্রথম মহিলা যাঁব কবিতায় বিপ্লব আভাত হয়েছে।' অচিন্ত্যকুমার রাধারাণী দেবীর ব্যক্তিত্ব দার্ঢ্য এবং দীপ্তির প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সংসার-জীবনে গৃহবধু হিসাবে রাধারাণী বিনয়ী, মঞ্জুভাষিণী। কিন্তু তাঁর সারস্বত ব্যক্তিত্ব যেমন আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় তেমনি প্রতিভার দীপ্তিতে জ্যোতির্ময়। রাধারাণী দেবীর কবিমানস সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমারের মন্তব্যটি ইঙ্গিতপূর্ণ: 'ইদানীন্তন কালে তিনিই প্রথম মহিলা যাঁর কবিতায় বিপ্লব আভাত হয়েছে।' 'বিপ্লব' শব্দটি অবশ্য এখানে মুখ্য অভিধার্থে ব্যবহৃত হয়নি — গৌণ অর্থব্যাপ্তিতে তা প্রভূত ব্যঞ্জনাবহ।*[৯]

এই নবোদিতা মহিলা কবিকে সকলেই প্রশংসা করেন। এমন কথা বলা যেতেই পারে যে পরবর্তী কালে অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে লেখার মধ্যেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। 'শনিবারের চিঠি'র অনেক আক্রমণ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর রচনার বিশেষ বিশেষ অংশ 'কল্লোল', 'শনিবারের চিঠি' তে বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত করা হতো। সনাতন ভাবধারা বা তৎকালীন আদর্শবাদে বিশ্বাসী রাধারাণী দেবী বা রাধারাণী দত্ত তাতে কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত হননি। অর্থাৎ সাহিত্যকার রাধারাণী দেবী ছিলেন আন্তরিকভাবেই সমাজমনস্ক ও সচেতন শিল্পী। এবং তাঁর গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা-শিশুসাহিত্য কোনো রচনাই সমকালীন পরিস্থিতি- বিবর্জিত হয়নি। অর্থাৎ সাহিত্যকার রাধারানী দেবী ছিলেন আন্তরিক ভাবেই সমাজমনস্ক ও সচেতন শিল্পী এবং কল্লোলপর্বের লেখকদের সঙ্গে রীতিমত সাহিত্যযুদ্ধ করে তিনি সাহিত্যকার হিসাবে স্বকীয়তা অর্জন করেছেন। তৎকালীন সময়ে এ বড়ো কম কৃতীত্বের কথা নয়।

(খ) রাধারাণী দেবীর সমাজ ভাবনা

সমাজচেতনার পটভূমিকা ও তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ বিষয়ে সামান্য আলোচনা এই প্রসঙ্গে একান্ত প্রয়োজন।

নারীর সামাজিক মূল্যায়ন ও স্বাধিকারের প্রশ্নে বিশ শতকের নারী আন্দোলনের ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। ইলেইন শোওয়াল্টার, ক্যাথারিন স্পেনসার প্রমুখ নারীবাদীদের নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফলে আধুনিক নারীসমাজের একটি প্রতিবাদী রূপ গড়ে ওঠে। নির্বিচারে সামাজিক রীতিনীতি ও শোষণ মেনে নেওয়া বর্তমান নারীর পক্ষে আর সম্ভব নয়। দেশে দেশে, কালে কালে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভেদ থাকলেও সকল কালের নারীসমাজই এক বিশেষ ধরণের সামাজিক শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে। তাই আপাত পার্থক্য থাকলেও নারীর দুঃখ-দুর্দশা পৃথিবীর সর্বত্রই এক ও অভিন্ন। কখনও ধর্মের নামে, কখনও বা সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য — নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে নির্বিচাবে। সমাজ-সম্প্রদায়ের গন্ডী টেনে অথবা অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে নারীকে পীড়ন করা হয়েছে। এই নিপীড়ন থেকে নারীর মুক্তির ভাবনা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ-সচেতন সহৃদয় সাহিত্যকারগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন।

> *১৩৩২ সনের বৈশাখে 'কল্লোল' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' কবিতাটি ছাপা হয়।*[৩]

এই কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যে আলোড়ন শুরু হয়। বাঙলার নারীচেতনার বিকাশে এরকম স্পষ্টবাদিতা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এই কাল পর্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক বাতাবরণটিও উপেক্ষা করার নয়।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা রদ আইন, ১৮৬৫ খ্রীঃ বিধবাবিবাহ আইন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার —এ সবই নারীচেতনার বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় মহিলারা পারিবারিক সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। বর্ধিষ্ণু পরিবারের কয়েকজন মহিলা ভিন্ন কেউ শিক্ষার সুযোগ তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারতেন না। স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করা সমাজ সংস্কারের অঙ্গ হিসেবেই বিবেচ্য হতো। এ বিষয়ে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারীগণ 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (Female Juvenile Society) স্থাপন করে কলকাতায় স্ত্রীশিক্ষার সূচনা করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের চেষ্টায় কলকাতায় একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপিত হয়। সেই স্কুলই পরবর্তীকালে বেথুন স্কুল ও কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উড

সাহেবের 'ডেসপ্যাচ'-এ স্ত্রীশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের বিশেষ নির্দেশ ছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৬৪০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাগরণের ক্ষেত্রে এই শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টায় নারীসমাজের মধ্যে আধুনিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ও নারী পুরুষের পারস্পরিক আদান প্রদানও অন্তঃপুর-বাসিনী নারীদের বাহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও মানসিকতা সৃষ্টিতে উমেশচন্দ্র দত্তর 'বামাবোধিনী' দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর 'অবলাবান্ধব', গিরিশচন্দ্র সেনের 'মহিলা', স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' ও 'কুমুদিনী' ও বাসন্তী মিত্রের 'সুপ্রভাত' ও 'ভারতমহিলা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য ছিল। আর্যকন্যা কর্তৃক জলন্ধরে প্রতিষ্ঠিত মহাকন্যা বিদ্যালয় ও কলেজ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

একটি কথা উল্লেখ করার মত যে শুধু স্ত্রীশিক্ষার প্রচার বা প্রসার নয় নানা সামাজিক সংস্কার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙলা মনীষিগণের নিববিচ্ছিন্ন আন্দোলন ও সফলতা নারী শিক্ষা ও চেতনার প্রসারে সাহায্য করেছিল। সতীদাহ প্রথা রদ ও বিধবাদের পুনর্বিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিলোপকরণ নারীদের দুর্দশা অনেকাংশে মোচন করেছিল। একথা ঠিক যে এই ধরণের সুবিধা কেবল শহর কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার বাইরে, বাংলা তথা ভারতের বৃহত্তর অংশে নারীর সামাজিক নিপীড়ন ও অত্যাচার অব্যাহত ছিল। এর বাইরে যে নারীরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন, হয় তাঁরা সমাজের বিশেষ শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, অথবা সমাজবহির্ভুত কোনো গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এই যুগের সাহিত্যে বিশেষ করে শরৎসাহিত্যে এদের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। বৃহত্তর সমাজ নারীর অধিকার সম্বন্ধে মোটেই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেনি।

তাই মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিধবা রাধারাণী দত্তর পক্ষে রাধারাণী দেবী হওয়া মোটেই সহজসাধ্য হয়নি। সমসাময়িক পুরুষ লেখকদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও একই সঙ্গে সামাজিক রীতিনীতির নাগপাশে তিনি আবদ্ধ থাকায় তাঁর প্রথম দিকের রচনায় রক্ষণশীল মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু যখন 'অপরাজিতা দেবী' রূপে তাঁর আবির্ভাবে তিনি বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে বিশ্বাসী হয়েছেন, তখন তাঁর সাহিত্য সাধনায় এক বিশেষ সমাজভাবনা বা চেতনার উদ্ভব হয়েছে। পুরুষের দৃষ্টিতে নারী বিষয়ক কবিতা ও প্রবন্ধ. গল্প ও সমালোচনায় তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ এক স্বতন্ত্র উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ঘটনা। অতিসাম্প্রতিক কালের লেখনীতেও আমরা এ বিষয়ে স্পষ্ট এবং দ্বিধাহীন মন্তব্য পেয়ে যাই :

> *বাংলাসাহিত্যে মানবীবিদ্যাচর্চার প্রেক্ষাপটে রাধারাণী দেবীর লেখার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে যে যদিও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-গুরু, কিন্তু (কিংবা হয়তো সেজনাই) তাঁর লেখার সিংহভাগ জুড়ে আছে নারী। নারীর সামাজিক মুল্যায়ন এবং*

তার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নারী-লেখনীর সাহিত্যিক মূল্যায়ন — এই দুটি তাঁর লেখাতে ফিরে এসেছে বারে বারে। ইলেইন শোওয়াল্টার নামক বিখ্যাত নারীবাদী সাহিত্য সমালোচকের ভাষায় feminist (অর্থাৎ নারী-বিষয়ক লেখার সমালোচনা) এবং gynocritics (অর্থাৎ নারী-লেখনীর সমালোচনা) , দুইয়ের সমাবেশ দেখা যায় রাধারাণী দেবীর লেখায়। যদিও বেশিরভাগ আত্মসচেতন মহিলা লেখকের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু রাধারাণী দেবীর লেখার ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গটি বিশেষবাবে তাৎপর্যবহ।

তাঁর লেখার অন্তর্নিহিত রূপটি বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝলাম যে তাঁর সাহিত্যচর্চার মানদণ্ড সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। সেখানে লেখিকাদের জন্য তিনি কোনও 'অবলা'-বান্ধবের অনুপ্রবেশে রাজী নন। তার কারণ, তিনি যতবকমভাবে মেয়েদের সাহিত্যচর্চাকে বোঝবার এবং পাঠকদের বোঝবার চেষ্টা করেছেন, তা আর কোন তুলনীয় খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক করছেন বলে আমার জানা নেই। এরই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, তাঁব ছোটগল্পের নাযিকারা বেশিরভাগই সমাজে বঞ্চিত এবং কোনও না কোনওভাবে প্রত্যাখ্যাত। সাহিত্যজগতেও মেয়েদের অনুরূপ প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা তিনি উপলব্ধি করেছেন, যে কারণে তিনি তাঁর অভেদাত্মা (কারণ, কল্পিত) সখী অপরাজিতার গলায় প্রশ্ন করেছেন সাহিত্য-বিচারে ব্যক্তিজীবনের অনুপ্রবেশ ঘটবে কেন? মেয়ে রচনা করলে সাহিত্যকে সাহিত্যের মাপিকাঠিতে বিচার করা হবে না কেন?[৭]

রাধারাণী দেবীর সমাজভাবনা বা সমাজচেতনার মুখ্য বিষয় নারী। নারীজগতের ও জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর গল্পগুলিতে নারীসমস্যার জ্বলন্ত প্রশ্নগুলি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। এই সমস্যা মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের। বিধবা, অরক্ষণীয়া, সন্তানহীনা, স্নেহবৎসলা বিভিন্ন চরিত্রের নারীরা সামাজিক শাসনের বদ্ধ আবহাওয়ায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়েও চিরন্তনী নারীর ভূমিকাই পালন করেছে। সাবিত্রী, রাণী, মাধুরী বা অমলা এই নারীচরিত্রগুলিকে যন্ত্রণাহত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে। কেন তারা রুদ্ধস্বভাব সমাজ ও পরিবারের নিরাপত্তা ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারেনি? কেবল সামাজিক বিধিনিষেধ বা আরোপিত নিয়মকানুন নয়, অনেক সময়েই নিজস্ব সংস্কার ও শুচিতাবোধ, তার পরিমণ্ডল থেকে বহির্জগতে বেরোবার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। ভারতের চিরন্তন মহিয়সী নারীর ওপর পক্ষপাত ছিল বলেই তিনি 'সীতা' বা 'লীলাবতী' কবিতা লিখতে পেরেছেন।

হে শ্রদ্ধেয়া, বরণীয়া, জ্ঞান গরীয়সী
ভাস্করের সমতুল্য ভাস্কর দুহিতা,

বহু আয়াসেও তব ললাটের মসী
মুছিতে নারিলা ভবে জ্যোতির্বিদ পিতা।
আপনার স্নেহ ক্রোড়ে জ্ঞান-তরু ছায়ে
বৰ্দ্ধিয়া ছিলেন তোমা সযতনে অতি,
সুকঠোর ব্রহ্মচর্য ঢাকি আপনায়
যথার্থ বৈধব্য ব্রত অচরিলা সতী —(লীলাবতী: ভারতবর্ষ: জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০)

সমাজের যে অবিচার ও অত্যাচারের ফলস্বরূপ নারী —সমাজ-পরিত্যক্ত হয়, সেই ঘটনার পেছনে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তার কিন্তু কোন ভূমিকা থাকে না। অথচ সেই অত্যাচারের ফলভোগ করে নারী। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর কলম তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এই হৃদয়হীন ব্যবহারের জন্যই তার কলমে লেখা হয়—

স্বেচ্ছায় আমি যাইনি বিপথে, মনে প্রাণে আমি সতী,
তব বাহুপাশ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, সে তো সবই জানো পতি।"
('নির্যাতিতার কাহিনী' প্রথম প্রকাশ: ভারতবর্ষ: পৌষ১৩৩১;
প্রথম প্রকাশ কালীন শিরোনাম ছিল —'মাতৃমঙ্গল')

কিন্তু এই আর্ত-আবেদনে সমাজ বা স্বামীর কাছে আশ্রয় পাওয়া যায়নি। তাই সমাজ পরিত্যক্ত নির্দোষ বধূটি নিজেই নিজের হারানো ঘরের চাবিটি খুঁজে বেড়ায়। অবৈধ পাপে অনাচারী পুরুষকে সমাজ শাস্তি দিতে পারে না। শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে নিরপরাধ মেয়েটির মাথায়, সমাজের এই অন্যায়- বিচার রাধারাণী মানতে পারেননি। তাই সম্মান হারানো মেয়েটিকে নতুন ভাবে বাঁচবার আশা দিয়ে নিজের পথের সন্ধান করতে বলেন। এই সমস্যা আজকের নয়, বাঙালীর নয়, এ সমস্যা চিরকালীন ও সর্বভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত হয়।

অরক্ষণীয়া মেয়ে বিন্দুর সমস্যাও সমাজের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। সংসারের বিদ্রোহিনী নারীর যে দুর্দশার মধ্যে কালাতিপাত করতে হয় বিন্দু তার প্রমাণ। জীবনের কোনকিছুই তার মতামত নিয়ে ঘটেনি, তাই স্বামীর অকালমৃত্যুতেও সে দুঃখবোধ করে না। এ নারীও সমাজ চেতনারই অংশীদার।

'বিচিত্ররূপিণীর' কবিতাগুলিতে নারীর বিচিত্র রূপ প্রকাশিত হয়েছে যা তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও পরিশ্রমের ফসল। 'লীলাকমল', 'বনবিহগী' প্রভৃতি গ্রন্থে জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতাগুলির পূর্ণ প্রকাশ বিচিত্ররূপিনীতে ঘটে। তাঁর প্রবন্ধগুলি বিশেষ করে 'সতীত্ব - মনুষ্যত্বের সংকোচ না প্রসারক?', 'অন্তঃপুরের রবীন্দ্রনাথ', 'বাংলাদেশে মহিলা-সম্পাদিতপত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর মননশীল চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। তীক্ষ্ণ বাগ্‌ভঙ্গী, যথাযথ শব্দপ্রয়োগও বিষয়ানুগ হওয়ায়, তা কেবল নারীর লেখা

বলেই নারী চরিত্রের যে সীমাবদ্ধতা ছিল, —দৃষ্টিভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে, তা নির্মোহ ও বাস্তবধর্মী হয়েছে। এইখানেই রাধারাণীর সার্থকতা।

> *মানুষের জীবন সম্পর্কে কতকগুলো নিশ্চিত সিদ্ধান্তের চলাচলে সমাজ অনেকখানি আড়ষ্ট হয়ে আছে এখনো। সেসব সিদ্ধান্তে বিশ্বাস অবিশ্যি ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ছে। পুরোনো মতে ও মীমাংসায় আস্থা মরে যেতে সময় নেয়, নতুন সত্যে -- মানে সত্যের নির্মলতর মর্মে — বিশ্বাসও খুব ধীরে ধীরে আসে জীবনে।*[৫]
>
> *কবিতার কথা: জীবনানন্দ দাশ:পৃঃ — ৭৫*

রাধারাণীর সাহিত্যের মূল কথা এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মূলকথা নির্ভরতা। তাই নাবী সমাজকে আর্থিক ও মানসিকভাবে স্বনির্ভর হতে হবে। তবেই নারীসমাজের সত্যকার মুক্তি আসবে -- যে মুক্তি সমগ্র নারীসমাজের কাম্য, যে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছেন আমাদের পূর্বসূরীরা।

নারীর সামাজিক মূল্যায়ন ও স্বাধিকারের প্রশ্নে বিংশ শতাব্দীব নারী আন্দোলনের ইতিহাস অস্বীকার করা যায় না। ইলেইন শোওয়াল্টার, ক্যাথারিন স্পেনসার প্রমুখ নারীবাদীদের আন্দোলনের ফলে আধুনিক নারী একটি প্রতিবাদী-অবয়ব সৃষ্টি করতে পেরেছে। দেশে দেশে কালে কালে জীবনযাত্রার প্রভেদ থাকলেও সকল কালের নারীসমাজ এক বিশেষ ধরণের শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হয়ে এসেছে। তাই আপাত পার্থক্য থাকলেও নারীব দুর্দশাও সমগ্র পৃথিবীর সর্বত্রই এক ও অভিন্ন। কখনও ধর্মের নামে, কখনও সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধর জন্য নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্নভাবে। তাই সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে নারীসমাজের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সমাজকে প্রভাবিত করবার ক্ষেত্রে সহিত্যিকদের ভূমিকা অসামান্য। গোর্কীর 'মাদার' বা টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা' বা 'রেজারেকশন' যে শুধু সমাজ বা সহিত্যের দর্পণ তা নয় একই সঙ্গে নিপীড়িতা ও স্বাধিকার-ইচ্ছুক নারীর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। আগেই বলা হয়েছে বিভিন্ন নারীবাদী আন্দোলন নারী সমস্যার সমাধান করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাতে অবশ্য নারীসমস্যার সার্বিক সমাধান হয়েছে তা বলা যাবেনা। তবুও আধুনিক বিশ্ব নাবীসমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানে বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ নিয়েছে। অর্থাৎ এর প্রয়োজনীয়তাটুকু যে উপলব্ধ হয়েছে—এটাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ্য।

নারী সমস্যার মূল উৎস কিন্তু তার পারিবারিক প্রেক্ষাপট। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ। প্রাচীনকালে যখন নারী পুরুষ উভয়কেই কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা দিনাতিপাত করতে হোত তখন নারীর দৈহিক শ্রমের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। এর ফলে পরিবার ও সমাজে তার মূলও ছিল সমধিক। পরবর্তীকালে

সভ্যতার উন্নতি হওয়ায় ও সমাজ তথা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের বাইরে নারীর কায়িক শ্রমের প্রয়োজন কমে যায়। নারী গৃহাভিমুখী হওয়ার ফলে পারিবারিক কাজকর্ম ও সেবাযত্নে তাকে বেশী সময় দিতে হল। ফলে নারীর শ্রমের মূল্য বহির্জগতে কিছুটা হ্রাস পেলো। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক কারণ। বিভিন্ন দেশের শাসকবর্গের মধ্যে নিরন্তর সংঘর্ষ থাকায় নারীদের স্বাধীনতায় কিছুটা হস্তক্ষেপ করা হলো কেননা বিজেতা শাসকের অত্যাচারে নারী ও শিশুর জীবন ও সম্ভ্রমহানির সম্ভবনা দেখা গেল। বিশেষ করে মধ্যযুগে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নারীর স্বাধীনতা লোপ ও গৃহবন্দিনী হবার কারণটিও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মধ্যযুগে বিভিন্ন বিজেতারা বিশেষ করে বিধর্মী বিজেতারা কোন দেশ অধিকার ও সেখানকাব সম্পত্তি হস্তগত করার সঙ্গে সঙ্গে নারী ও শিশুদের ওপর অত্যাচার চালাত। বলাই বাহুল্য সেই অত্যাচাব নারীব সম্মানহানির সঙ্গেও জড়িত। তাই অত্যাচারী বিজেতা বা শাসকের হাত থেকে নারীর সম্ভ্রমরক্ষার জন্য নারীকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হলো। তবে তাতেও যে অত্যাচারীব হাত থেকে নারীর মান-মর্যাদা রক্ষা হতো তা বলা যায় না। কেননা মধ্যযুগে অসংখ্য নারী অপহরণের ইতিহাস নারীর মর্যাদাহীনতার সাক্ষ্য দেয়। এছাড়া নানা ধর্মীয় বাধানিষেধের মাধ্যমে নারীকে গৃহবন্দী ও পরাধীন করা হলো। 'সতীদাহ' বা 'সহমরণ' প্রথা ও 'জহরব্রত' এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

লিঙ্গবৈষম্য — এ এক ভয়ংকর সমস্যা। একথা স্বীকার করতেই হবে যে মধ্যযুগ বা রাজনৈতিক বাতাবরণই নয়, নারীর অধিকার হরণের চেষ্টা তার পরিবারের মধ্যেই নিহিত। সংসারের একটি শিশুকন্যা ও একটি শিশুপুত্র একই মায়ের সন্তান হলেও লালন-পালনের পার্থক্য থেকেই এই প্রভেদ বোঝা যায়। লিঙ্গবৈষম্য বা লিঙ্গবিভাজন তাই নারীর পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ। এই বিভাজনের প্রধান সহযোগী পরিবারের পিতৃতন্ত্র। নারীর নিজের কোন বোধ বা চেতনাকে বলা হয় 'জিনে ধরা'। পারিবারিক প্রলেপ মাখান কিছু ধর্মীয় অনুশাসন নারীকে পুরুষের অধীনে রাখার কাজে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই অনুশাসন যে শুধু লিঙ্গবৈষ্যমকেই জাগিয়ে রাখে তা নয়, এই বৈষম্য শ্রেণীবৈষম্যের জন্ম দেয় যা নারীর অধিকার ও চেতনার পক্ষে অশুভদায়ক। পরিবারের ভিতরে এই দ্বিখণ্ডিত ব্যবহার নারীর মনে এক বিচ্ছিনতাবোধের বা বিরক্তির জন্ম দেয়। পরিবারের মধ্যেই এইভাবে তৈরী হয় লিঙ্গবিভাজনের শক্ত ভিতটি। মেয়ে হয়ে ওঠার সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়ার শুরু এখানেই। শারীরিক ও মানসিক অপুষ্টি, ক্ষমতার অপব্যবহার, ধর্মীয় অনুশাসন ও স্বাধিকার হরণের যে বাতাবরণ, যার মধ্য দিয়ে সমাজের ক্ষমতার কায়েমি স্বার্থের নখদন্তগুলি বেরিয়ে আসে, নারীর স্বাধিকার অর্জনের পথে সেগুলিই প্রধান অন্তরায়। এর কারণ কিন্তু মূলতঃ অর্থনৈতিক। পরিবারে একটি শিশুপুত্রের জন্ম পরিবারে ভবিষ্যতে আর্থিক উন্নতি বা সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধিই শুধু নয় সামাজিক ও পারিবারিক

বলিষ্ঠতার কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাকে পরবর্তী প্রজন্মকে বলশালী করার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধা অধিক পরিমাণে দেওয়া হয় যাতে পরবর্তী কালে সেও বিশেষ সুবিধাগুলি পরিবারের বয়স্ক বা বয়স্কাদের দিতে পারে। পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথার সৃষ্টিও এইভাবে হয়েছে। প্রকারান্তরে শিশুকন্যার প্রতি আজন্ম একধরণের বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় যাতে পরবর্তী কালে সে নিজেকে বোঝা বা অপাংক্তেয় বলে মনে করে। খাদ্য-পোষাক, খেলাধূলা, প্রতিটি দিকেই এই বৈষম্য প্রকট। তাকে শেখানো হয় পুতুলখেলা, রান্না করা, পরিবারের সবার সেবা বা কাজ করে দেওয়া আর পুত্রকে কখনই সেবা বা ত্যাগ করার শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমনকি স্বয়ং মাও পুত্র-কন্যার মধ্যে এই ব্যবধান সৃষ্টি করেন তাদের প্রতি প্রাত্যহিক আচরণ্যে।

ঔপনিবেশিকতা

নারী সমস্যার প্রশ্ন নিয়ে যে সমস্ত থিয়োরী বা মতবাদ নতুন চিন্তা ধারার ও চর্চার জন্ম দিয়েছে তার মধ্যে ঔপনিবেশিকতাবাদ অন্যতম। এর মধ্যে বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংস্কার চিন্তা ও তথাকথিত 'ভদ্র মহিলার' পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্নির্মান বিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। উচ্চ কোটির বা 'এলিট' সম্প্রদায়ের শিক্ষা সংস্কার ও রাজনীতির সঙ্গে শ্রমিক, কৃষক ও উপজাতি গোষ্ঠীর মেয়েদের গুণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ঔপনিবেশিক প্রশাসনে আর্থসামাজিক আইনী পরিমণ্ডলে ক্রমবর্ধমান জীবিকা হানি এবং কায়েমী স্বার্থের চাপে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। তার প্রতিক্রিয়া নারী সমাজের ওপর বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। দেশবিভাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, উদ্বাস্তু আগমন ইত্যাদির ফলে সারা বিশ্বে তথা ভারতবর্ষ জুড়ে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক রদবদল চলেছে, ঔপনিবেশিক যুগের নারী সমস্যায় তার প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

১৮৪৬ সালে 'বিধবা বিবাহ' আইন বিষয়ে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগ বাংলা তথা ভারতের সামাজিক অবস্থার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পুনর্বিবাহিত বিধবার সম্পত্তির ওপর আইনি অধিকার সম্বলিত মামলাগুলি আলোচনা করলে এই অভিমত স্পষ্ট হয়েও ওঠে। এই আলোচনাগুলি থেকে একথা বোঝা যায় যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী তথা দেশজ সংস্কারকদের সমাজ পুনর্গঠনের ইচ্ছায় কিভাবে একটি তরল বহুধা বিভক্ত, বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা ক্রমশই এক শাস্ত্রীয় ছক তথা কায়েমী স্বার্থের জড়ত্ব লাভ করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের খতিয়ান নিলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বহুদিন ধরে টানাপোড়েন চললেও জাতি - গোষ্ঠী - অঞ্চল ভিত্তিক প্রথাগত আইন (যার মুল মন্ত্র নারীর অধিকার অথচ স্থানবিশেষে ছিল বিভিন্ন

তাৎপর্য ও বিভিন্ন বঞ্চনা) ক্রমশই হিন্দু শাস্ত্রীয় নীতির প্রতিপত্তিতে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। ১৮৫৬ সালে যে সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল তার সমাধান হতে লাগল আরও একশ বছর। ১৯৫৬র আইন সামাজিকভাবে বিশেষ প্রভাব ফেলতে না পারলেও সেই প্রথম হিন্দু নারীর স্বামীর ওপর একচ্ছত্র সামাজিক অধিকার ও সম্পত্তির ওপর আইনি অধিকাব রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করল।

মুসলমান মেয়েদের ওপরও সম্পত্তির অধিকার কায়েম করার ক্ষেত্রে একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রেও বৃটিশ শাসকরা প্রচলিত রীতিগত আইন ও 'কোরাণিক' আইনের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে বহু অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। বিখ্যাত 'শাহবানু মামলা' তারই প্রমাণ। এরই একদিকে কোরাণিক আইনের সুকঠোর প্রয়োগ যেমন — 'দেনমোহর' বা 'ইদ্দতকাল' সম্পর্কে কোরাণ হাদিসের সুনির্দিষ্ট নির্দ্দেশ। এগুলি মুসলিম মেয়েদের কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তির ওপর অধিকারকে আইনি অধিকার দিয়েছে সত্য। আবার অন্যদিকে আঞ্চলিক ও প্রথাগত আইনী বৈশিষ্ট্যকে নস্যাৎ করে মেয়েদের অধিকার প্রাপ্তির অন্যতম সম্ভবনাকে দূরীভূত করেছে।

বর্তমান বা আধুনিক সমাজে নারীর অধিকার সম্পর্কে তাই স্পষ্টই বলা যায়—

> "If improvement in the status and rights of women was a mark of modern society, then neither the administrative nor legal arms of Anglo Indian Government were engine of modernization." 'Woman in Colonial India" I Krishnamurty, pg 132)[৬]

উনিশ শতকে গুজরাটে লেভা, কাম্বে, পতিদার জাতির বিবাহপ্রথা ও কন্যাসন্তান হত্যার বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে এই সমস্যার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিশেষ কায়েমী স্বার্থের প্রসার। বৃটিশ শাসকদের তথাকথিত সিভিলাইজেশন বা সভ্য উন্নত করা এবং জনহিতৈষণার প্রকল্পগুলি তাদের অর্থনৈতিক প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। নিঃশর্ত ভালমানুষী ভাবনা সেখানে আদৌ ছিল না।

সব থেকে বর্বরোচিত প্রথা সতীদাহ বা সহমরণ অনায়াসে চোখ এড়িয়ে যেত সুনিশ্চিত রাজস্বে টান পড়লে। করদ রাজ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমস্যাও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেল। ফলতঃ জমিদাররা যখন সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের আশায় প্রতিনিয়ত মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে সামাজিক অনুশাসন তখন এনলাইটেড প্রশাসকরা ব্যস্ত থেকেছে তাদের লাভ ক্ষতির হিসেব নিকেশ নিয়ে ; আর এই দ্বিবিধ সক্রিয়তার শিকার হয়েছে শুধুমাত্র মেয়েরাই।

তামিলনাড়ুর কোট্টাই, পিল্লাইমার গোষ্ঠীর মেয়েরা দুর্গের বাইবে বেরোতে পারত না। চার দেওয়ালের মধ্যেই ছিল তাদের জীবনের শুরু ও শেষ। যজমানী প্রথা ও মেয়েদের এই অবরোধই ছিল এ গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পরিচিতির ভিত্তি। দুর্গের বাইবে কোন মেয়ে এলে তার জন্য চিবতরে দুর্গের সিংহ-দরজা বন্ধ হয়ে যেত। নির্দ্দিষ্ট বিচারের পর মেয়েটির স্থান হত সমাজের বাইরে বা কোন গণিকালয়ে। উনিশ শতকে তাদের প্রথাগত দূষণ ও পবিত্রতার ধারণা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায়; ও নতুন দিশা লাভ করে ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক ব্যবহারিক নির্দ্দেশে। কামিন ও কোট্টাইদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করে যে, বৃটিশ শাসক নিজেদের প্রয়োজনেই আঞ্চলিক স্বার্থগোষ্ঠীকে সমর্থন করেছে। সংস্কাবের প্রতি তাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে যেতেও সময় নেয়নি এবং সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী এমনই হবার কথা ছিল।

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী শিল্পায়ন, যান্ত্রিকতা এবং শ্রমপ্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিকীকরণ - সমাজে নতুন সম্ভাবনা ও অর্থনৈতিক বাতাবরণের সৃষ্টি করেছে। সামন্ততান্ত্রিক অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা ও কুটির শিল্পের দীর্ঘসূত্রতা কাটিয়ে শ্রমিকশ্রেণী তার শ্রম বিনিময়ের অন্যতম মাত্রা খুঁজে পায়। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে শিল্পায়ন এবং শ্রমক্ষেত্র বিস্তারের তত্ত্ব নারীশ্রমিকের ক্ষেত্রে একটি মিথ রূপে পরিগণিত হয়। এ তত্ত্বটি প্রমাণিত হয় ১৮৯১ থেকে ১৯৩৯ এর মধ্যে তদানীন্তন বোম্বাইয়ের বস্ত্রায়নশিল্পের শ্রমিক চরিত্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই বিশ্লেষণ দেখা যায় যে একদিকে পুরুষ-শ্রমিকের শ্রমক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করছে সত্য, অন্যদিকে পারিবারিক বেতনের ধারণা (family income) এবং মেয়েদের গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকার ওপর সমাজ সংস্কারকদের গুরুত্ব আরোপ - মেয়েদের শ্রম-ভূমিকাকে নিতান্ত গৌণ করে তুলেছে। প্রতিরোধের যথেষ্ট সুযোগ ও উদ্যম থাকলেও কেবলমাত্র কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় মেয়েরাও তাদের এই গৌণ ভূমিকাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। একই বিষয়ে বলা হয়েছে বাংলার ঢেঁকি ছাঁটাই কাজের ওপর ধান-কলের প্রভাব বিষয়ে।বাংলার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এই শ্রম পদ্ধতির ধ্বংস - মেয়েদের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি বুঝতে সাহায্য করে।

ফিজির বাগিচা শিল্পে চুক্তিবদ্ধ নারী শ্রমিকদের ওপর সাধারণ চুক্তিবদ্ধ চাপ ছাড়াও সামাজিক নৈতিকতার অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছিল। ভারতের চা বাগিচা শিল্পে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও এই চাপ বর্তমান। যে নারী শ্রমিক ওভারসিয়রের বা সাহেবের যথেচ্ছ বাসনার চরিতার্থতার মাধ্যম নয় তার অস্তিত্বই বিপন্ন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বা আদর্শবাদীদের মতে - শুদ্ধ নারীর ঘেরাটোপে আটকে পড়ার জন্য সে নয়।

উনিশ শতকে নব জাগরণের তাগিদে যখন নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক তথা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের রীতিনিয়োগ পালনের হুজুগ এসে গিয়েছিল তখন অন্যদিকে উচ্চবর্গের তথাকথিত শিক্ষিত এলিটদের মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তারও হ'য়ে উঠেছিল এক ধরণের রেওয়াজ।

দয়ানন্দ সরস্বতীর ধর্মশুদ্ধি আন্দোলন এর অন্যতম প্রকল্প ছিল। আধুনিক সামাজিক চাহিদার নিরিখে হিন্দু নারীর ঘটল নবসৃজন। বিধর্মীর হাতে লাঞ্ছিতা ও ও ধর্মান্তরিতা নারীকে পুনরায় হিন্দুধর্মে পরিশুদ্ধি করানই এ ধর্মসংস্কারের অন্দোলনের উদ্দেশ্য। একে ধর্মীয় আধুনিকতাবাদের নয়া পিতৃতান্ত্রিক রূপ বললেও দ্বিরুক্তি হয় না। বহুবিবাহ, ব্যালবিবাহ রোধে কিম্বা বিধবাবিবাহ এবং নারীশিক্ষা প্রচলনের প্রচেষ্টার পেছনেও যে যুক্তির বিন্যাস গড়ে উঠেছিল তার মূল কথা ছিল সামাজিক স্থিতিশীলতা। পুনরাগমনের এই প্রকল্প নারী পুরুষের সামাজিক বিভাজন নিয়ে প্রশ্ন ত তোলেই নি বরং তাকে জোরদার করেছিল। এই আন্দোলনটি অবশ্য মেয়েদের স্বয়ংক্রিয়তার সুযোগ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিষ্ঠা করেনি সত্য, কিন্তু নারীর পবিত্রতা ও গৃহকেন্দ্রিকতার আদর্শে সহযোগকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে। শুধু সামাজিক স্বীকৃতি নয়, মহিলাদের ভোটাধিকার অর্জনের জন্যও এই ঔপনিবেশিকতার দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। ১৯১৭ সালে India Association এ গোলটেবিল কনফারেন্স-এর সময় লণ্ডনে এই অধিকার নিয়ে প্রচার চালানোর নিরলস প্রচেষ্টা হয়। সরোজিনী নাইডু এই আন্দোলনের অন্যতম শরিক ছিলেন। এছাড়াও বেগম শাহনওয়াজ, হীরাবাঈ টাটা, হীরাভাই মিথুন ও মার্গারেট কাজিন্স প্রমুখ থিওজফিস্ট ও ভারতীয় নারীবাদীরা এই আন্দোলনের অন্যতম দাবীদার ছিলেন। একথা সত্যি যে ভারতবর্ষের মেয়েরা বিশেষ কোন আন্দোলনের মাধ্যমে ভোটাধিকার পায়নি। ১৯৩৫এ প্রণীত ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী মেয়েদের এই অধিকার মেনে নেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯১৭ সাল থেকেই নারীদের ভোটের অধিকার নিয়ে নানা ধরণের প্রচেষ্টা চলছিল। অবশ্য ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে নারী আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই ভিন্ন পথ নিয়েছিল। ভারতে পুরুষরা মেয়েদের ভোটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়নি, যেমনটি হয়েছিল পশ্চিমে। ভারতে রাজনৈতিক নেতারা নারী আন্দোলনকে ততখানি গুরুত্ব দেয়নি কারণ তাহলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিভক্ত হবে, বিদেশীদের চোখে মলিন হবে স্বাধীনতার জন্য উত্তাল দেশের ভাবমূর্তি। একথাও মনে রাখতে হবে যে পশ্চিমের সব দেশেও একই সময়ে বা একই ভাবে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া ভারতে ১৯৩৭এ প্রাদেশিক প্রশাসন চালু হওয়ার আগে নারী বা পুরুষ কারও ভোটেরই তেমন মূল্য ছিল না। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। —

> *ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও নারীবাদের মধ্যে সম্পর্ক জটিল ও বহু আলোচিত স্বাধীনতা আন্দোলনের সব স্তবে ও শাখায় — অহিংস অসহযোগিতা, বিদেশী পণ্য ও মদের দোকানে পিকেট, চরকা কাটা, পুলিশের লাঠি-গুলির মুখোমুখি হওয়া, অগ্নিযুগের শরিক হয়ে হাতে অস্ত্র তোলা, শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সর্বত্র মেয়েদের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা লক্ষনীয়। কিন্তু এর ফলে মেয়েদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে অনেকে*

প্রশ্ন তুলেছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পেছনে ফিরে দেখার ঝোঁক এবং নারীকে প্রাচীন ভারতের কল্পিত আদর্শ অর্থাৎ সতী, সীতা-সাবিত্রী রূপে দেখা, সর্বোপরি সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনার অভাব নারীমূর্ত্তিকে ব্যাহত করেছে। তবু লক্ষ লক্ষ মেয়ের জনজীবনে অংশগ্রহণ একেবারে ব্যর্থ হতে পারে না। স্বাধীনতা উত্তর যুগে মেয়েদের যে চেতনার উন্মেষ ঘটেছে তা সে যতই অসম্পূর্ণভাবে হোক না কেন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি যতটুকু ঘটেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকাকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়না।[১]

ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার তাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধিকাব রক্ষার স্বীকৃতি বটে। তা কিন্তু নারীর গৃহকেন্দ্রিক ভূমিকার, অবমূল্যায়ন করে না। বরং এই ভূমিকাতে মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। ঠিক একই কারণে গান্ধীজির আন্দোলনগুলিতে মহিলাদের যোগদান সামাজিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। এমনকি সহিংস রাজনীতিতে তাদের ভূমিকাও মহিমান্বিত হয়েছে সর্বত্যাগী মাতৃকার ভাবাবেগের কল্যাণে। পরিশেষে বলা যায় যে কোট্টাই, পতিদার মাহিলাদের থেকে শুরু করে বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা পর্যন্ত সবাই তাদের স্থানিক সংস্কৃতি ও সামাজিক দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও সমাজের স্ব স্ব অবস্থানে একই পুরুষতান্ত্রিক নীতিবোধের শিকার হয়েছে। আর পুরুষ আধিপত্যের এই প্রকল্প রূপায়ণে সমাজ সংস্কারকদের সঙ্গে সমানভাবে সহযোগিতা করেছে রাষ্ট্র। এ সবই একান্ত বাস্তব ঘটনা; গভীর ভাবনায় বিশ্লেষিত মাত্র।

উনিশ শতকের শিক্ষা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালী সমাজে মোটামুটি ভাবে দু-ধরণের স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল। প্রথম ধরণের শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না। ধর্ম সংশ্রবহীন এই শিক্ষা দেওয়া হত বেথুন স্কুলে, বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই শিক্ষা প্রণালী কেশব চন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিরা সমর্থন করতেন না। তাই তাঁর অনুরাগীরা যে অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালী চালু করলেন তা ধর্মের সিঁড়ি- বন্ধনে আবদ্ধ :

ধর্মশূন্য শিক্ষা শিক্ষাই নহে, সে শিক্ষা অধঃপতনের মুল।

— এখানেই শেষ কথা নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে চাইতেন যাতে তারা আদর্শ মা, উপযুক্ত বোন বা মেয়ে হয়ে উঠতে পারে। এই কারণে মেয়েদের সবকিছু পড়ানো তাঁরা অর্থহীন

মনে করতেন। উচ্চ গণিত, জ্যামিতি, লজিক মেয়েদেব জানার কোন প্রয়োজন আছে বলে তাঁরা মনে করতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি তাঁরা অনুসরণ করতেন না। এই কারণে ভারত সংস্কারক সভার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের কোন মিল ছিল না। স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে সেইসময়ে অনেক পত্র পত্রিকায় সমালোচনা করা হত। মনোমোহন বসু সম্পাদিত 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক ধ্যান-ধারণাকে প্রবল সমালোচনা করা হ'ল। নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও আত্মমর্যাদা বোধের জন্য মেয়েদের স্যানিটারী সায়েন্স, হাইজিন, কেমিষ্ট্রি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ নীতিবিরুদ্ধ বলে প্রচার করা হল। যুক্তির ভাষা ব্যঙ্গস্থলে কতটা অতিরঞ্জিত হতে পারে তা একটি উদাহরণ দ্বারাই প্রমাণিত হয়। " লেখা পড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রার্দুভাব হয় তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশ শক্তির মধ্যে বিনীল সত্তা লাভ করে। সুতরাং রমণী বিধবা হয়।" ১৮৩৫ থেকে ৩৮ সালে রচিত এ্যাডামস্ রিপোর্টেও প্রচলিত বিশ্বাসের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিন্তু উদারপন্থী সংস্কারও মিশনারী প্রয়াসে সরকারের অনাগ্রহ সত্ত্বেও খুব ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা শহরের ও সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মধ্যে প্রচার লাভ করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য শতাব্দীর শেষের দিকে যখন রবীন্দ্রনাথের "খাতা" গল্পটি প্রকাশিত হয় তখন সনাতনী মহলে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে নুতন করে ঢেউ ওঠে। লেখাপড়া জানা মেয়েরা 'বিবি', তারা জুতো মোজা পরে, ইংরাজী বলে। এই নিয়ে গান, ছড়া, প্রহসন অজস্র লেখা হয়। পটে-ছবিতে পাঠরতা রমনী ও রন্ধনরত স্বামীর অজস্র ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়। অজস্র আদর্শ হিন্দু স্বামী অসংখ্য যুক্তির অবতারণা করে অনর্গল প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন। ঔপনিবেশিক ভারতে বিশেষ করে বাংলায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পুরুষ, যারা শাসক হবার জন্যই জন্মেছে তাদের হাতে শাসনভার বা ক্ষমতার প্রায় ছিল না বললেই চলে। রাজনৈতিক জগৎ ও শাসনযন্ত্র বিদেশী শাসকের হাতে, আধুনিক অর্থনীতির দায়িত্বের পনেরো আনাই বিদেশী পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ী দখল করে নিয়েছে। হাতে একমাত্র পুর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিষ্ক্রিয় মালিকানা, যাতে পৌরুষ প্রকাশের খুব একটা সুযোগ নেই। তার ওপর শারীরিক দুর্বলতার প্রবাদ সৃষ্টি করে বাঙ্গালী পুরুষকে সেনাবিভাগের বাইরে রাখা হয়েছে। বিদেশী শাসক বাঙ্গালীর পৌরুষে সন্দেহ করে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করত। মেয়েলীপনা প্রচলিত বিশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একমাত্র শিক্ষার ভুবনে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। উচ্চশিক্ষার প্রসার, বাংলায় অপেক্ষাকৃত উন্নতির দ্রুতগতি বাঙালীর জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধাও মোটামুটি সকলের দ্বারা স্বীকৃত। কাজেই এই একটা ক্ষেত্রে পুরুষ স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। পুরুষোচিত সাফল্য, যশ ও কর্মক্ষমতা বাঙালী পুরুষের আয়ত্তে এসেছে মেয়েলিপনার নিন্দা এড়াতে ও পৌরুষ প্রমাণিত করতে। এই তার একমাত্র ক্ষেত্র। সুতরাং শিক্ষা ও বুদ্ধি যে পুংলিঙ্গ নির্দেশক হয়ে উঠবে

তাতে কোন সন্দেহ নেই। মেয়েরা যদি শিক্ষার অধিকার পায় তবে লিঙ্গভেদ আর বাঁচিয়ে রাখা শক্ত। একথা অনস্বীকার্য যে এর অনেক আগে থেকেই মেয়েদের নৈতিক পতন ও বৈধব্যের সঙ্গে শিক্ষার একটা অবিচ্ছেদ্দ্য সম্পর্ক সমাজে স্বীকৃত ছিল। এর কারণ হল শিক্ষা ও বুদ্ধি একরকম মানসিক স্বাধীনতার চাবি। এ চাবি হাতে এলেই মেয়েদের একটা স্বনির্ভর স্বতন্ত্র চেতনাময় জগতের সৃষ্টি হবে যা সংসারের আয়ত্তের ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। শিক্ষার আগ্রহ হল এমন এক কামনা যা দাম্পত্য, মাতৃত্ব ও বধূত্বের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই সামাজিক ও সাংসারিক দাম্পত্যের ছকে একে ফেলা যায় না। এই কামনা তাই দাম্পত্য বিশ্বস্ততার পক্ষে ভীতিপ্রদ। সাংসারিক জীবনের বাইরে শুধুমাত্র নিজের জন্য কিছু করা বা আকাঙ্ক্ষা করা মেয়েদের পক্ষে পাপ বা অন্যায়। প্রথমে নৈতিক অধঃপতন, পরে বৈধব্য — এই দুই ভয় ইঙ্গিত করছে যে শিক্ষা পেতে আগ্রহী নারী তার দাম্পত্য জীবনের অবমাননা করছে।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষীণ দুর্বল প্রসার এই দুই ভয়কে যেমন প্রজ্বলিত করে তুলল তেমনই বহু শিক্ষিতা স্ত্রী তাতে ইন্ধন যোগালেন। পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে যেসব লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হ'তে লাগল তার মধ্যে সনাতনী হিন্দু সংস্কারের কথা খুবই কম। বরং বিরুদ্ধ তিক্ত যন্ত্রণাদীর্ণ নিন্দায় সেই লেখাগুলি অত্যন্ত সরল। রামসুন্দরী দেবীর ''আমার জীবন' ও কৈলাসবাসিনী দেবীর ''হিন্দু মহিলার দুরবস্থা' গ্রন্থে হিন্দু সংসারকে তিনি প্রেমহীন এক ভয়াবহ হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত গভীর অরণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রামসুন্দরী দেবী সেকালের বধূজীবনের অতি মর্মান্তিক ছবি এঁকে গিয়েছেন।

সনাতনী হিন্দু নেতার উত্থানবাদী রাষ্ট্রবাদের পক্ষে এ এক বিরাট সমস্যা। স্ত্রী শিক্ষাকে তাঁরা যতই পশ্চিমী অনুকরণ ও সাংস্কৃতিক পরাজয় বলে মনে করন না কেন, এঁর তাৎপর্যময় ভূমিকা এরা বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাই হোক, বাংলায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচারে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ উন্নতিশীল ব্রাহ্মদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি কল্পে ১৮৭৪র নভেম্বর মাসে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ে তাঁরা তাঁদের বাড়ির মেয়েদের ভর্তি করে দিলেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় দায় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন 'অ্যানেট অ্যাক্রয়েড' নামে এক ইংরেজ মহিলা। পরবর্তীকালে অ্যাক্রয়েড বিয়ে করে চলে গেলে স্কুলটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে। ১৮৭৬ এর গোড়ার দিকে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। ১লা জুন ১৮৭৬ দ্বারকানাথ, দুর্গামোহন প্রমুখের উদ্যোগে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নামে এটি আবার চালু হয়। এই স্কুলের ছাত্রী কাদম্বিনী বসু, সরলা রায়, স্বর্ণপ্রভা বসু, অবলা দাশ, সরলা মহলানবিশ সরকারী বৃত্তি লাভ করে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিছুদিন স্বাধীনভাবে চলার পর স্কুলটি বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

পরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে ১৩নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ১৫টি বালক বালিকা নিয়ে ব্রাহ্ম বিদ্যালয়েব সূচনা হয়। এর প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন আনন্দ মোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী (তথ্য সূত্র — বাঙ্গালী সমাজে স্ত্রীশিক্ষাঃ বিজন বসু, পশ্চিমবঙ্গ, ১৪০৪)।

সমাজের উন্নতির সঙ্গে নারীশিক্ষা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত বলে সেই সময়ে শিক্ষিত নাবীবা, সমাজে বিশেষ করে নিজেদের চেয়ে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মেয়েদের মঙ্গলকর কাজে, এগিয়ে এসেছেন। অনেকক্ষেত্রে এই চিন্তা নাবী ও পুরুষকে একই সঙ্গে উদ্দীপ্ত করেছে। ঠাকুরবাড়ীর মত নিয়মভঙ্গী পরিবারের বাইরেও নারীর উন্নতিযে জাতির উন্নতি এই ধারণা আলোকপ্রাপ্ত পুরুষকে নারীশিক্ষার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই শিক্ষিত নাবীরা উত্তরাধিকার সূত্রে এক অগ্রসর কৃষ্টির অংশীদার। অতএব অবশ্যই একে একধরণের 'এলিট' চেতনা বলা যেতে পারে।

চেতনা-বিভাজন—জীবনে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয। এটা ঠিক যে পবিবর্তনশীল সমাজে—শিক্ষা, নাবীব হাতে তুলে দিযেছিল নিজস্ব জীবনের গতিপথ নির্ণয করার এক শক্তি। অথচ সমাজের পরিবর্তন সমগতিতে হয়নি। তাই মেয়েদের নিজস্ব মেধায — এই মীমাংসা অনেক সময় আনন্দ, সার্থকতা বোধ ও গভীর দুঃখ একই সঙ্গে দেখা দিযেছে। এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল স্বামী বা পুরুষের যোগ্য হওযার প্রেবণা। এই প্রেবণার জন্যই মুক্ত মন ও আদর্শ কাজ কবেছে। একটু পিছন ফিবে ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে শিক্ষার মাধ্যমে মা, স্ত্রী, বোনের উন্নতি সাধনে যে আদর্শ তার কিছু বীজ অন্তঃপুরের শিক্ষায নিহিত ছিল। মেয়েদেব শিক্ষা তাই শুরু হল পুরানোর সঙ্গে নতুনকে খাপ খাইযে, লিঙ্গপ্রভেদ শুধু বজায় রেখে নয, এই প্রভেদকে নবরূপে গৌরবান্বিত করে।

নারী আন্দোলনের সালতামামি

নারীর অধিকার ও সমাজে তার সম্মানজনক অবস্থান আজ স্বীকৃত সত্য কিন্তু এই স্বীকৃতি তাকে অর্জন করতে হয়েছে দুস্তর পথ পেরিয়ে। প্রথমে প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে মাত্র কয়েকজনের কন্ঠে। সেই স্ফুলিঙ্গ ক্রমে ক্রমে আগুনের আকার ধারণ করেছে। শতকন্ঠে গর্জে উঠেছে প্রতিবাদ প্রতিরোধ। নারীর প্রতি অত্যাচার-অবিচার-বৈষম্যের বিরুদ্ধেই এই প্রতিবাদ। সম্মিলিত এই গর্জনকেউপেক্ষা করা যায়নি। নারীকে তার আপন ভোগ্য জয় করার অধিকার দিতেই হয়েছে।

দুই শতকেরও বেশী সময় জুড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন আন্দোলন নারীর অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করল। সংগ্রামের পুরোভাগে বিশিষ্টজনেরা যেমন ছিলেন তেমনি প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে একে সমর্থন জানিয়েছেন নাম না জানা বহু মানুষ। ভারতবর্ষে সতীদাহ

প্রথা বিলোপ, বিধবাবিবাহ আইন, বাল্যবিবাহ রদ ও নারী শিক্ষা প্রচারের কাজ শুরু হয় উনবিংশ শতকে —রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা বেথুনের মত মহাপুরুষের হাত ধরে। ইওরোপে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় আরও আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। সময়ের হের-ফের যাই হোক না কেন, কি পাশ্চাত্যে, কি প্রাচ্যে —সেকাজ কখনও থেমে থাকেনি। বলা যায় আজও তার ধারা অব্যাহত। নারী আন্দোলনের এই দীর্ঘ ইতিহাসে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

১৯৮২ সালে মেরী উলস্টোন ক্র্যাফটের 'A vindication of the rights of women' নামক গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমালোচিত হলেও পরবর্তীকালে প্রায় দেড়শ বছরের ব্যবধানে এটিকে নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম আকরগ্রন্থ বলা যায়। ১৮১৯ সালে কলকাতার গৌরীবাড়ীতে বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য "ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির" উদ্যোগে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২৯ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড বেন্টিং ক সতীদাহ প্রথা রদ ভিত্তিতে স্বাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। ১৮৩৭ সালে আমেরিকায় প্রথম দাস প্রথা বিরোধী নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৪৮ সালের ১৯ থেকে ২০শে জুলাই 'সেনেকা ফলস কনভেনশান' নামে খ্যাত —নারী অধিকার আন্দোলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় নিউইয়র্কের সেনেকা ফলসে। ১৮৪৯ বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক নারী শিক্ষার সূচনা হয় জে. ই. ডি. বেথুনের বেথুন স্কুল স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে। ১৮৫৬ সালে ছাব্বিশে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তিত হয় ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হিসেবে পুত্রের সঙ্গে কন্যাও স্বীকৃতিপায়। ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ আমেরিকায় বস্ত্র শিল্পে মহিলা শ্রমিকদের দৈনিক দশ ঘন্টা কাজ ও মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘটের ডাক। ১৮৬৩ সালে "বামাবোধিনী" পত্রিকার প্রকাশ —শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে নবজাগরণের সূচনা করে। ১৮৬৮ সালে "আমার জীবন" বাঙালী মহিলার লেখা প্রথম আত্মজীবনী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮২ মহারাষ্ট্রীয় নারীবাদী পণ্ডিত রমাবাঈ কর্তৃক আর্য মহিলা সমাজের প্রতিষ্ঠা। ১৮৮৩তে বাংলার দুই মহিলা স্নাতক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রমুখী বসু। ১৮৯৩ দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সাফ্রাজেট আন্দোলন সাফল্য লাভ করল। মহিলারা প্রথম ভোটাধিকার পেলেন নিউজিল্যণ্ডে। ১৮৯১তে ভারতবর্ষে সহবাস সম্মতিসূচক আইন (A Gee Consent) বিল পাস। ১৯১০ ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে কম্যুনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকীনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৪-এ বেগম রোকেয়ার বিপ্লবী প্রবন্ধ "আমাদের অবনতি" প্রকাশিত হয় 'নবনূর' পত্রিকায়। ১৯১৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নারীর মূল্য' প্রকাশিত হয়। ১৯১৪-৮ই মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। ১৯১৮ বৃটেনে মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ। ১৯২০ আমেরিকায় মহিলাদের ভোটাধিকার লাভ। ১৯২০ থেকে ১৯২৫ ভারতীয় নারীর

প্রথম ভোটাধিকার লাভ। ১৯২১ মারী স্টোপস বৃটেনে প্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র চালু করেন। ১৯২৭-এ পুণেতে অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। ১৯২৯-এ ভার্জিনিয়া উলফের 'A Room of One's Own' প্রকাশিত। এই প্রকাশিত গ্রন্থে লেখিকা দাবী করেন যে নারীদের যদি নিজস্ব পবিসব দেওয়া হয় তাদের সৃজনও সমান উৎকর্ষতা লাভ করবে। ১৯২৯-এ বাল্য বিবাহ নিরোধক আইন বা সারদা আইন পাশ হয়। ১৯৪৩-এ কলকাতার ওভারটুন হলে প্রথম প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫-এ হিন্দু বিবাহ আইন পাশ। ১৯৪৯-এ পরবর্তী সমস্ত নারীবাদী অন্দোলনের পথিকৃৎ সিমোন দ্য বোভায়ারের 'সেকেণ্ড সেক্স' বইটি প্রকাশিত হয়। বইটিতে লেখিকা বলেছেন সমাজ পুরুষকে তৈরী করেছে সার্থকরূপে আর নারীকে নঞর্থক রূপে। ফলে অস্বীকার করা হোয়েছে নারীর স্বকীয়তা ও দায়িত্ব বহনের অধিকারকে। এই বইয়ে লেখিকাব বিখ্যাত উক্তি—'কন্যা সন্তান নারী হয়ে জন্মান না, সমাজ তাকে নারী করে তোলে।' ১৯৫৫-তে হিন্দু বিবাহ আইন পাশ। এই আইনের মাধ্যমে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হল ও হিন্দু নারীর স্বাধীকার প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৬১-এ পণ প্রতিষেধ আইন (Dowry Prohibitio n Act) বলবৎ হয়। যাকে পরবর্তীকালে ১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে আরও কার্যকর করে তোলা হয়েছে। অবশ্য বেশ কয়েকটা রাজ্যে পণপ্রথা এখনও ব্যপকভাবে চালু রয়েছে। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার নয়া নারীবাদ প্রচারক বেটি ফ্রিডালের 'The Feminine Mystique' এর প্রকাশ হয়। বইটিতে সিমেন দ্য বোভেয়ারার ধারণাটিকে গ্রহণ করেন ফ্রীডম। ১৯৭০ সালে কেট সিলেটের 'সেক্সুয়ল পলিটিক্স' নামে বইটির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য নারীবাদী চিন্তা ও চেতনায় পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে একটি স্পষ্ট রূপ প্রকাশ পায়। এই বইতেই সর্ব প্রথম নারী পুরুষের সম্পর্ক কে রাজনৈতিক সম্পর্ক বলে চিহ্নিত করা হয় এবং জনন ও যৌনতা সম্পর্কিত এই নতুন ধরণের চিন্তা ভাবনা নারীবাদী চিন্তার পথ প্রশস্ত করে। ১৯৭১ সালে ভারতে 'মেডিকেল টার্মিনশেন অফ প্রেগনেন্সি' আইন বলবৎ করার সঙ্গেই সঙ্গেই নারীদের নিজেদের ইচ্ছা মতন সন্তান ধারণ ও অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ প্রশস্ত করে। ১৯৭৪ সালে মথুরার রেপ কেস। ১৯৮২-এ মথুরার রেপ কেস ও স্টেটাস কমিটির রিপোর্ট 'Towards Equality' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের রাযের বিরুদ্ধে দেশব্যপী বিভিন্ন নারী সংগঠন আন্দোলন শুরু করে এবং লাগাতার আন্দোলনের ফলে সংসদে রেপবিল সংশোধন করা হয় এবং বলা হয় এই সমস্ত মামলার বিচার হবে বদ্ধ ঘরে ও নির্যাতিতার নাম কোন প্রকাশ মাধ্যমে জানান যাবে না। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ হিসেবে এই বর্ষটিকে চিহ্নিত করে। সাম্য, উন্নয়ন এবং শান্তির স্লোগান কণ্ঠে নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ থেকে 'আন্তর্জাতিক নারী দশকের' শুরু হয়। ঐ বছরই মেক্সিকোতে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে ঐতিহাসিক শাহবানু

মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়কে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক প্রতিবোধের সৃষ্টি হয়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'মুসলমান মহিলাদের বিবাদ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষা' ('The Muslim women's protection of rights on Divorce) বিল। ১৯৮৫ সালের ২৩শে এপ্রিল সুপ্রীম কোর্ট শাহবানু মামলায় ভূপাল হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে শাহবানুকে প্রতি মাসে ২৫ টাকার পরিবর্তে ১৮৯ টাকা ১০ পয়সা খোরপোষ পাবার অধিকার দান করে। এর বিরুদ্ধে মৌলবাদীরা যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে তার কাছে তৎকালীন সরকার এমনকি শাহবানু পর্যন্ত নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন। ১৯৮৭-৪ঠা সেপ্টেম্বর রূপ কানোয়ার 'সতী' হলেন। এরপর প্রবল জনমতের চাপে পড়ে ভারত সরকার ১৯৮৭ সালেই সতীদাহ প্রতিরোধ আইন পাশ করে। সতী হবার চেষ্টা করা কিংবা এই প্রথা চালু রাখার ব্যপারে কোন উদ্যোগ নেওয়া — দুইই এই আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। ১৯৯১ সালে জাতীয় মহিলা কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের মাধ্যমে সামাজিক ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে ও আইন ক্ষেত্রে নির্যাতিতা মহিলার বিচার পাবার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯৯৭ সালে ১৩ই আগস্ট সুপ্রীম্ কোর্ট কর্মক্ষেত্রে — যৌন হেনস্থা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রায় দান করেন। ১৯৯৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী নাবালক সন্তানের ওপর মায়ের অভিভাবকত্বের অধিকারকে স্বীকৃত দিল সুপ্রীম কোর্ট। এই আইনে পিতার অনুপস্থিতিতে মাতার একচ্ছত্র অভিভাকত্বের অধীকার স্বীকৃত হল। ২০০০ সালে কলকাতা হাই কোর্ট বিবাহ-বিচ্ছিন্ন মুসলিম মহিলাদের পুনর্বিবাহ না কবা পর্যন্ত খোরপোষ পাবার অধিকারের পক্ষে রায় দান করেন। এই রায়ের ফলে পরবর্তী বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রাপ্ত মুসলমান মহিলারা 'ইদ্দৎকালে'র পরেও খোরপোষ পেতে পারে।

উপরিউক্ত আইনগুলি ছাড়াও রাষ্ট্রসংঘ অনুমোদিত বিভিন্ন দাবী সনদের মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন আইনী ও সামাজিক অধিকার স্বীকৃত হয়। (তথ্যসূত্র — তনিকা সরকার, দেশ ৫ই আগস্ট ২০০০, পৃঃ — ৩৮-৩৯)[৮]

এবং রাধারাণী দেবী

আধুনিক মহিলা কবিরা পৃথিবীর সব নারীদেরই চিরাচরিত প্রথা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আহ্বান করে থাকেন। শুধু মহিলা কবিরাই নন রবীন্দ্রনাথ ও 'মুক্তি' কবিতায় সদা সঙ্কুচিতা অবগুণ্ঠিতা গৃহবধূকে বহির্জীবনে প্রকাশের মধ্যে আত্মাকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলেছেন। সমাজ ও সম্প্রদায়ের দ্বারা আরোপিত গণ্ডীর দাগ এবং বিভিন্ন বিধিনিষেধ ক্রমশই অবক্ষয়ী শক্তি। কিন্তু এই গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসারা স্বপ্ন বিশ শতকের কবি একা দেখাননি। তিরিশের দশকে যাঁরা লেখক ও লেখিকা ছিলেন তাঁরা বিশেষ করে সেই

স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন। রাধারাণী দেবী তাঁদেরই একজন। 'লীলাকমলে' তাই বলেছেন—

পাহাড়! ওগো পাহাড়! তোমার বুকেব নীড়ে
বৃথাই তুমি চাইছ মোরে রাখতে ঘিবে!
বাইরে যে-জন বেরিয়েছে সে ফিরবেনাকো —
অচল তুমি, পথ-চলা সুখপাওনিকো তাই দাঁড়িয়েথাক:
সৃষ্টি-করার আনন্দ কি বিপুলতা
উষব-মাটি শষ্পে ভরা। —*(অভিসারিণী · লীলাকমল)*

রাধারাণী দেবীর কবিতা বা প্রবন্ধের বিষয় নারী। বিশেষত নারী জীবন নাবীমনের প্রথাগত ধারার চলমান মন ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। নাবীজীবনের প্রথম ও প্রধান আদর্শ গার্হস্থ্য। তাই গার্হস্থ্য-প্রেম পূর্ববাগের রূপ ধরে তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে বারবার —

উৎসুক মোর উন্মুখ-মুখ সুখে অবনত হবে,
প্রিয় বিরহের ব্যাকুল-বেলায় সন্ধ্যা নামিবে যবে!
আনত বৃন্ত এ আননে মম,
বিদায়-চুমাটি দিবে প্রিয়তম,
অস্তরাগের অনুরাগে মোর অঙ্গ পড়িবে ঢলি
সার্থক হবে লীলাকমলের অন্তিম অঞ্জলি। —*(লীলাকমল :)*

এই কাব্যগ্রন্থটি বিষয়ে তৎকালীন সমালোচনা (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭) নিম্নরূপ :

বইখানি গীতিকবিতার সমষ্টি। কবি যেখানে অকৃত্রিম ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারে, গীতিকবিতার সার্থকতা সেইখানে। 'লীলাকমলের' লেখিকা আপনার অন্তর উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করি। আত্মপ্রকাশ করা পুরুষের পক্ষেও সহজ নয়, নারীর পক্ষে তাহা আরো কঠিন, বিশেষত আমাদের দেশে। সেই বাধা অতিক্রম করিবার সাহস 'লীলাকমল' রচয়িত্রীর আছে। তাই তাহার কবিতাগুলি প্রথাগত হইয়া উঠে নাই।...

ভাষার লালিত্যে ও ছন্দের বৈচিত্র্যে এই অন্তরোত্থিত কবিতাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছে।..."[১]

নারীর জীবন এবং গভীরতার বিচিত্র গতি সম্বন্ধে কবির ধারণা ছিল বিস্তৃত, তাই বনবিহগীতে আত্মস্থ ও গম্ভীর রেখায় ধরা পড়েছে নারীর শিল্পী মনটি।

নারী হৃদয়ের নবীন শিল্পী সেজে
জানে সে নারীর বিচিত্রতর মন
সমাজ-সীমার শীর্ণ পরিধি ত্যজে
উদার সত্যে করেছে সে আবাহন

জঞ্জালে বলি দিনু মা জলাঞ্জলি
নিখিল যাহারে গেল চলি পায়ে দলি
মূল্য তাদের কেবা প্রকাশিল আজি
পথের ধূলায় লুটায় রত্নরাজি।[১০] —(শরৎ-শর্বরী : পৃঃ ৭১)

এই কবিতায় স্পষ্টতই মনে পড়ে যায় 'স্ত্রীর পত্রেব' মৃণালকে, তার একক উজ্জ্বল প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বকে। আবার 'যোগাযোগে' কুসুমের যন্ত্রণা যেন এই কবিতায় ধরা পড়েছে। মা হওয়ার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে স্বামী মধুসূদনের ঐশ্বর্য্য অহঙ্কার। তাই কবিকণ্ঠ আরও স্পষ্ট ঋজুতায় বলে ওঠে "দেহমন নিয়ে ফাঁদ পাতা খেলা ছাড়।" অধিকাংশ নারীর একান্ত পুরুষ নির্ভরতা বিচলিত করেছিল বলেই আহ্বান জানিয়েছেন —

লীলায়িত তব মেরুদণ্ডটি সবল করিতে শেখ,
উন্নত ঋজু ভঙ্গীতে চল আজ।

বিশিষ্টতর দুটি ভাবকে অবলম্বন করেই সাধারণত সংসারে নারী প্রকৃতির সৃজন ও পরিণতি ঘটতে দেখা যায়। পুরুষের সাথে তার পার্থক্যের মূল প্রভেদ কোথায় অনুসন্ধান করতে গেলে স্ত্রীজাতির প্রকৃতিগত সেই দুটি রূপই আমাদের চোখে পড়ে। একটি নির্ভররূপ ও অন্যটি স্বনির্ভররূপ। নারীপ্রকৃতির এই স্বনির্ভর রূপকে রাধারাণী দেবী তাঁর কবিতায় চিত্রিত করেছেন —

সারা দিবসের কাজের বালাই? দোহাই থামো
অত মিছে কথা কয়ো না, রামো।
সন্ধ্যা হইতে এতখানি রাত— কি কাজ শুনি।
রাগায়ো না মোরে মিছামিছি ফাঁকা বাক্য বুনি
সরো সরো চাটু তোষামোদে আর ভুলিবনাকো
ছাড়্রে হাত্ ঘুম পেয়েছে বেজায়, ছেলেমি রাখ।

—(সপ্তম কণ্ঠে : বুকের বীণা নিশীথ-কলহ :)

আবার এই কবিতাবই পাশাপাশি চটুল পরচর্চা প্রিয় বোর্ডিংয়ের ছাত্রীর মুখে তুলে ধরেছেন জীবনের সবচেয়ে কঠিন সত্যকে —

দেহের মনের ক্ষুধার অধিক পেটের ক্ষুধাই বড়।
অনাহারে যদি আধমরা হয়ে, অমরু-শতক পড়ো, কিম্বা চালাও ঋতু-সংহাব.—
পেট কিলা তাতে ভরে?
সাধ্য কি তার রসভাণ্ডার তোমাকে তপ্ত করে!
চোখ মোছ দিদি! বুঝে দ্যাখ দিকি — জীবন স্বপন নয়,
দিন চলে গেলে অস্ত-আড়ালে যেমন সন্ধ্যে হয়,

এই আমাদের ভাবের ভুবনে তেমনি দিন-শেষে
সাঁঝের আধারে নিয়ে সংসারে দেখা দেয় ঠিক এসে!

—(কলেজ বোর্ডিং : বুকের বীণা)

আগেই বলা হয়েছে যে রাধারাণী দেবীর কবিতা ও প্রবন্ধের বিষয় হচ্ছে মূলতঃ মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ। তিরিশ শতকেব মহিলা কবিরা তাদের কাব্যের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ব্যর্থ নারী জীবনের বিলাপ। বৈধব্য, সংসার যন্ত্রণা, ঈশ্বর প্রীতি, সন্তান হাবানোর শোক অথবা ব্যর্থ জীবনের ক্ষোভ, — তখনকার মহিলা কবিদের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু এদিক থেকে রাধারাণী ছিলেন ব্যতিক্রমী মহিলা কবি। বিজ্ঞানমনস্ক বুদ্ধিতে তিনি সমাজকে দেখেছেন। তাঁর মধ্যে নারী হৃদয়ের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও যুক্তির আলোকে সব কিছু প্রতিবিম্বিত করে দেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আধুনিকতা মানে হল নিজের সময়ের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে থাকা ও ব্যক্তিত্বকে যথাযথ মূল্য দেওয়া :

- অমলাব চোখের সামনে সুস্পষ্ট হইযা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল — তাহার প্রত্যেকটি সন্তানের মৃত্যুদৃশ্য। তিল তিল করিয়া কি যাতনাই না তারা ভোগ করিয়াছে, অমলা শিহরিযা উঠিল তাদের সেই..., - যাতনা - সেই কষ্টের জন্য সেও কি দায়ী নয়? হ্যাঁ... দায়ী বইকি, নিশ্চয়ই দায়ী!

সে মূর্খ অশিক্ষিতা নারী-জননী হইবার উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞান যাহার নাই - সে জননী হইয়াছিল কি ভরসায? কোন স্পর্ধায়?... স্বামীর আদরে সোহাগে প্রেমে সে অন্ধ হইয়াছিল। উঃ, কি ভীষণ স্বার্থপর নারী। সে এই নিরপরাধ শিশুগুলিকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করার কি তার প্রায়শ্চিত্ত আছে?...

স্বামী যে ভালবাসেন, সে কাহাকে? অমলাকে — না অমলার যৌবন - সুন্দর নিটোল দেহখানিকে — তার সেই অসাধারণ রূপ-লাবণ্যকে?... অমলা নিজের প্রতি তাকাইয়া ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল।[১৩]

—(আলো-কোথায় ওরে আলো, পৃঃ — ২৩৩)

স্মরণ করি বর্তমান সময়ের সহৃদয় এক সমালোচকের সুন্দর বিশ্লেষণ :

১৯৩০ খৃঃ কাছাকাছি সময়ে বাঙলার সাহিত্য সমাজ যখন সাহিত্যের সৌন্দর্য খুঁজছিল, ভাষার সুষম পরিমিত ব্যবহারে অধরা ভাবলোক যখন বিষয় হয়ে উঠছিল কবির কাব্যের গভীর ঐতিহ্যপ্রিয়তার, কবি রাধারাণী তখন সেই অভিজাত সাহিত্যিক মণ্ডলীর মধ্যে থেকেও চিন্তাভাবনা করেছিলেন অনেক ধাপ নীচে নেমে যাওয়া মেয়ের কথা।

সেই সময় "ধর্ষণ" বা "ধর্ষিতা" শব্দটি আজকের মতো প্রতিদিন সংবাদ পত্রে পাওয়া যেত না, রাধারাণী দেবী ভেবেছিলেন, একটি ধর্ষিতা মহিলার

সামাজিক পুনর্বাসন ও স্বীকৃতির (social acceptence) কথা। তখনও একটি বিবাহিত অসহায় তরুণী যে বঞ্চনার শিকার হতেন, এখনও তার রকমফের হয় নি। সমাজ এই অসংখ্য তরুণীকে গ্রহণ করে না বলেই রাতের কলকাতার পণ্য নারীর সংখ্যা বেড়ে চলে।

কখনো নিজের ভুলে, কখনো মিথ্যা স্বপ্নের মোহে ঘরের চৌকাঠ পেরোনো, সম্পর্ণ ভাবে তথাকথিত পুরুষালী শক্তির শিকার — এই মেয়েগুলিকে তার পরিচিত প্রতিবেশ গ্রহণ করে না ঠিকই কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়ার কতটুকু খবর রাখি আমরা? এই সমস্ত তরুণী-যুবতীরা কতদূর ঘৃণা করে মুখ ফিরেয়ে নেয় সুস্থ জীবন আর সবুজ পৃথিবী থেকে, ক'জন সাহিত্যিক খোঁজেন সেই অশ্রুর রঙ?

রাধারাণী দেবীর "নির্যাতিতার কাহিনী"-তে সেই অসংখ্য, নিরপরাধ, বঞ্চিত তরুণীর সারিসারি প্রশ্নমাখা মুখ ভীড় করে আসে। তিনি সমাজের একটি জরুরী সমস্যাকে তুলে এনেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় — "মাতৃমঙ্গল" শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অংশে স্থান পেয়েছে কবিতাখানি যেখানে একজন 'মেয়েমানুষে'র, 'মানুষমেয়ে' হয়ে ওঠার মধ্যে তিনি নারীজাতির মঙ্গল খুঁজেছেন।

এ কবিতায় নারীর বাঞ্ছিত পুরুষ সম্পর্কে সমস্ত বিশেষণের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন।

"স্বামি! প্রিয়তম!...নারীর দেবতা। আমার হৃদয় রাজ![১৪]

বিস্ময়ের আর্তি ও অন্তর্নিগূঢ় শ্লেষ নিয়ে এ কবিতাটির কাহিনীর শুরু। এই বিস্ময়ই কখনও আবেগমণ্ডিত, কখনও বা স্নেহ-বুভুক্ষু মাতৃ-হৃদয়ের সন্তানস্পর্শের গভীর তাড়নায় তাড়িত, কখনও ক্ষমা প্রার্থিনীর কাতর দুটি চক্ষু মেলে লুটিয়ে পড়ে 'স্বামীর' পায়ের তলায়। কোথাও মুহূর্তের জন্য যার সশরীরী উপস্থিতি নেই তথাপি যিনি কবিতার সমগ্র অবয়ব জুড়ে আছেন, তাঁর বজ্রকঠিন ক্ষমাহীন বিবর্ণ অক্ষমতা নিয়ে। এই পুরুষ আর কেউই নয়, তিনি আমাদের সমাজ-শরীর, জীবন-বিধাতা। যার মানদণ্ডে অনায়াসে লুটিয়ে যায় নারীর সতীত্ব, মূল্যবোধ ও তার অমলিন হৃদয়।

"ধর্ষিতা নারীর গ্লানি ও সেই গ্লানিজাত ক্রোধ ও ক্ষোভ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে প্রথম পর্বে।

এ শরীর যেন প্রাণহীন জড় শব সম মনে হয়
ঘৃণাকুঞ্চিত অন্তর মোর, সারা দেহ পূতিময়;
মর্মকোষে যে শতেক নাগিনী দংশিছে ক্রূরফণা,
শান্তি ওষধি-প্রলেপ তোমারি চরণ ধূলির কণা![১৫]

দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে ধরা পড়েছে এক সীমা-হীন বিস্ময়। যে সংসারে ও স্বামীকে সে নিজের বলে মনে করত তার কাছ থেকে ঘৃণা ও ত্যাগ তার কাছে বিস্ময়ের মনে হত। তবুও, এসব অগ্রাহ্য করেও তার নারী হৃদয় স্বামীর কাছেই আত্মসমর্পণ করতে চায়—

এসো কাছে এসো, দূরে কেন অত? কেন গো আনত শিরে?
এখনও কেন গো বিবর্ণ মুখ? পেয়েছত্রে মোরে ফিরে?[১৬]

কিন্তু এই বিশ্বাস ও সমর্পণ যে কত বড় বিভ্রম তা এই নির্যাতিতা নারীটি বুঝতে পারেনি। তথাকথিত সমাজের চোখে তাকে পরিত্যাগ করাই সমাজের পক্ষে শ্রেয় বলে মনে হয়। এই অবমাননায় আত্মহননই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। তার স্বামীর কঠিন ও বিবর্ণ মুখের আড়ালে সেই সত্যই প্রতিভাত হয়েছিল তাই "মরণের কাল যবনিকা" তাকে শাস্তি দিলেও সন্তানহীনতার বেদনা সে সহ্য করতে পারবে না। তাই বারবার স্বামীর কাছে তার নারী হৃদয় চরম ব্যাকুলতা জানিয়েছে তাকেপুনরায় পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানে ফিরিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু সমস্ত আবেদন নিবেদন ব্যর্থ করে যখন তাকে চরম শাস্তি দণ্ড দেওয়া হল তখন অসহায় আর্তি ফুটে উঠেছে তার কণ্ঠে।নারীত্বের এই অবমাননা সে সহ্য করতে পারেনি তাই ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা জানিয়েছে —

স্বেচ্ছায় আমি যাইনি বিপথে, মনে প্রাণে আমি সতী,
তব বাহুপাশ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, সেত্রে সবাই জান পতি!
কুল গেছে মোর? নহি কুলবধূ, অকুলে ভাসিতে হবে?
পতিত্র-পরশে জাতিনাশ-তাই গৃহে আর নাহি লবে?
সংসারে মোর দেনা-পাওনার চুকে গেছে সব দাবি
পথে নেমে আজ খুঁজে নিতে হবে হারানো ঘরের চাবি?[১৭]

কিন্তু প্রশ্ন চিহ্ন কন্টকিত পংক্তিগুলি থেকে নারী সত্তার জেগে ওঠার আভাস যেন পাওয়া যায়। যুক্তি-যোজনায় কবির কৃতিত্বকে অস্বীকার করি কি করে। আর তাই চতুর্থ স্তবকের দীর্ঘ আয়তনে অসহায়া কন্যা যেন নিজের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজে নেবার চেষ্টা করে; আর তাতে সহায়তা করেন কবি স্বয়ং।

এই কবিতার প্রতি ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে রাধারাণী তথা অপরাজিতার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন। শুধু নাটকীয় বাকচাতুর্যই নয়, বরং একটি নারীর মানসিক ক্রমবির্বতনের ছবি যেন এ। কথপোকথনের আধারে রচিত এই কবিতায় ধরা পড়েছে —ভণ্ড, দুর্নীতিগ্রস্ত সামাজিক ও শারীরিক অত্যাচারের শিকার একটি নারীর মধ্যে সমাজে নারীর অবস্থান ও পরিণতি।

একটি অপমানিতা নারী যে নিজের অনিচ্ছায় লালসার শিকার হয়েছে তাকে এই সমাজ ও সংসার গ্রহণ করে না। আর যে পুরুষেরা শত অত্যাচার ও অনাচারের ধারক ও

বাহক তাদের বিরুদ্ধে সমাজ কখনও তার অঙ্গুলিটি তুলে ধরেনি। সামাজিক দণ্ড শুধু নারীদেরই প্রাপ্য, অত্যাচারী পুরুষের নয়। এই কবিতার মেয়েটি তাই প্রশ্ন তুলেছে—

শত অবৈধ পাপেও পুরুষ নহে পাপী অনাচারী!
হায়, তাহাদেরই খোস্-খেয়ালের-খেলনা কি শুধু নারী?[১৮]

এই প্রশ্ন সারা পৃথিবীর অসংখ্য নারীদের, যারা প্রতিদিন সামাজিক অত্যাচার ও তথাকথিত ন্যায় দণ্ডের শিকাব, যাদের জীবন থেকে আলো মুছে গিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। তাই গল্পের বিন্দু (বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ) প্রশ্ন তোলে—

এবার সে তার ভাগ্য-পরীক্ষায় বদ্ধপরিকর। সে দেখতে চায় এবার কার ইচ্ছার জয় হয়! নিজেকে নিষ্ঠুর দণ্ড দিয়ে মনে মনে হাসে আর ভাবে — এর কর্তা কে? ভগবান না মানুষ? জীবনটা আমার নিজের, সুখ-দুঃখ ভোগ করব আমি, অথচ এর নিয়ন্তা অন্য সকলে! এর অর্থ কী? আমার ভালমন্দ শুভাশুভের দায়িত্ব আমার নিজের নেই কেন? দুঃখ যদি ভোগ করতেই হয়, নিজের হাতেই তা গ্রহণ করব, স্বেচ্ছায় গ্রহণ করব, —অন্যে কেন তার নিয়ন্তা হয়?[১৯]

—(বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ)

এই প্রশ্ন আজ সারা পৃথিবীর মেয়েদের। সমস্ত অন্যায়, অবমাননা, প্রতিরোধ ও সর্বশেষে নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতেই থাকবে।

রাধারাণীর গল্প ও কবিতার অসংখ্য নারীচরিত্রের মধ্য থেকে এই মানসিকতার ছবিই ফুটে ওঠে। নারী হিসেবে শুধু নয়, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার ও চেষ্টা এই ভাবনারই শরিক। শুধু প্রেম নয়, প্রয়োজনে জ্বলে ওঠার ও কারুর মুখাপেক্ষী না হয়েও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার যে মানসিকতা আধুনিক নারীদের মনোভাবনায় স্থান পেয়েছে, রাধারাণী দেবী তারই অন্যতম পথিকৃৎ বলা চলে। এদিক থেকে একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই তিনি আধুনিক নারীর সংস্কারমুক্ততা ও মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—

তিনিই প্রথম নারীর অন্তর্নিহিত সযত্ন-পোষিত
প্রেম-বাহিনীকে ভাষা দিয়েছেন-সমাজের নিষেধকে উপেক্ষা করে।[২০]

গ্রন্থপঞ্জী: দ্বিতীয় অধ্যায়

১. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা — ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২. কল্লোল যুগ - অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৩. কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ -- রবিন পাল
৪. কল্লোল যুগের পরে -- আশু চট্টোপাধ্যায়
৫. কল্লোলের ছোটগল্প ও রুশ বিপ্লব — ড. শিবশঙ্কর পাল
৬. কবিতার কথা — জীবনানন্দ দাশ
৭. নারী জাগৃতি ও বাংলা সহিত্য — ড. জ্ঞানেশ মৈত্র
৮. রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১ এবং ২
৯. Woman in Colonial India - I. Krishnamurty
১০. Sarojini Naidu, The Traditional Feminist - Hasi Banerjee (Review: Sudeshna Chakraborty)
১১. বাঙালী সমাজে স্ত্রীশিক্ষা — বিজন বসু — পশ্চিমবঙ্গ-১৪০৪
১২. আমাদের অবনতি (নবনূর) — বেগম রোকেয়া
১৩. A Room of One's Own - Virginia Wolf
১৪. Second Sex - Simon De Bovire
১৫. The Feminine Mystique - Betty Fredal
১৬. তনিকা সরকার — দেশ — ভারতবর্ষ ২০০০
১৭. নির্যাতিতার কাহিনী ও কবি রাধারাণী দেবীর সমাজভাবনা — স্বস্মিতা গুপ্তা: "গবেষণা" — বাংলা বিভাগ — যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় — নভেম্বর, ১৯৯৫)
১৮. পরিমল গোস্বামী: জীবন ও সাহিত্য: ড. প্রতীপ মজুমদার

প্রসঙ্গসূত্র: দ্বিতীয় অধ্যায়

১. কবিতার কথা: জীবনানন্দ দাশ ১১৩-১৪
২. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা: ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য ১০
৩. কল্লোল যুগ — অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত ১২০
৪. রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১ : অপরাজিতা রাধারাণী : যশোধরা বাগচী ২১-২২
৫. কবিতার কথা — জীবনানন্দ দাশ ৭৫
৬. Woman in Colonial India - I. Krishnamurty ১৩২
৭. Sarojini Naidu, The Traditional Feminist - Hasi Banerjee (Review: Sudeshna Chakraborty)
৮. তনিকা সরকার — "দেশ" — ৫ আগস্ট ২০০০ ৩৮-৩৯
৯. 'প্রবাসী' — বৈশাখ ১৩৩৭
১০. 'শরৎ শর্বরী': বনবিহগী: রাধারাণী দেবী ৭১
১১. 'নিশীথ কলহ': বুকের বীণা: রাধারাণী দেবী
১২. 'কলেজ-বোর্ডিং': তদেব
১৩. আলো — কোথায় ওরে আলো — রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১ ২৩৩
১৪. নির্যাতিতার কাহিনী ও কবি রাধারাণী দেবীর সমাজভাবনা — হৃষিতা গুপ্ত ('গবেষণা': বাংলা বিভাগ: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: নভেম্বর ১৯৯৫)
১৫. তদেব ১২
১৬. তদেব ১২
১৭. নির্যাতিতার কাহিনী: রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা ৯০
১৮. তদেব ৯১
১৯. রাধারাণী দেবীর রচনাসংকলন ১: (বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ) ২৫৬
২০. শ্রীশচন্দ্র দাশ: "শতদল" ১৩৩৮

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলার মহিলা কবি এবং রাধারাণী দেবী

(ক) প্রাচীন মহিলা কবি

রাধারাণী দেবীর কাব্যকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন মহিলা কবিদের কাব্য প্রতিভার আলোচনা করা একান্ত প্রাসঙ্গিক প্রয়োজন। কেননা একজন কবির কবিপ্রতিভার স্ফূরণে সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব যেমন থাকে তেমনই প্রাচীন অনেক কবির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। আসলে সৃষ্টির মূলে সমসাময়িকতার প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপর্তী ধারারও সন্ধান পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে অনেক মহিলা কবির নাম জানা গেলেও কালের প্রকোপে অনেক কবির নামই হারিয়ে গেছে। এঁদের অনেক লেখাই আজ বিরল। তবুও যে কয়েকজন মহিলা কবির কাব্য-সাধনা বিষয়ে জানা যায় তাঁদের কয়েকজনের নামের উল্লেখমাত্র এখানে করা হল।

এই পর্বে সর্বপ্রথম পঞ্চদশ শতকের মাধবী দাসীর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মাধবী দাসী—শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এই কবি পুরীতে অবস্থান করতেন ও জগন্নাথদেবের হিসাব রক্ষিণী ছিলেন। শিখি মাইতির ভগিনী বিদূষী এই মহিলা শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে দীক্ষা নেন ১৫০৯ সালে। তাঁর শাস্ত্র জ্ঞান, ভক্তি ও ধর্মপরায়ণতার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। বাঙলা ভাষায় রচিত তাঁর কিছু পদ পাওয়া যায়। তিনি কখনও কখনও নিজ নাম মাধব দাসী নামে স্বাক্ষর করতেন বলে জানা যায়। তাঁর রচিত পদগুলি পুরীতে গম্ভীরায় সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু এক দুর্ঘটনায় তা ভস্মীভূত হয়।

চন্দ্রাবতী—ষোড়শ শতকের মহিলা কবিদের মধ্যে চন্দ্রাবতীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫৫০ সালে ময়মনসিংহ জেলার পাটাবাড়ী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা বিখ্যাত 'কথক' ও মনসার ভাসান, পদ্মাবতীর কবি বংশীদাস ভট্টাচার্য্য। পিতার কাছেই তাঁর শিক্ষা-লাভ এবং কাব্যরচনার সূত্রপাত। চিরকুমারী এই কবি 'রামায়ণ-গীত', মলুয়া, মনসাদেবীর

গান, দস্যু কেনারাম প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া পিতার 'মনসার ভাসান' 'পদ্মাপুরাণ' -এর কোন কোন অংশও তাঁর রচিত। কথিত আছে চন্দ্রাবতী বাল্যকালে পাঠশালার এক সহপাঠী জয়চন্দ্র কে ভালোবাসেন। কিন্তু জয়চন্দ্র এক মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়ে ধর্ম ত্যাগ করায় চন্দ্রাবতী চিরকুমারী ব্রত ধারণ করেন। পরে অনুতপ্ত জয়চন্দ্র ফিরে এলেও চন্দ্রাবতী তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-বেদনা চন্দ্রাবতী তাঁর কাব্যে ব্যক্ত করায় এই কাব্যগুলি সাধারণ জনসমাজে খুব সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ময়মনসিংহ জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি ঘরে এখনও, চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ গান ও মনসার গান ' গীত হয়ে থাকে।

আনন্দময়ী দেবী—১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় আনন্দময়ী দেবীর জন্ম হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। এক সময় মহারাজা রাজবল্লভ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে পিতা অন্য কার্যে নিযুক্ত থাকায় তিনি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি সহ সব কিছু যথাযথভাবে ভাবে প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পয়াগ্রাম নিবাসী অযোধ্যরামের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। খুল্লতাত জয়নারায়ণকে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা অবলম্বনে 'হরিলীলা' কাব্যরচনায় সাহায্য করেন। জয়নারায়ণ রচিত 'চণ্ডীকাব্যে'ও আনন্দময়ীর লেখা স্থান পায়। বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সামাজিক ও পারিবারিক মাঙ্গলিক উৎসব উপলক্ষে রচিত তাঁর গানগুলি সে সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর রচিত 'উমার বিবাহ' গানগুলি বিবাহ অনুষ্ঠানে গাওয়া হতো। স্বামীর মৃত্যু সংবাদে তিনি সহমৃতা হন।

শিবসুন্দরী দাসী (১৮০৬-১৮৯৬) — সম্ভবতঃ প্রথম বাঙালী মহিলা লেখিকা; জন্ম কলকাতায়। পিতা ঈশানচন্দ্র মুস্তাফী ও স্বামী হরকুমার ঠাকুরের প্রেরণায় সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন। এ জন্য তাঁকে অনেক পারিবারিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। এমনকি 'ম্লেচ্ছ' আখ্যা দিয়ে সামাজিক অবরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু নির্ভীক শিবসুন্দরী, সে সব অগ্রাহ্য করেন। তাঁর রচিত নাটক 'তারাসুন্দরী' বা 'তারাবতী' নাটক একসময় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

গঙ্গামনি—এই শতাব্দীর আর একজন মহিলা কবি গঙ্গামনি সম্পর্কে পূর্বোক্ত আনন্দময়ী দেবীর ভগিনী ছিলেন। তিনি ছোট ছোট কবিতা ও গান রচনা করে গেছেন। সেগুলি বহুদিন পর্যন্ত সে সময়ের বিবাহবাসরে গীত হত।

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের মহিলা কবিদের কাব্য-রচনা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রধানত ধার্মিক ও পারিবারিক উৎসবের জন্য লিখিত হলেও তাঁদের কাব্য-রচনায় স্বকীয়তা ছিল। গোষ্ঠীগত কারণে মাধবী দাসী পদ রচনা করলেও তাতে নিজস্বতার অভাব ছিল না। বাঙলা কাব্যের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে এঁরা ওয়াকিবহাল ছিলেন। আনন্দময়ী বা গঙ্গামনি পারিবারিক উৎসবের গীত রচনা করলেও তা সর্বজনীনতা

হারায়নি। একমাত্র চন্দ্রবতীর রচনাতেই কাব্যিক স্পর্শ স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। বলা যেতে পাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাব্য রচনা করলেও তা শুধুমাত্র ব্যক্তিমনের চিহ্ন বহন করছে না। ববং তা ভবিষ্যৎ কাব্যধারার আভাস দিয়েছে। তাই এই কাব্যগুলিকে আগামী যুগের সাহিত্যের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

(খ) সমসাময়িক মহিলা কবি

রাধারাণী দেবীর কবিকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে সমসাময়িক মহিলা কবিদের আলোচনা করাও প্রয়োজন। কেননা একজন কবির প্রতিভার উপকরণ ও আদর্শে সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিক পরিবেশের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। তিরিশ দশকের মহিলা কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে তিরিশ-পূর্ব কবিদের আলোচনাও করা প্রয়োজন; বিশেষ করে মহিলা কবিদের আলোচনা করা প্রয়োজন। আর এ প্রসঙ্গে প্রথমেই গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর কথা উল্লেখ করা দরকার।

গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী — জন্ম কলকাতায় ১৮ আগস্ট ১৮৫৮ - মৃত্যু ১৬ আগস্ট ১৯২৪, পিতার নাম হারানচন্দ্র মিত্র। দশ বছর বয়সে বিখ্যাত বণিক পুত্র অক্রুর দত্তের বংশধর নরেশ চন্দ্র দত্তের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। পিতা ও স্বামীর কাছেই তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। শ্বশুর বাড়ীতে সেকালের সাবিত্রী লাইব্রেরী ছিল। 'জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাবলী' তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা বাহার' ১৮৭২-এ প্রকাশিত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর বিখ্যাত শোককাব্য 'অশ্রুকণা' রচনা করেন। অক্ষয় কুমার বড়াল কর্তৃক এই গ্রন্থের কবিতাবলী নির্বাচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্য ছিল। তিনি তিনবছর 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'সখী সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভবের' বাংলা পদ্যানুবাদ তাঁর অন্যতম কীর্তি। অতঃপুরবাসিনী এই কবির কবিতা গার্হস্থ্য চিত্র সম্বলিত আত্মগত রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা দশ। অন্যান্য গন্থের মধ্যে 'ভারত কুসুম', 'আভাষ', 'স্বদেশিনী', 'সিন্ধুগাথা', 'অর্ঘ্য', 'শিখা', প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর প্রতিটি কবিতার সঙ্গে প্রায় ছবি আঁকা থাকত। তাঁর একটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা হল —

কি দেখাও সরসী?
হৃদয়ে ধরেছ তুমি গগনের শশী
আনন্দ লহরী মেখে গরবে উঠেছ কেঁপে,
হাসিতেছ টিপিটিপি সোহাগের হাসি।

ভাবিছ অমন চাঁদ আর আছে কার?
কবিমুখে সুধাহাসি ঝরে সুধাধার
হয়োনা সরসি তুমি মত্ত অহংকারে
ঐ দেখ মাতৃ অংকে শিশু শোভা ধরে
তব চাঁদ মুখে মসী কলঙ্কের দাগ
মোদের চাঁদের মুখে নবতম রাগ
তব চাঁদ দিবা নিশি ভাতি না বিকাশে
আমাদের অঙ্কে চাঁদ নিশিদিন হাসে।
দেখিতে তোমার চাঁদ না জানে সরসি
নক্ষত্র বালিকা মাঝে শুধু থাকে বসি।
খেলিতে মোদের চাঁদ তব চাঁদ সনে
ক্ষুদ্র দুইখানি কর আন্দোলি সঘনে
কচি কচি দন্তগুলি বিকশিয়া কুন্দকলি
মনের হরষে ভাসে আধো আধো ডাকে
আয় চাঁদ আই আই ঘন ঘন দেয় তাই
ছি ছি কেন গো তোমার চাঁদ শুধু চেয়ে থাকে।'

—(সবসী জলে শশী — গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী)

স্বর্ণকুমারী দেবী—জন্ম জোড়াসাঁকোয় ২৮ আগস্ট ১৮৫৫। মৃত্যু ৩ জুলাই ১৯৩২। পিতা মহার্যি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উত্তর জীবনে কবি, ঔপন্যাসিক ও সমাজসেবিকা রূপে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তার মূলে ছিল বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক পরিবেশ এবং স্বামীর উৎসাহ।

এ বিষয়ে তিনি তাঁর লেখা "The Fatal Garland-ইংরাজি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

"It was my loving and revered father Maharshi Debandra Nath Tagore, who had prepared me for my life's career by giving me an education unsusual for Hindu girls of those days. Still, but for the help and encouragement given to me by my beloved husband, I do not think that it would have been possible for me to venture so far. It was he who moulded and shaped me in the fashion that the outside world knows today, and under his loving guidance I passed through stormy wones of literary life as easily and pleasantly as a good swimmer through a rough sea ......

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ার এক জমিদার পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত দৃঢ়চেতা যুবক জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পিরালী ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহেব জন্য তিনি ত্যাজ্যপুত্র হন ও নিজ অধ্যবসায়ে ব্যবসায়ী ও জমিদারী প্রতিষ্ঠা করে 'বাজা' উপাধী পান। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা স্বর্ণকুমারীর অন্যতম কীর্তি। ১২৯১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০২ পর্যন্ত তিনি এই সম্পাদনা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে অবার ১৩১৫ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যিকদের প্রতিভা স্ফূরণে সাহায্য করে। এছাড়া তিনি 'বালক' নামে আর একটি কিশোর পত্রিকা সম্পাদনা করেন। জাতীয় আন্দোলনে তাঁর কন্যা সরলা দেবী নেত্রীস্থানীয়া ছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত অল্প সংখ্যক মহিলাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী অন্যতম ছিলেন। এই সময়ে তিনি কংগ্রেসের কাজে নিয়মিত যোগদান করতেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে তিনি কলকাতায় 'সখী সমিতি' নামে নারী কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। নিরূপায় বালিকা ও বিধবাদিগের শিক্ষাদান ও তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির উদ্যোগে বেথুন স্কুল ভবনে তিন দিন ব্যাপী একটি মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সে যুগে এই ব্যাপারটি যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল মেলার মাধ্যমে স্বদেশী বক্তব্য প্রচার ও প্রসার।

স্বর্ণকুমারী দেবী রচিত ও প্রকাশিত প্রথম উপ্যানাস 'দীপ নির্বাণ'। তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যে কী পরিমাণ স্বচ্ছন্দ ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর রচনার বিভিন্নতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে। স্বর্ণদেবীর রচনা সমূহ ঃ

উপন্যাস : স্নেহলতা বা পালিতা, ফুলের মালা, কাহাকে?, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলনরাত্রি।

ঐতিহাসিক উপন্যাস : মেবাররাজ, হুগলির ইমানবাড়ি, বিদ্রোহ।

নাট্যোপন্যাস : রাজকন্যা।

নাটক : নিবেদিতা, দিব্যকমল।

গীতিনাট্য : বসন্ত উৎসব, বিবাহ উৎসব।

কাব্যনাট্য : দেবকৌতুক, যুগান্ত।

প্রহসন : কনে বদল, পাকচক্র।

ছোটোগল্প : নবকাহিনী।

কবিতাগ্রন্থ : গাথা কবিতা ও গান ইত্যাদি মোট পাঁচটি কবিতা গ্রন্থ।

বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ : পৃথিবী।

মোট সাতাশটি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

'ফুলের মালা' ও 'কাহাকে' উপন্যাস দুটি ইংরাজীতে এবং 'দিব্যকমল' নাটকটি 'প্রিন্সেস কল্যাণী' নামে জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' স্মৃতি পদক উপহার দেন। তাঁর প্রতিভার আর একটি দিক হল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ ও প্রর্বতনা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার প্রতি তাঁর ঝোঁক প্রবল ছিল। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি 'পৃথিবী' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা একটি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে—

সখি, নব শ্রাবণ মাস,
জলদ ঘনঘটা দিবসে সাঁঝ ছটা
ঝুপু ঝুপু ঝরিছে আকাশ
ঝি ঝিমিকি ঝম ঝম নিনাদ মনোরম
মুহুর্মুহু দামিনী আভাস
পবন বহে মাতি তুহিন কণা ভাতি
দিকে দিকে রজত উচ্ছ্বাস,
উছলে সরোবর পত্র মরমর
কম্পে থর থর পান্থ নিরাশ
যুবতী যুব জনা পরম প্রীতমনা
দুহুঁদোহে বাঁধা ভুজ পাশ
বিরহে যাপি যামি ঘুমায়ে ছিনু আমি
স্বপনেতে মিলল উল্লাস।[৯]

—(শ্রাবণ মাস — স্বর্ণকুমারী দেবী)

কবিতাটিতে 'বৈষ্ণব পদাবলীর' প্রভাব অনুভব করা যায়। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ রচিত ভানুসিংহের পদাবলীর ইঙ্গিত এখানে পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রসন্নময়ী দেবী—জন্ম পাবনায়, ১৮৫৭ সালে, মৃত্যু ২৫ নভেম্বর ১৯৩৯। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী। স্বামী কৃষ্ণকুমার বাগচী, প্রখ্যাত লেখক ও সবুজ পত্রের সম্পাদক তাঁর অনুজ; এবং প্রখ্যাত মহিলা কবি প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁর কন্যা। ১২ বছর বয়সে রচিত তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'আধো-আধো-ভাষিনী' প্রকাশিত হয়। 'মাতৃমন্দির' 'ভারতবর্ষ' এবং 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী প্রসন্নময়ী কিশোর বয়সে লিখেছিলেন - 'হবে না কি এই দেশে ব্রাহ্মধর্মাচার!' গদ্য রচনাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লেখা তাঁর উপন্যাস 'অশোক' সে সময়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা ও নীহারিকা' স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ 'পূর্বকথা', 'অর্য্যাবর্ত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই স্বদেশ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাৎসল্য-রসও তাঁর কবিতার অন্যতম বিষয়—

ছোট ছোট রাঙা পায়ে চুমো খেতে সাধ যায়
কোকোনদ সম,
রক্তিম চরণ দুটি গৃহ সবোবরে ফুটি
দূর করে তমো
নবনীত সুকোমল শোভে রাঙা শতদল
ধবল শয্যায়,
কনক চম্পক কলি সজ্জিত আঙুলগুলি
আনন্দ জাগায
সাদা লালে মাখা মাখি ববণ ফলাইযা আঁখি
সচঞ্চল কবে
কভু বসি কভু শুযে খেলে শিশু নুযে নুযে
পদযুগ ধবে
আবাব পুবিয়া মুখে লেহন কবাযে মুখে
খেলনা ভাবিয়া
যে পদ সবজে তাব চুমো দেয বাব বাব
জনক হাসিয়া।
জননী হৃদযে তুলে স্তন্য যবে দেয খুলে
শিশু রাঙা পাযে
কৌতুকে আঘাত কবে উচ্ছ্বাস আনন্দ ভবে
সোহাগে মাতায।[৩]

—(শিশুব চবণ — প্রসন্নময়ী দেবী, ভাবতী —
১৩২৩ আশ্বিন, পৃঃ ৬৪৫ - ৬৪৬)

প্রসন্নময়ী দেবীর গদ্য রচনার একটি নমুনা—

১৮৮১ সালের মার্চ মাসে আশু বিলাত রওনা হইয়া যান। তাহাতে পাবনা রাজসাহী জেলায় একটা মহা হুলুস্থূলু কান্ড উপস্থিত হয়। আশু বিলাত যাওযার পর গ্রামের জ্ঞাতিবর্গ পিতৃস্বসা ঠাকুরানীদের জীবনের শান্তিভঙ্গ জাতিনাশ ও সমাজচ্যুতির ভয় প্রদর্শনে তাহাদিগকেই একান্ত কাতর ও উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। দীর্ঘ পাঁচবর্ষে স্বভাবতঃ এসব গোল মিটিয়া যাইবার কথা, কিন্তু মক্ষিকা ছিদ্রানুসন্ধানীর ন্যায় জাত্যভিমানীগণ তাঁহাদের পশ্চাতে লাগিয়াই থাকিল এবং আশুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন গোলযোগ উঠাইয়া এবার রীতিমত আমাদিগকে এক ঘরে করিয়া দিলেন। জাত গেল আমাদের আর তাহার জন্য অশান্তি ভোগ ঘটিল পিসিমাতাদিগের ভাগ্যে। সাংসারিক সুচতুর ব্যক্তিরা সময়কালীন আসিয়া পিতাকে গোপনে নিশীথ অন্ধকারে আশুর আহার-ব্যবহার করিতে এবং প্রকাশ্যে দূরে থাকিয়া

জাতিরক্ষার্থে উপদেশ দিতেও পরান্মুখ হইলেন না। যদিও এই হিতবাক্য ও শুভ ইচ্ছা ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় বৃথা হইয়া গিয়াছিল, তবুও তাহাদিগের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। অচল অটল পিতৃদেবের সেই একই কথা - সমস্ত ছাড়িব, আশুকে কখনও দূরে রাখিয়া জাতি রক্ষা করিব না, আশু আমার সর্বস্ব। তাহাকে আমি বিলাত পাঠাইয়াছি। জাত যাইবার ভয় থাকিলে এ কার্য্য করিতাম না। ক্রমে আমার সব ছেলে বিলাত যাইবে। তাঁহার এই দৃঢ়তায় ক্রমশ জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ জাতি লইয়া পলায়ন করিলেন আমরা আমরাই রহিয়া গেলাম।'

—('পূর্বকথা' — প্রসন্নময়ী দেবী পৃঃ ১৩৪-১৩৫
আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশন ২রা জানুয়ারী ১৯১৭)

প্রসন্নময়ী দেবীর গদ্য রচনার প্রাঞ্জলতা বিস্ময়কর। বিষয়, সমাজ নিরীক্ষণ ও সাহিত্যধর্মিতা সে যুগের গদ্য রচনার ক্ষেত্রে প্রায় বিপরীতধর্মী বলা চলে। সে যুগের সামাজিক আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির একটি সুস্পষ্ট ছবি যেন এই গদ্যাংশ।

মৃণালিনী সেন—জন্ম বিহারের ভাগলপুরে ৩ আগস্ট ১৮৭৯, মৃত্যু — ৭ মার্চ ১৯৭২। পিতা-লাডলীমোহন ঘোষ। তের বছর বয়সে পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্র চন্দ্র সিংহের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। দুই বৎসরের মধ্যে বিধবা হন। এই সময় থেকেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রতিধ্বনি'— ১৮৯৫, 'নির্ঝরিনী' — ১৮৯৬, কল্লোলিনী ও মনোবীণা — ১৯০০। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২৬ বছর বয়সে ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবক্তা কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয়পুত্র নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পুনর্বিবাহ হয়। এই বিবাহ তৎকালীন সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে স্বামীর সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে অল্পকাল থাকেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পুনর্বার লণ্ডনে গিয়ে একাদিক্রমে ষোল বছর থাকেন এবং ইংরেজীভাষার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা করেন। এখানে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। গান্ধীজী তাঁর নিকট বাংলা ভাষা শেখেন। মৃণালিনী রচিত ইংরাজী প্রবন্ধাবলী এবং বক্তৃতাদি ভারতে এবং ইংলণ্ডে বিভিন্ন মনীষীদের দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল। তিনি মহিলাদের ভোটাধিকার নিয়ে ভারতে এবং ইলংণ্ডে আন্দোলন শুরু করেন। ক্যাথরিণ মেয়ো রচিত 'মাদার ইণ্ডিয়া' গ্রন্থের প্রতিবাদে তিনি বহু প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তার ইংরাজী রচনা-সংগ্রহ "Knocking at the door" প্রকাশিত হয়। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'মনোপ্লেন' ভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 'Indian Institute of Aerontic and Electronics' সংস্থার অনারারী সদস্য হয়েছিলেন। তাঁর 'প্রতিধ্বনি' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি কবিতা—

নদীর তীরে সারা বেলা
আপন মনে করি খেলা

চেয়ে দেখি সন্ধে বেলা
সবাই গেছে চলে।
আমি শুধু এপারে
রয়েছি একলা পড়ে
মত্ত ছিনু খেলা ঘোরে
কখন গেছে ফেলে।

সঙ্গী নাই কেহ আর
চলে গেছে যে যাহার
এবে কিসে হব পার
তরণী নাহি পার।

ওই যে হোথা ধীরে ধীরে
যায় একখানি তরী
ওগো মোরে দয়া করি
করিয়া দাও পার

আনমনে খেলাই ভুলে
আমি শুধু একা কূলে
বসে আছি লওগো তুলে
এই সন্ধ্যা আঁধারে।

কেহ তো গো শুনিল না
তরী কূলে আসিল না
আমারে ত লইল না
রহিনু একা পড়ে।[৮]

— ('প্রতিধ্বনি' ২রা ভাদ্র ১৩০০ পৃঃ ৮৬-৮৬)

মানকুমারী বসু—জন্ম: ২৩ জানুযারি ১৮৬৩, মৃত্যু — ২৬ ডিসেম্বর ১৯৪৩। ছদ্মনাম 'জনৈক বঙ্গমহিলা'; জন্ম যশোর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামে। পৈতৃক নিবাস যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। পিতা — আনন্দ মোহন দত্ত। স্বামী — বিদ্যানন্দ নিবাসী বিধুশংকর বসু। মাইকেল মধুসুদন দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৌত্রী মানকুমারীর বিবাহ হয় ১৮৭৩-এ। ১৮৮২ সালে একটি কন্যা নিয়ে বিধবা হন। মূলতঃ কবি ও ছোটগল্প লেখিকা মানকুমারী বসু ষাট বৎসর যাবৎ কবিতা ও ছোটগল্প ছাড়া অন্তঃ পুরে নারীদের শিক্ষাদান, পল্লীগ্রামে স্ত্রী চিকিৎসক ও ধাত্রীর আবশ্যকতা, সমাজের দুনীর্তি ও কুসংস্কার নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে

প্রবন্ধ রচনা ইত্যাদি কর্মের দ্বারা সাহিত্য ও সমাজের সেবায় নিরত ছিলেন। কবিতাগুলি প্রিয়বিয়োগ বেদনায় অশ্রুসিক্ত। ছোটগল্প 'রাজলক্ষ্মী', 'অদৃষ্টচক্র' ও 'শোভা' কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত হয় যথাক্রমে ১৩০৩, ১৩০৫ ও ১৩০৬ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক' (১৯৩৯) ও 'জগত্তারিনী স্বর্ণপদক' (১৯৪২) দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেন। সাহিত্য কৃতীর জন্য ১৯১৯ থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভারত সরকারের বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৯৩৭ সালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হন। প্রকাশিত গ্রন্থ 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি'— ১৮৭৩, কনকাঞ্জলি ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, বীরকুমার-বধ কাব্য ১৩১০, বিভূতি — ১৩৩০, সোনারপাখী — ইত্যাদি। গদ্যে ও পদ্যে মিশ্রিত রচনা প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয় — ১৮৮৪। শুভ সাধনা — ১৩০১, উপন্যাস — বনবাসিনী— ১৩৯৫, গল্প — পুরাতন ছবি, প্রবন্ধ — ২টি প্রবন্ধ ১২৯৮। বাঙালি রমনীদের গৃহধর্ম — ১৮৯০। বিবাহিত স্ত্রীলোকের কর্তব্য ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা গভীর দেশপ্রেমমূলক একটি কবিতা :

নিত্য তুমি শুধাও সখি
আমার কেন যোগ সাধনা
বোল্‌ব বলে মনে করি
বোলতে পোড়া মুখ ফোটে না

দেখনিকি প্রিয় সখি
মা আমাদের কাঙালিনী
পরের দ্বারে ভিক্ষা করে
অশ্রুমুখী অভাগিনী।
মলিন বদন মলিন বসন
দুই নয়নে ঝরে জল
প্রাণের মাঝে আরও বাজে
যেথায় জ্বলে বজ্রানল।
তারে দেখি আহা-উহ
করে সবাই ধরণীতে
কিন্তু কেহ মিলে না সই
প্রাণের ব্যথা ঘুচাইতে।

আমরা এত ভাই ভগিনী
সবগুলি জীয়ন্তে মরা
পঁচিশ কোটি জীবন্মৃত

আছি মায়ের কোলে ভরা।
কি মুখে আর জীবন রাখা
কি আশে আর রব ঘরে
সে কিসে ভাই আরাম পাবে
জননী যার ভিক্ষা করে।"

—('যোগিনী' — মানকুমারী বসু : 'কনকাঞ্জলি' পৃঃ- ১০০)

কামিনী রায়—জন্ম পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলায় বাসন্ডা গ্রামে ১২ অক্টোবর ১৮৬৪, মৃত্যু কলকাতার ভবানীপুরে ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩। পিতা সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেন। ভ্রাতা সেকালের প্রখ্যাত চিকিৎসক যামিনী সেন। স্বামী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়। সংস্কৃতে অর্নাস সহ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বি.এ পাশ করেন। ছদ্মনাম 'জনৈক বঙ্গমহিলা'। ১৮৮৬ থেকে দীর্ঘদিন তিনি বেথুন বিদ্যালযের অধ্যাপিকা ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক 'জগত্তারিণী' পদক দ্বারা সম্মানিতা হন। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৩ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভানেত্রী ছিলেন। মহিলা কবি হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতা ছিলেন। নীতিমূলক ও আবেগমূলক কবিতায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ভাব ও ভাষার সংযম ও পরিমিতি, বোধ ও শব্দ চয়ন কৌশল তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'পৌরাণিকী' ১৮৮৯ 'অশোক —সংগীত' ১৯১৪, 'দীপ ও ধূপ' ১৯২৯, জীবন পথে ১৯৩০, 'আলো ও ছায়া' ও 'অম্বা' ১৯১৫ 'গুঞ্জন' ১৯১৭, 'মাল্য ও নির্মাল্য' ১৯১৩ বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। গল্পগ্রন্থ 'ধর্ম্মপুত্র' ১৯০৭, 'শ্রাদ্ধিকী' ১৯১৯, নাটক 'সতী মা' ১৯১৯ এবং জীবনীগ্রন্থ- ডঃ যামিনী রায়ের জীবনী তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী তাঁর একটি বহুপঠিত বিখ্যাত কবিতা—"মা অমার" :

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বির্সজন
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি,-মা আমার, মা আমার।
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে,
ছোটখাটো সুখদুঃখ কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ—মা আমার, মা আমার—
অতীতের কথা কহি বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়,
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার
মরিব তোমারই তরে, মা আমার মা আমার।

মরিব তোমারই কাজে বাঁচিব, তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার
থাক্ প্রাণ যাক্ প্রাণ, মা আমার, মা আমার।। [৭]

—(মা আমার—কামিনী রায়, আলো ছায়া, পৃঃ-১৭)

এ কবিতাটি সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

"মা আমার গানটিতে অমি "মা" ভাবটাকে সমস্ত অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিয়া ভরিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ নই বলিয়া দিয়াছিলাম একটা সহজ সুর—আমার নির্দেশ মত স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় দিয়াছিলেন।"

প্রিয়ম্বদা দেবী—জন্ম — পাবনা জেলার গুণাইগাছা গ্রামে ১৮৭১ সালে। মৃত্যু — ১৯৩৫ সালে কলকাতায়। পিতা কৃষ্ণকমল বাগচী। মাতা বিখ্যাত লেখিকা প্রসন্নময়ী দেবী। স্বামী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতুল আশুতোষ চৌধুরী ও প্রমথ চৌধুরী। কৃষ্ণনগর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৮৯০ তে বেথুন কলেজ থেকে এফ.এ ও ১৮৯২-তে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯২ সালেই তাঁর বিবাহ হয়। ১৮৯৩ সালে পুত্রসন্তান লাভের পর ১৮৯৫-এ স্বামীর অকালমৃত্যু ঘটে। স্বামীর মৃত্যুর মাত্র ১৩ দিন পরে একমাত্র পুত্রটিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্বামী-পুত্রের মৃত্যুর পর মাতা প্রসন্নময়ীর প্রেরণায় সমাজসেবা ও কাব্যচর্চায় নীরতা হন। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা প্রিয়ম্বদা নারীশিক্ষা প্রচলনে আত্মনিয়োগ করেন ও একাধিক নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডলের কর্মাধ্যক্ষা নির্বাচিতা হয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা নিযুক্ত হন্। প্রধানতঃ দুঃখবাদী কবি প্রিয়ংবদার কাব্যের ভাব ও ভাষা স্বচ্ছ ও সুন্দর। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কাব্য — 'রেণু —১৯০০, 'তারা' — ১৯০৭, 'পত্রলেখা'— ১৯১১, 'অংশু' — ১৯২৭, 'চম্পা ও পারুল'— ১৯৩৯। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'অনাথ' ১৯৩৫ 'কথা ও উপকথা' ১৯২৩, 'পঞ্চুলাল' ১৯২৩ 'ঝিলে জঙ্গলে শিকার' (অনুবাদ) — ১৯২৪ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

প্রিয়ম্বদা দেবীর একটি কবিতা ঃ

নিদাঘেতে হে প্রকৃতি ছিলে বিরহিনী
বেণিবদ্ধ কেশপাশে ভূতলশায়িনী
তাই আছিল না ছায়া তব দীর্ঘশ্বাস
অনলে ভরিয়া ছিল অনন্ত আকাশ।
এতদিনে প্রিয়বুঝি ফিরে এল দেশে,

স্নিগ্ধ স্নাত তনু তাই আর্দ্র মুক্ত কেশে
তুমি বাহিরিয়া এলে বিশ্বের দুয়ারে,
সুমঙ্গল বজ্র শঙ্খ ধ্বনি বাবে বাবে
শুনাইলে বিশ্বজনে মিলন কাহিনী।
তাইতো প্রবাসী হিয়া হ'য়ে উদাসিনী
আজ ধায় স্বদেশের পানে; তরুশাখে
কলাপী ময়ূর ডাকে ময়ূরী প্রিয়াকে,
কেকা কলরবে ত্যাজি ভূতল শয়নে
বিরহিনী দাঁড়াইলে মুক্ত বাতায়নে।'
—(বর্ষাবম্ভে প্রকৃতির প্রতি — প্রিয়ম্বদা দেবী বেণু ১৯০৭ : পৃ ৯)

সরলা দেবীচৌধুরানী— জন্ম জোঁড়াসাঁকোয় ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭২, মৃত্যু ১৮ আগস্ট ১৯৪৫ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষাল ছিলেন তাঁব পিতা। মাতা স্বর্ণকুমারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভাগিনী ও প্রখ্যাত লেখিকা। পিতাব বিলাত প্রবাসকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে তাঁর শৈশব কাটে। বেথুন স্কুলে ভর্তি হয়ে কবি কামিনী রায ও লেডী অবলা বসু প্রমুখের সহপাঠী হন। ১৮৮৬তে এন্ট্রান্স ও ১৮৯০-তে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি.এ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বব পেয়ে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। ফার্সি ও সংস্কৃত ছাড়া তিনি ফরাসী ভাষাও জানতেন। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী অল্প বয়সে তাঁব বিবাহ হয়নি। সঙ্গীতজ্ঞা হিসাবে প্রথম জীবনে খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটি সপ্ত কোটির পরিবর্তে ত্রিংশ কোটি শব্দ যোগ করে গেয়েছিলেন। স্বভাবসুলভ দুঃসাহসিকতার সঙ্গে সুদূর মহিশূরে গিয়ে মহারানী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯০৩-এ কলকাতায় প্রতাপাদিত্য উৎসব এবং শক্তির আরাধনায় 'বীরাষ্টমী' উৎসবের সূচনা করেন। এসব কাজের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মনে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করতেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কে (নিরালম্ব স্বামী) বাংলার প্রথম 'গুপ্ত বিপ্লবী' দল গঠনে সাহায্য করেন। স্বদেশী দ্রব্য জনসাধারণের মধ্যে চালু করার জন্য ১৯০৪ সালে তিনি 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' স্থাপন করেছিলেন। তিনিই ভারতীয় নারীদের মধ্যে প্রথম মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৯০৫ এ-সম্পাদক ও পাঞ্জাবের ব্যবহারজীবী রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ব্রিটিশ রাজরোষে স্বামী গ্রেপ্তার হলে সরলা দেবী পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন এবং এর একটি ইংরাজী সংস্করণও প্রকাশ করেন। এছাড়া পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে পর্দানসীন মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজেও উদ্যোগী হন। ১৯১০ এ এলাহাবাদ কংগ্রেসে এ বিষয়ে তিনি নিজ পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর চেষ্টার ফলে ভারত স্ত্রী 'মহামন্ডল' প্রতিষ্ঠিত হয় ও সারা ভারতে তার শাখা বিস্তার

লাভ করে। ১৯২৩-এ তাঁর স্বামীর মৃত্যু হওয়ার পর তিনি কলকাতায় 'ভারত স্ত্রী সদন' স্থাপন করেন। ১৯৩৫ খৃ: শিক্ষা জগৎ থেকে অবসর নেন ও ধর্মীয় জীবনে ফিরে যান। প্রথম দিকে 'থিয়োজফিকাল সোসাইটি' ও পরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হলেও শেষ জীবনে বিজয় কৃষ্ণ দেবশর্মাকে গুরুপদে বরণ করেন। রাজনৈতিক জীবনে লালা লাজপত রায়, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, বাল গঙ্গাধর তিলক ও গান্ধীজীর সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল। কিছুদিন 'ভারতী' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন, মহিলাদের মধ্যে লাঠি খেলা ও তলোয়ার খেলা প্রচলন করেন। বীরভূম ও লক্ষ্ণৌ শহরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পরিচালনা করেন। জাতীয়তাবাদের অন্যতম নেত্রী সরলা দেবী রচিত ১০০টি জাতীয় সংগীতের সংকলন 'শতগান' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'জীবনের ঝরাপাতা', 'নববর্ষের স্বপ্ন', 'শিবরাত্রির পূজা'।

'শতগান'-এর একটি কবিতা :

দুঃখেরে আজ করব আমি বশ
তিক্ত হাতে কাড়ব সুধারস।
জগৎ যত হবে কালোতর
শ্যামের মাঝে দেখব শ্যামসুন্দর।
ভয়ানক কি পালিয়ে যাবে
শুধুই ভয় দেখিয়ে
ছাড়ব না ভাই বজ্র মুঠোয়
রাখবো তারে ঠেকিয়ে
মুখোশখানা ফেলব তার ছিঁড়ে
পশব আমি বুকের ভিতর চিরে
হৃদয় মনি যেথায় বাজে আঁধারে ঝকমকিয়ে
সেইখানেতে গিয়ে হরণ করব মণি ঠেকিয়ে
জগৎ যত হবে কালোতর
শ্যামের মাঝে দেখব শ্যামসুন্দর'

—(দেশাত্মিকা: সরলা দেবী — শতগান পৃ: ২৬)

নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী—জন্ম হুগলীর পালপাড়া ১৮৭৮। মৃত্যু ১৯০৬। পিতা — নৃত্য গোপাল সরকার, স্বামী — খগেন্দ্র নাথ মিত্র মুস্তাফী। ছোটোবেলায় কিছুদিন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পরে নিজের চেষ্টায় বাংলা, ইংরাজী, ওড়িশি ও সংস্কৃত শেখেন। ১২ বছর বয়স থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। নব্য ভারত সাহিত্য, বামা বোধিনী, বীরভূম, পূর্নিয়া, জন্মভূমি প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখতেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে অমিয়-গাথা, মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা ও ব্রজগাথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অমুদ্রিত গন্থের সংখ্যা আট,

প্রেমগাথা গ্রন্থেব জন্য 'হেযাব প্রাইজ এণ্ড ফাণ্ড' এব অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক পুরস্কৃত এবং অমিযগাথা গ্রন্থের জন্য সরস্বতী উপাধি প্রাপ্ত হন।

কবির কাব্যকৃতীব একটি উদাহবণ—

তাবে কি কহে গো শ্মশান?
পাষাণে বাঁধিযা হিযা যান যথা বর্জিয়া
জননী সন্তানে স্নেহ দিয়া বলিদান?
তাবেই কি কহে গো শ্মশান?
যেখানে প্রাণেব পতি বিসর্জন দিযা সতী
বিধবা সাজে গো বধি পাষাণে পবাণ?
তাবেই কি কহে গো শ্মশান?
যেখানে প্রণযীগণ প্রণযিনী বিসর্জ্জন
দিযা হৃদযেতে পোষে দাবাগ্নি মহান
তাবেই কি কহে গো শ্মশান?
যেখানে শুইলে পরে ফিরে আসে নাকো ঘরে
লোভ মোহ অন্ধকাব হয তিরোধান?
তাবেই কি কহে গো শ্মশান?
যেখানে ধনী দীন কেহ নাহি হয় ভিন
সংসারেব জ্বালা রাশি হয় অবসান?
তাবেই কি কহে গো শ্মশান?
স্বার্থেব অনল যেথা না দেয় মরমে ব্যাথা
আত্মপর নাহি যথা সবাই সমান?[১০]

—(শ্মশান: নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী — পৃঃ ৩)

কুসুমকুমারী দেবী — জন্ম পূর্ববঙ্গের বরিশালে ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫, মৃত্যু কলকাতায় ১২ জানুয়ারি/১৯৪৮। পিতা চন্দ্রনাথ দাস ছিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। মাতা ধনমনি। স্বামী শিক্ষক সত্যানন্দ দাশ। পুত্র প্রখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশ। 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে সাহিত্য কর্মে প্রেরণা লাভ। বরিশাল মাইনর স্কুল ও হাইস্কুল থেকে পাশ করার পর কলকাতার বেথুন স্কুলে ছাত্রী ছিলেন। ১৮৯৪ ও প্রবেশিকা শ্রেণীতে পাঠ কালে বিবাহ হয়। জীবনের অধিককাল বরিশালে যাপন করেন। এমন কি দেশ বিভাগের পরেও কিছুকাল বরিশালে ছিলেন। স্বামী সত্যানন্দের মৃত্যুর পর (১৯৪২) দমদম আলিপুর ও ব্যারাকপুরে বসবাস করেন। ১৯৪৮ সালে স্থায়ীভাবে কলকাতায় আসেন ও কলকাতার ১৮৩নং ল্যান্সডাউন রোডে বসবাস করেন। মূলত নীতিমূলক কবিতার রচয়িত্রী কুসুমকুমারী প্রবাসী, ব্রহ্মবাদী, মুকুল প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। প্রকাশিত

গ্রন্থ : কবিতা মুকুল — ১৮৯৬, ছোটোদের কবিতা — ১৮৯৬, পৌরাণিক আখ্যায়িকা — ১৯০২। কবির অতিপরিচিত একটি কবিতা :

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে!
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
মানুষ হইতে হবে এই তার পণ
বিপদ আসিলে কাজে হও আগুয়ান,
নাহি কি শরীরে তব রক্ত মাংস প্রাণ?
হাত ,পা সবারই আছে মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার সেকি পড়ে রয়?
সে ছেলে কে চায় বল কথায় কথায়,
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়
সদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ—
'মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন'
কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার
সবারই রয়েছে কাজ এ বিশ্ব মাঝার,
হাতে প্রাণে খাট সবে শক্তি কর দান
তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ[১১]

—(আর্দশ ছেলে: কুসুমকুমারী দাশ:'মুকুল' পৃ: ২৭)

শান্তিসুধা ঘোষ—জন্ম পূর্ববঙ্গের গাভায় ১৮ জুন ১৯০৭; মৃত্যু ৭ মে ১৯৯২- কলকাতায়। পিতা বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ ঘোষ। মাতা অন্নদাসুন্দরী ও কবি ছিলেন। শান্তিসুধা সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শিক্ষাব্রতী ছিলেন। মাতার কাছে শিক্ষা শুরু। ছ'বছর বয়সে ব্যাপটিষ্ট মিশন পরিচালিত ছোট মেমের স্কুলে ভর্তি হন। পরে ১৯১৫তে ব্রাহ্ম মহিলা স্নেহলতা দাসের সদর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে পড়েন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য কলকাতা ছেড়ে বরিশালে গিয়ে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন মনোরমা গুহ ও হেমলতা রায়। তাদের নিয়েই বি.এম কলেজে মহাশিক্ষার প্রর্বতন হয়। ঐ কলেজ থেকেই আই.এ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান ও বি.এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং ঈশান বৃত্তি লাভ করেন। তিনিই প্রথম মহিলা 'ঈশান স্কলার'। ঈশান স্কলার হিসেবে তিনিই প্রথম মহিলা যিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে এম.এ ক্লাসে পড়ার সুযোগ পান। ১৯৩০-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এম.এ পাশ করেন। স্কুলের পড়ার সময়ই স্বদেশী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯২১-এ গান্ধীজীকে পত্র লেখেন। সে চিঠির উত্তরও পেয়েছিলেন।

ভ্রাতা সত্যব্রতের মাধ্যমে বরিশালের তরুণ সংঘের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে কাজ করতেন। ছাত্রী ও তরুণীদের নিয়ে 'শক্তি বাহিনী' নামে সংগঠন গড়ে তোলেন। বাড়ীর লোকের অগোচরে গুপ্ত বিপ্লবী কর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। লীলা নাগের দীপালী সংঘের মুখপাত্র 'জয়শ্রী' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। বিপ্লবাত্মক ভাবধারায় লিখিত তাঁর প্রথম গল্প ভাইফোঁটা ব্রিটিশ রোষে বাজেয়াপ্ত হয়। প্রথম উপন্যাস 'গোলোক ধাঁধা' জয়শ্রীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় উপন্যাস (১৯৩০ সালে) যুগান্তরে প্রকাশিত। তাঁর প্রবন্ধাবলী নিয়ে তাঁর অপর গ্রন্থ—'নারী'। এছাড়া ব্রহ্মবাদী ও মন্দিরায় তিনি নিয়মিত লেখা পাঠাতেন। 'শ্রী পাকিস্থানী' ছদ্মনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখতেন। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থ 'বার সংগ্রামী সতেন্দ্রনাথ সেন' 'জীবনের রঙ্গমঞ্চে'। এছাড়া বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩২ সালে ভিক্‌টোরিয়া ইন্সটিটিউশানে, ১৯৩৮ থেকে ৪২ পর্যন্ত বি.এম কলেজে ১৯৫০-৫১ পর্যন্ত আসানসোলেব মণিমালা গার্লস কলেজে ও ১৯৫১-৭০ পর্যন্ত হুগলী মহিলা কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতা দেশাত্মবোধক ও বীরত্বব্যঞ্জক।

(গ) আলোচনা

মহিলা কবিদের প্রতিভা ও কাব্যকৃতীর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা উচিত যে তাঁদের প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই। যদিও তৎকালীন শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী তাঁদের কাব্য-বিষয় নির্ধারিত হয়েছিল। বিগত অর্ধশতাব্দীর মহিলা কাব্য প্রণেতাদের প্রসঙ্গে একথা খুব স্পষ্ট করে বলা যায় যে-ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও অভিজ্ঞতা তাদের কাব্যবিষয়ের আধার বলে নির্বাচিত হয়েছিল। অধিকাংশ মহিলা কবিরা স্বামীর মৃত্যুর পর কাব্য রচনা শুরু করেন। তাই প্রিয়-বিরহ তাঁদের কাব্যের অন্যতম উপজীব্য বিষয় হয়েছে। নারীজীবনের চির আকাঙ্ক্ষিত বিষয় গার্হস্থ্য জীবন বা সুখী গৃহকোণ। বর্হিজগতের ঘাত-প্রতিঘাত ও অসম পরিবেশ অপেক্ষা নারী তার শান্ত নিরুপদ্রব গৃহকোণটিকেই পছন্দ করে। তাই গিরীন্দ্র মোহিনী দাসীর অধিকাংশ কবিতাতেই গার্হস্থ্যজীবন তথা মাতৃত্বের চিত্রটি বড়ো অন্তরঙ্গরূপে পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথা যেহেতু কাব্যের বিষয়, তাই মহিলা কবিদের কবি চেতনায় ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্নভাবে মানকুমারী বসু ও প্রিয়ম্বদা দেবীর কবিতায় একান্ত ব্যক্তিগত বিষাদ ও বেদনার পরিচয় পাওয়া যায়। এরই সঙ্গে সুকোমল শান্ত এক অপরূপ সৌন্দর্য্যবোধ মিশ্রিত হয়ে এক বিশেষ ভাবমূর্ত্তির সৃষ্টি করেছে। সরল সুরে গ্রাম্য মেঠোপথে ধ্বনিত রাখাল বালকের গানের মত এঁদের কবিতা সহজ অথচ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু তবুও এদের কবিতাকে একান্ত ব্যক্তিগত বলা যাবে না। নিজ নিজ কল্পনার বৈচিত্র্যে

অনুভূতির প্রগাঢ়তায় ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যঞ্জনায় এগুলি ব্যক্তিগত স্তর থেকে উন্নীত হয়ে রোমান্টিক গীতি কবিতায় পরিণত হয়েছে, লাভ করেছে সর্বজনীনতা।

জীবন-বিশ্লেষণ মূলক রচনায়ও এই মহিলা কবিরা ব্যতিক্রমী চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। সমাজজীবনের নানা অসঙ্গতি, অনাচার ও ত্রুটি এঁদের রচনার উপাদান বলে লক্ষিত হয়েছে। তাই সাহিত্যকে যে যুগ যুগ ধরে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সমাজের দর্পণ', তা যেন এঁদের রচনায় প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের চারপাশে অতি পরিচিত সমাজগণ্ডীর মাঝে যে মানুষগুলি কলকোলাহলে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে তুলেছে, তাদের সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, ঈর্ষা-সঙ্কীর্ণতা —নিত্য উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে। এঁদের রচনা তাকেই প্রকাশ করেছে নবরূপে। এ সাহিত্য পুরুষের চোখে দেখা নারীর জগৎ নয়। নারীর চোখে দেখা সামাজিক রীতিনীতিআর ন্যায়-অন্যায়ের প্রতিফলন। তাই প্রসন্নময়ী দেবীর কাব্য রচনায় গার্হস্থ্য জীবন থাকলেও গদ্যাংশে সমাজ—বিশ্লেষণমূলক রচনার আধিক্য দেখা যায়। সে কাবণেই জীবনীমূলক রচনা হলেও সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 'পূর্বকথা' গ্রন্থটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। মহিলা কবিদের সাহিত্ত-বিষয়ে জাতীয়তাবাদ ও নীতিবোধ ও দেশাত্মবোধের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পরাধীন ভারতবর্ষের হতাশা ও হাহাকার নারী কবিদেরও প্রভাবিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বা শরৎচন্দ্রের 'পথেব দাবী' লেখার বহু পূর্বেই মানকুমারী বসু ও কামিনী রায়েব কবিতাগুলিতে জাতীয়তাবোধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শুধু পরাধীন ভারতবর্ষের উৎপীড়িত সমাজজীবনরই এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল না। ভবিষ্যতের এক বলিষ্ঠ জীবনের দিকেও এই কবিরা যেন নির্দ্ধিধায় অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কামিনী রায়ের দেশাত্মবোধক কবিতা ও কুসুমকুমারী দাসীর নীতি-কবিতাগুলি এই ধারণাটাই প্রমাণ করে দেয়। সরলা দেবী চৌধুরাণীর 'দেশাত্মিকা' ও শান্তিসুধা ঘোষের গল্প-কবিতাগুলি সে যুগের বহু স্বাধীনতা যোদ্ধার হৃদয়ের মর্মমূলে অমোঘ প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। শুধু তাই নয়, জনশিক্ষার বাহন হিসেবেও এই রচনাগুলি সার্থকতা লাভ করেছে।

পূর্ববর্তী অনেক রচনারই উপাদন হল প্রিয়জন বিয়োগব্যথা এবং জাতীয়তাবোধ। কিন্তু জীবনদর্শনের দিক থেকেও এই লেখাগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। তাই নগেন্দ্রবালা মুস্তাফীর হাতে কাব্যবিষয় হয়ে উঠল জীবন্ত। গৃহকোণ থেকে মুক্ত হয়ে একই নারী কখনও প্রেয়সী কখনও শ্রেয়সী কখন বা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীতে পরিণত হল। এক বিশেষ দার্শনিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহিলা কবিদের গীতিকবিতাগুলি যেন নতুনভাবে নতুন করে দার্শনিক তত্ত্বের জন্ম দিল।

এসব ছাড়াও, কোন কোন মহিলা কবি ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার ধারক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যতিক্রমী হওয়া ব্যক্তিত্ব মৃণালিনী সেন ইংলণ্ড ও ভারতে ভোটাধিকার আন্দলোনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নারী কবিদের মধ্যে এটি একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

পরবর্তীকালে মহিলা কবিদের মধ্যে যে নাবীবাদী চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায়, মৃণালিনী সেন তারই সূচনা করেন। শুধু ব্যক্তিজীবনে নয়, সামাজিক জীবনেও যে অনাচার ও বৈষম্যের শিকাব নারীরা হন, তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য যে ধরণের আইনী ও সামাজিক রক্ষাকবচ প্রযোজন হয় তার পদধ্বনি এ সমস্ত রচনাব মধ্যেই প্রথম পরিলক্ষিত হয়। তাই এ কথা বলা যায় যে, গীতি কবি হিসেবে মহিলা কবিরা সাহিত্যে আবির্ভূত হলেও তাদেব মধ্যে ব্যতিক্রমী চরিত্রের যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য আলোচনায ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আধুনিকতার ক্ষেত্রে এই সব মহিলা কবিদের অবদান অস্বীকাব কবা যায় না।

সমগ্র আলোচনার পবিপ্রেক্ষিতে রাধাবাণী দেবীব সাহিত্য রচনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিষয় অনুযায়ী বৈশিষ্ট্য নির্ণয করা চলে। এক্ষেত্রে মনে হয় সমসাময়িক অন্য লেখকদের আলোচনা ও সহিত্যিক পরিবেশ আলোচনা করা প্রয়োজন।

বাধাবাণী দেবীর প্রথম কবিতার বই 'লীলা-কমল' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। সেই সময়টা ছিল বাংলা গীতি কবিতাব যুগ। বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতাব যুগ তো শুরু হয চর্যাপদ থেকেই। 'চর্যাগীতিকোষ' থেকে শুরু করে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন'—এই পর্বে গীতিকবিতাবই প্রচুর নির্দশন পাই। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ সেখানে প্রাধান্য পাওয়ায়, কবি প্রাণের মন্ময়তাকে আবিষ্কার করা সহজ হয় না। অষ্টাদশ শতকে শাক্ত পদাবীলতে অবশ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে কবি-চেতনার ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া যায়। তবুও সেগুলোকে একান্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত গীতি-কবিতা বলা যায় না। এরপবে বাংলা সাহিত্যে কবিওযালার যুগ শুরু হয। এখানেও কবিমনেব ইঙ্গিত আছে, কিন্তু প্রকাশ নেই। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্রতে কাব্যিক গুণের তুলনায হাস্যরসের প্রাধান্য অধিক পবিলক্ষিত হয়। ১৮৬২ সালেই মধুসূদনের হাতে আধুনিক গীতি-কবিতার প্রথম সূচনা। তাঁব 'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমিব প্রতি' কবিতা দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এর পরেই সাহিত্যেব ইতিহাসে শুরু হয আধুনিক যুগের মহাকাব্য, আখ্যান কাব্য রচনার ধারা। কিন্তু আন্তর প্রবণতায় এই ১৮৬২ সালেই গীতি কবিতার যাত্রা শুরু। আর তার ধাবা আজও বর্তমান। ববীন্দ্রনাথ সাহিত্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে গীতিকবিতার একটি নতুন ধারার শুরু হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে গীতি-কবিতার মুক্তি ধ্বনিত হয় ওয়ার্ডসওযার্থ ও কোলবিজের 'লিরিকাল ব্যালাডস' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে (১৭৯৮) এবং এই জোয়ার চলে ১৭৯৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত। অর্থাৎ ইংরেজী সাহিত্যে ক্লাসিক যুগের পর রোমান্টিক গীতিকবিতার যুগ শুরু হয়।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে একই সঙ্গে ক্লাসিক মহাকাব্য, রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য ও রোমান্টিক গীতিক্যব্যের ধারা বর্তমান। অর্থাৎ ক্লাসিক মহাকাব্য এবং রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্য যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা ও মানস' (১৮৫৬), মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' (১৮৬১), হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫), অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪), বিহারীলালের

'সংগীত শতক' (১৮৬২), 'সাবদা মঙ্গল' (১২৮৬) ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ একই সঙ্গে প্রকাশিত হল। কিন্তু যুগের দাবীতে যাদের সৃষ্টি, ক্রমেই তারা নিজেরাই নিজেদের সমাপ্তি ঘোষণা করল। অন্তরের স্বাভাবিক প্রবণতায় যার দাবী, বেশি সেই গীতি-কবিতাই জয়ী হল। যাই হোক উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রবহমান প্রচ্ছন্ন ধারার মুক্তির বাণী ঘোষণা করলেন বিহারীলাল। তাঁকে সহযোগিত্ব করলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও অক্ষয় কুমার বড়াল। এঁরা ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করলেন। এঁদের কাব্য রচনার উপাদান ছিল নারী-প্রেম ও স্বদেশ-প্রেম। বলা বাহুল্য ইংরাজী রোমান্টিক গীতিকাব্যের ধারা এই ধারাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ধারায় প্রথমে যার নাম স্মরণীয় তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তী। মহাকাব্যের রণদুন্দুভির যুগে ইনিই প্রথম সর্বাত্মক ভাবে আকৃষ্ট হয়ে কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা করেন। ভাবরস নিমগ্ন আত্ম চেতনায় অন্তর্লীন কবির নীরব পরিচয়ের মধ্যেই গড়ে উঠল নিজস্ব একটি কবিগোষ্ঠী, যাঁরা পরবর্তীকালে পাঠক হৃদয়ে সগর্বে তাঁদের দাবীকে সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত করে গেলেন। পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার (১৮৩০-১৮৭৮) মূলতঃ আখ্যান কবিতা রচয়িতা। তাঁর 'সবিতা-সুদর্শন' (১৮৭০) ও 'ফুল্লরা' (১৮৭০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'মহিলা' কাব্যে যথার্থ গীতিকবিতার প্রতিভাটি ফুটে উঠেছে। বঙ্গসুন্দরীর আদর্শে তিনি নারীর জননী, জায়া, ভগিনী ও দুহিতা এই চার মূর্তি সম্পর্কে কাব্য রচনায় প্রয়াসী হন। কিন্তু জননী ও জায়া মূর্তি রচনার পর কবি লোকান্তরিত হন। এই অসমাপ্ত রচনাতেও ছন্দের স্থির মন্থরতায় কল্পনার প্রগাঢ়তায় ও স্নিগ্ধ বাকরীতিতে যে গৃহচারিণীর মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের অভিভূত করে।

বিহারীলালকে গুরুপদে বরণ করে অক্ষয় কুমার বড়াল কাব্য জগতে আর্বিভূত হন। (১৮৬০-১৯১৯) এঁর লেখা 'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৭৫) এবং 'ভুল' (১৮৮৭) তিনখানি গীতিকাব্যেই তাঁর প্রেমিক ভাবটি ধরা পড়েছে। তার পর থেকেই কবি-চেতনায় দেখা দেয় ভাগবত উপলব্ধি। যার ফলস্বরূপ তাঁর শোককাব্য 'এষা' (১৯১২) বাংলা সাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন। পত্নী শোকগ্রস্ত কবির কাব্যের পূর্ণতা রূপ পেয়েছে এই কাব্যে। এই শোক শেষ পর্যন্ত আত্মনিবেদনে সমাপ্তি লাভ করেছে। রচনার দিক থেকে এই কাব্যের ততটা উজ্জ্বল স্বীকৃতি নেই। তবুও রবীন্দ্র সমকালে গীতিকবি হিসাবে তিনি স্মরণীয় সমকালে এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালে যে সমস্ত রোমান্টিক কবি বাংলা গীতিকাব্যের ধারাকে প্রবহমান রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয় কুমার বড়াল, দেবেন্দ্র নাথ সেন, গোবিন্দ্র চন্দ্র দাস, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব কবিদের কাব্য রচনায় চিরাচরিত নারী-প্রেম ও স্বদেশ-প্রেমের বিষয়টি নতুন আঙ্গিকে ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশিত। বিশেষ করে দেবেন্দ্র নাথ সেন ও গোবিন্দ চন্দ্র দাসের ভাবালুতা ও ছন্দনির্মাণের কৌশল বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা সনেট রচনার ক্ষেত্রে এই কবিগোষ্ঠীর অবদান বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত। যদিও কাব্যধর্মিতা এই সব কবিদের কাব্য রচনার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য আনতে পারেনি, তথাপি নব্য রোমান্টিক কাব্য ধারায় এই কবি গোষ্ঠীর ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আধুনিক কাব্যরীতির নানাভঙ্গীর সঙ্গেই এদের পরিচয় ঘটে। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, আবেগ, সারল্য ও উদ্দীপনার কাব্যস্বাদ এই যুগের কাব্যগুলির অন্যতম লক্ষণ।

শুধু চমৎকারিত্ব সৃষ্টিই নয়, শব্দ ব্যবহারেব প্রতি ও এই কবিদের মনোযোগ অক্ষুন্ন ছিল। ইন্দ্রিয়-সংবেদন ধর্মিতাও উপেক্ষিতহয়নি। এই পর্বেই কাব্যের রূপরীতির সৌন্দর্যের সঙ্গে হৃদয়েব আবেদনেব পথটিও উন্মুক্ত হয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি ও আবেগের স্পর্শে এই পর্বের কাব্যগুলি অভাবিত শোভা বর্দ্ধন করেছে। তাই আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে ববীন্দ্র-পূর্ব যুগেব বা রবীন্দ্র অনুসারী কবিদের ভূমিকা অস্বীকাব করা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী: তৃতীয় অধ্যায়

১. বঙ্গের মহিলা কবি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
২. স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী — বসুমতী সাহিত্য মন্দির
৩. স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী -- সম্পাদনা: বাণী রায়
৪. নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য — ড. জ্ঞানেশ মৈত্র
৫. নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী — গোলাম মোরশেদ
৬. নির্বাচিত প্রবন্ধ: উজ্জ্বল কুমার মজুমদার
৭. বাংলা সাহিত্য : একাল-সেকাল: শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৮. বাংলার পুরনারী: দীনেশ চন্দ্র সেন
৯. বঙ্গরমণীর বিস্মৃত ইতিহাস — নির্মলেন্দু চৌধুরী
১০. বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাশৈলী — মঞ্জুলা বেরা
১১. উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা — ওয়াকিল আহ্‌মেদ

প্রসঙ্গসূত্র: তৃতীয় অধ্যায়

১.	'সরসী-জলে শশী'	—	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
২.	'শ্রাবণ মাস'	—	স্বর্ণকুমারী দেবী
৩.	'শিশুর চরণ'	—	প্রসন্নময়ী দেবী (ভারতী: ১৩২৩ আশ্বিন)
৪.	'পূর্বকথা'	—	প্রসন্নময়ী দেবী (আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশ: ১৯১৭)
৫.	'প্রতিধ্বনি'	—	২-ভাদ্র-১৩০০
৬.	'যোগিনী'	—	কণকাঞ্জলি: মানকুমারী বসু
৭.	'মা আমার'	—	আলোছায়া: কামিনী রায়
৮.	বর্ষারম্ভে প্রকৃতির প্রতি	—	'বেণু' (১৯০৭): প্রিয়ম্বদা দেবী
৯.	'দেশাত্মিকা'	—	শতগান: সরলা দেবী
১০.	'শ্মশান'	—	নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী
১১.	'আদর্শ ছেলে'	—	মুকুল: কুসুমকুমারী দাশ

চতুর্থ অধ্যায়
রচনার শ্রেণীবিভাগ

(ক) 'সনেট' এবং কবিতা সমূহ

সনেট আধুনিক পৃথিবীর কাব্যলোকে ইতালীর অনবদ্য উপহার। সনেট শব্দটির উদ্ভব হয়েছে ইতালীর সনেত্তো (sonetto) শব্দ থেকে। সনেট হল বিশিষ্ট মেল বন্ধনে গঠিত চতুর্দশপদের কবিতা। শুধু কবিতা বললে সনেটের বৈশিষ্ট্য পরিস্কার হয় না। বরং একে গীতিকবিতা বললে অত্যুক্তি হয় না। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীতে সনেট রচনা প্রথম শুরু হয়। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি ইতালীর বিখ্যাত কবি পেত্রার্ক সনেটের প্রথম সার্থক রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধ। সনেট রচনার রীতি ইতালী থেকে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। রেনেসাঁসের অন্যতম প্রবক্তা পেত্রার্কের জীবন-সাধনায় পৃথিবীতে মানবতাবাদের আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে ওঠে সনেট। নবজন্মের প্রাণপুরুষ পেত্রার্কের কণ্ঠে মানবজীবনের গান যে কলাকৃতি পেয়েছে তাই হয়েছে নতুন দিনের ভাবপ্রকাশের নতুন বাহন এবং সেই কারণেই সনেট হয়ে উঠেছে আধুনিক কবিতার একটি সার্থক শিল্পরূপ। পেত্রার্কের সনেটের পঙ্‌ক্তি চতুর্দশ। এই পংক্তি চতুর্দশ আবার অষ্টক ও ষটক — দুই ভাগে বিভক্ত। বস্তুত অষ্টমবন্ধের সুপরিকল্পিত সংবৃত মিলবন্ধনে সনেট ভাবকে বিন্যস্ত করে; আবর্তন সন্ধিতে ভারসাম্য গড়ে তোলে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সনেট রচনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দরীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ফরাসী সনেটের চরণ বারো ও ইংরেজী সনেটের দশ। বাংলা ভাষায় চৌদ্দ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দই সনেট রচনার সবচেয়ে উপযোগী বলে স্বীকৃত। সনেটের প্রতিটি অংশের গুরুত্ব সমান। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পদ এবং প্রতিটি মিলের মধ্যে সনেটের সুঠাম সৌন্দর্য্য গড়ে ওঠে। একটি মূলভাবকে কেন্দ্র করেই সনেট লিখিত হয়।

এলিজাবেথীয় যুগে ইংরেজী সাহিত্যে সনেট রচনার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কবি ওয়াট এবং সারে সর্বপ্রথম সনেট রচনা শুরু করেন। পরে মহাকবি শেক্‌সপীয়র

সনেটের গঠনে বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন। ইংরেজি সাহিত্যের উৎকৃষ্ট সনেট রচয়িতা হিসাবে মিলটন, কীটস্‌, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সুইনবার্ণ এবং রসেটির নাম প্রসিদ্ধ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম কবি মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় আধুনিক গীতিকবিতার জনক। গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্যে সনেট প্রবর্তন করেন। মধুসূদন সনেটের নামকরণ করেন চতুর্দশপদী কবিতা। বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট মধুসূদনের 'কবি মাতৃভাষা'। এখানে তিনি পেত্রার্কের কাব্যরীতিকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর অধিকাংশ সনেটের মধ্যে পেত্রার্কের সনেটের অষ্টম-ষটকের পর্ববিভাগ লক্ষ্য করা যায়।

মধুসূদন পরবর্তী সনেট-শিল্পীদের মধ্যে নব্য রোমান্টিক পর্বের দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দ্রচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল ও কামিনী রায় অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথেব প্রায় সমস্ত সনেটই স্বয়ংসম্পুর্ণ কবিতা। তাঁর সনেটের মুখ্য বিষয় প্রেম। সনেট কলাকৃতির বিভিন্ন রীতি সর্ম্পকে কবি যে অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত সনেট গুচ্ছ। এর অধিকাংশ সনেট চতুদর্শমাত্রিক, অষ্টম ও ষটক ছেদহীন। 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অনেক সনেট সমিল পয়ার। এটিও সনেটের ক্ষেত্রে একটি নতুন আঙ্গিক।

পরবর্তী সনেট-কবিদের মধ্যে রজনীকান্ত সেন, প্রমথ চৌধুরী, সতেন্দ্র্যনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও জীবনানন্দ দাশের নাম করা যায়।

নব্য রোমান্টিক পর্বের মহিলা সনেটকার হিসেবে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, মৃণালিনী দেবী, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, প্রিয়ম্বদা দেবী অন্যতম।

এঁরা প্রায় সকলেই শেক্‌সপীয়রিয় রীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। এঁদের সনেট মূলতঃ ৪৪৪৬ রীতিতে মিত্রাক্ষর ও স্তবকবন্ধে গঠিত।

কবিতা

১) লীলাকমল (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ: ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ)

লীলাকমল কাব্যগ্রন্থ রাধারাণী দেবীর লেখা প্রথম কাব্য। * যদিও এর পূর্বে তিনি নরেন্দ্রদেবের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'কাব্যদীপালি' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন 'লীলাকমলের' মাধ্যমে। 'লীলাকমল' মূলতঃ রোমান্টিক কাব্য। মানবজীবনের তথা নারী-জীবনের চিরন্তন প্রেমতৃষ্ণা ও মধুর ভাবের প্রকাশ এই কাব্যে ঘটেছে। এই কাব্যেই আধুনিক গীতিকবিতার মৌলিক সুরটি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবিচিত্তের আত্ম-উন্মোচন হল — বর্হিজগতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার

করে, কবির মানসজগতে বিচরণ করা। এই অন্তর্মুখীনতাই 'লীলাকমল'-এর মূলকথা। কিন্তু এই আত্ম-মগ্নতা বা ভাবতন্ময়তা বাস্তববাদকে উপেক্ষা করেনি। নারীহৃদয়ের তৃষাতুর ভাবের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও বেদনাও মূর্ত হয়ে উঠেছে। দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে রোমান্টিক রহস্যের আলোছায়ায় 'লীলাকমল' মানবজীবনের অনন্ত লীলার প্রতীক, যে লীলার পাপড়িগুলি শতদলের মত সজীব ও সরস।

জাগিলো যৌবন-পদ্ম। ফুটিল সহস্র-দল-কারা।
ফুটিল গো ফুল।
আপন - অন্তর - গন্ধে আপনা-বিস্মৃত আত্মহারা
— বিহুল-ব্যাকুল।
উচ্ছ্বসিত প্রাণরসে দেহে-মনে স্বপ্নাবেশ লাগে,
নয়নে লাবণ্য, চ্ছুরে অধরে অতৃপ্ত - তৃষা জাগে,
আনন্দ-চঞ্চল চিত্ত বসন্তের বর্ণ-গন্ধ রাগে
দীপ্ত ঝলমল;
জীবনের অন্ধ-বীজ অঙ্কুরের পরিণতি মাগে —
আলোকে উজ্জ্বল।।"৬
—(বিকাশ: লীলাকমল·পৃঃ — ৬৭)

"সুদৃঢ় পাষাণে গড়া লৌহদ্বার মর্মপুরে
নিঃশব্দে অকলি যায় ছুটি, —
কঠিন প্রাচীর-শ্রেণী মৃদুল-মোহিনী সুরে
পুষ্পসম পড়ে টুটি টুটি,!
সেদিন স্বেচ্ছায় নারী সর্বাঙ্গীন-অধীনতা
লহে বরি সঁপি, তনু-প্রাণ,
চিত্তের আনন্দরাগে দীপ্ত হ'য়ে সে - দীনতা
রাণীর গৌরব করে দান।
(নারী ও প্রেম: লীলাকমল, পৃঃ — ৬৮)

সীঁথি-মৌর (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ: ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ)

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে রাধারাণী দেবী সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা সনেট-কবি হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর 'সিঁথিমৌর' সনেটগুচ্ছ সনেটের মধ্যে অন্যতম বলে পরিগণিত হয়েছে।

"সীঁথি-মৌর" গ্রন্থটিরপ্রথম প্রকাশকাল ১৯৩২। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে দেখতে পাই :

কবিভগিনী স্বর্গীয়া এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং—
তুমি জ্বেলে গেছো জীবন-তীর্থে

চির-অমলিন-প্রণয় আলো;
প্রেম সোহাগিনি! এ সীঁথি-মৌর
তব সীমন্তে শোভিবে ভালো।[১] —রাধারাণী।"

আমরা জানি কবিদম্পতি নরেন্দ্র দেব-রাধারাণী দেবীর বিবাহের কথা। বালবিধবা রাধারাণীর প্রথম বিবাহ এবং বিবাহের মাত্র তিনমাসের মধ্যে তাঁর সেই স্বামীর মৃত্যুর কথাও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। গোটা পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রেখে এবং "কবিভগিনী" এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং কে রাধারাণীর এই কাব্যোৎসর্গকে স্মরণ করে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন :

> *বাংলার সহৃদয় কাব্যরসিক-সমাজ দেবদম্পতিকে 'বাংলার ব্রাউনিং দম্পতি' বলে সম্মানিত করেছেন। ইংরেজ-সমাজে ব্রাউনিঙ-দম্পতির প্রেমনিষ্ঠা সকলের শ্রদ্ধার বস্তু। বাংলার কবি-দম্পতিও তাঁদের চারুশীলিত জীবনচর্যায় বিদগ্ধ রসিক-সমাজের ভালোবাসা অর্জন করেছেন। তা ছাড়া রবার্ট ব্রাউনিঙ্ (১৮১২-১৮৮৯) এবং এলিজাবেথ ব্যারেটের (১৮০৬-১৮৬১) সঙ্গে বাংলার কবি-দম্পতির জীবনের যেন আরো কিছু সাদৃশ্য আছে। এলিজাবেথ ব্যারেট অবশ্য রবার্ট থেকে বয়সে ছ'বছরের বড়ো ছিলেন। সেক্ষেত্রে রাধারাণী নরেন্দ্র দেবের পনেরো বছরের ছোটো। উভয় ক্ষেত্রেই হৃদয়ের আকর্ষণ গড়ে উঠেছে সাহিত্য-জীবনের সমপ্রাণতা থেকে। রবার্ট তেত্রিশ বছর বয়সে ইতালি থেকে প্রত্যাবর্তনরে পর এলিজাবেথের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৪৫ সালের একুশে মে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব প্রেমে পরিণত হয়।*
>
> *রবার্ট ও এলিজাবেথের এই প্রেমকে 'one of the most romantic of literary love stories,' বলা হয়ে থাকে। এলিজাবেথ বয়সে শুধু ব্রাউনিঙের থেকে বড়োই ছিলেন না, ছেলেবেলায় মেরুদণ্ডে আঘাত লাগায় তিনি চলবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং সারাজীবন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়েই কাটাচ্ছিলেন। তাঁর গতিবিধি বিছানা থেকে সোফার মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ ছিল। এই শারীরিক অক্ষমতা নিয়েই এলিজাবেথ কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। রবার্ট তাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎতেই তাঁকে ভালোবেসে ফেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এলিজাবেথের পিতার কাছে তাঁর কন্যার পাণি প্রার্থনা করনে। পিতা এডওর্য়াড ছিলেন অত্যন্ত একগুঁয়ে জেদি পুরুষ। তাঁর ইচ্ছা ছিল, পঙ্গু এলিজাবেথ আজীবন কুমারীই থাকেন। কাজেই তিনি বিবাহের প্রস্তাবে বিরক্ত হলেন। তাঁর সম্মতি পাওয়া গেল না। এলিজাবেথ রবার্টকে গভীরভাবেই ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর অনুরাগ গোপন করেই রাখতেন। অবশেষে রবার্ট-এর জয় হল। প্রথম সাক্ষাতের ষোলো মাস পরে উভয়ে গোপনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এডওর্য়াড কন্যার এই গোপন বিবাহের কথা কিছুই জানতে পারলেন না।*

বিবাহের এক সপ্তাহ পরে এলিজাবেথ নীরবে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে গেলেন। সে-গৃহে তিনি আর কোনদিনই ফিরে আসেননি। রবার্ট এলিজাবেথকে নিয়ে চলে গেলেন প্রেমের দেশ ইতালিতে। সেখানেই তাঁদের মিলিত জীবনেব আনন্দময় বাকি দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। ইতালির আলো-হাওয়ায় এলিজাবেথ কিন্তু অনেকটা সেরে উঠেছিলেন। দু-বছর পরে পাঁচ মাইল ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে পারতেন। বিবাহের তিন বছর পরে কাবি-দম্পতির একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিবাহের সময় এলিজাবেথের বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁদের দাম্পত্য-জীবন পনেরো বছরের। ১৮৬১ সালে এলিজাবেথ যখন শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তাঁর বয়স ছাপান্ন, রবার্ট সবে পঞ্চাশে পড়েছেন। পত্নীর মৃত্যুর পরে তিনি ইতালি পরিত্যাগ করে ব্রিটেনে ফিরে আসেন। জীবনের বাকি আঠাশ বছর বিপত্নীক কবি প্রিয়তমা পত্নীর প্রেমের স্মৃতিকেই অন্তরে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। প্রেমের কবি হিসাবে ব্রাউনিং ইংরেজী সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

পঙ্গু এলিজাবেথ যেমন রবার্টের প্রেমের স্পর্শে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছিলেন, রাধারাণী দেবীও তেমনি প্রেমের স্পর্শে শুধু দুরারোগ্য হাঁপানির প্রকোপ থেকেই নিষ্কৃতি পাননি, অভিশপ্ত জীবনের বন্দীদশা থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন। প্রেমই 'লীলাকমল'-এর কবির জন্ম দিয়েছে।[২]

'সিঁথিমৌরের' ৩৪টি সনেটের মধ্যে ৩১টি ১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এই গ্রন্থেব 'উৎসর্গ' কবিতা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। সিঁথিমৌরের ১২টি সনেট 'শেক্‌সপীয়রি' রীতিতে রচিত। সনেটের স্তবকবিন্যাসে তাঁর বিচিত্রমুখী পরীক্ষা লক্ষণীয়। ৩২টি সনেটে তিনি প্রায় ১১ প্রকার স্তবক বিন্যাস করেছেন। এর মধ্যে পেত্রার্কীয় রীতির ৮ক্ক৬, তথাকথিত ফরাসী রীতির ৪ক্ক৪ক্ক২ক্ক৪, ৮ক্ক২ক্ক৪ ও শেক্‌সপীয়রি ৪ক্ক৪ক্ক৪ক্ক২, ৮ক্ক৪ক্ক২ স্তবক। এর মধ্যে স্তবক সজ্জায় রয়েছে ৫টি সনেটই। তাছাড়া ৪ক্ক১০, ৪ক্ক৮ক্ক২, ১২ক্ক২, ৪ক্ক৪ক্ক৬, ৪.৫ক্ক৫ক্ক৪.৫ স্তবক সজ্জায় বিচিত্র পরীক্ষা তিনি করেছেন। তাঁর পেত্রার্কীয় মিলে রচিত সনেট সংখ্যা ১৩টি। ১২টির অষ্টক সংস্কৃত মিলের, একটি মাত্র ক্ষেত্রে আছে বিবৃত মিলের অষ্টক।

সিঁথিমৌরের শেক্‌সপীয়র অনুসৃত একটি সনেট এখানে দেওয়া হল — সনেটটি ৪ক্ক৪ক্ক২ক্ক৪ রীতি অনুসরণে রচিত:

যত দুঃখ যত ব্যথা আসুক জীবনে
সত্যে মোর শ্রদ্ধা রবে অটুট অম্লান।
অন্যায়ে না মানি পেনু যত অপমান
সম্মানেরো চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ মানি মনে।

আনন্দে স্পন্দিত প্রাণে কল্পনা নন্দনে,
পেয়েছি মানস-স্বর্গে অমৃত-সন্ধান।
উপেক্ষাব উগ্র কশা শ্লেষ তীক্ষ্ণ বাণ ,
নিষ্ফল আক্রোশে গর্জে ব্যর্থ আস্ফালনে।

বাহিরের যত দুঃখ আসে রুক্ষ বেশে
অন্তরে আনন্দলক্ষ্মী ওঠে স্নিগ্ধ হেসে।

মিথ্যারে মানিনি আমি কোনো প্রলোভনে
ছলনার ছদ্মরূপে চাহিনি সম্মান।
শ্রেয়ঃ যাহ বুঝিয়াছি আপনার মনে
নির্ভয়ে নিয়েছি তুলি নিষিদ্ধ সে দান।।"[৩]

—(সিঁথিমৌর — ৪ নং সনেট)

চৌত্রিশটি সনেটে গ্রথিত "সিঁথি-মৌর" সম্বন্ধে 'বিচিত্রায়' (বৈশাখ ১৩৪০) প্রকাশিত সমালোচনাটি এই রকম:

... বইখানি যে উপযোগিতায় বিবাহরাত্রেব উপহাবের অপর সকল বইকে পরাস্ত করেছে, তা অসংশয়ে বলা যায়।
... ভিতরে যখন প্রবেশ কবি তখন আটটি সনেটের অনাবিল মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে যাই।...[৪]

এর পর সমালোচক আশা প্রকাশ করেছেন :

এই ৩৪টি কাব্যকুসুমের সৌরভে ও সৌন্দর্যে কাব্যরসিকের চিত্ত সরস হবে। ...

এই প্রসঙ্গে 'উত্তরা' সাময়িক পত্রের ১৩৪০ আষাঢ়সংখ্যায় শ্রী ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি লেখার উল্লেখ করা যায়। পত্রাকারে রচিত দীর্ঘায়তন লেখাটির কিয়দংশ :

তুমি আমাকে রাধারাণী দেবীর সিঁথিমৌর দিলে কেন? আমার কবিতা বুঝতে দেরী লাগে, তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে ভয় হয়। আমার বিশ্বাস কবিতা বোঝা এবং বুঝে সমালোচনা করার মতন কঠিন কাজ আর দুটি নেই। আমরা বিংশ শতাব্দীর লোক, পদ্যকে ধীরে ধীরে, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার মতো সাধনা আমাদের নেই, সময় নেই, প্রবৃত্তি নেই। নেহাৎই রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন, তাই কখনও কখনও ভুলে যাই যে বিংশ শতাব্দীর সময় ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ধেয়ে চলে। তাঁর কবিতায় যন্ত্র-যুগের গতিশীলতা নিরুদ্ধ। বিরামের

ভোগ তিনই বণ্টন করেন। সেই ভোগের নেশায় ও আশায় অন্য কবির লেখা পড়ি। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর লেখাও পড়েছি, ভালও লেগেছে, তোমাকে বলেওছি। তুমি যদি তাই স্মরণ করে তাঁর এই সনেটগুলি আমাকে পড়তে দিয়ে থাক তাহলে তোমাকে দোষ দিই না। কিন্তু না দিলেই ভালো করতে। আমি এক ঘণ্টায় বইখানি শেষ করলাম। মনে আমার কোন দাগ পড়ল না। এমন কি বই এর ঐ রকম বহুমূল্য মলাট ও ছাপাটাও না। কি মনে পড়ল জান? যেন বিবাহ বাসরে সালঙ্কৃতা কন্যা সম্প্রদানের জন্য সজ্জিতা হয়ে আড়ষ্টভাবে বসে আছেন। বিবাহ-অনুষ্ঠানটি উচ্চাঙ্গের, সজ্জাও তাই। অবশ্য সাজটি বেনারসী চেলীর নয়, বাংলা দেশেরই কারুশিল্প-খচিত, তবু যেন কোথায় পিত্রালয়ের আটপৌরে শাড়ীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অনটন রয়ে গিয়েছে। আদত ব্যাপার কি জান? কোন বিশেষ ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখব মনে করে সত্যিকারের কবিতা লেখা যায় না। দু একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি হয়ত পেরেছেন, কিন্তু সাধারণ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পারেন না। রাজ দরবারের জন্য কিংবা প্রীতি-উপহারের জন্য লেখা ক'টি ভাল কবিতা পড়েছ? কারণ বোধ হয় এই, সত্তার স্থানটি যখন প্রতীক অধিকার করে, তখন প্রেরণা সৎ হয় না, অসৎ হতে বাধ্য। অসৎ অর্থ আংশিক। প্রেরণার আংশিকতা গেপৈন করতে সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, ভাষার আড়ম্বর বৃদ্ধি পায়। যদি সনেট- রূপটি নির্ব্বাচিত হয়ে থাকে, তাহলে আরো বিপদ: সনেটের লাইন কটিতে অত ভার সয় না। যে সনেট দীর্ঘ কবিতায় উপচে পড় পড় তাকে সনেট বলা যায় না। সনেট একটি সম্পূর্ণ 'চক্র', তাকে gestalt বলতে পার। রাধারাণী দেবীর এই লেখায় অনেক ছেঁড়া সুতো রয়েছে। তাই বলি, এ বই কোন বিশেষ ঘটনার উপযুক্ত হলেও, লেখিকার যোগ্য নয়। এক কথায় 'সিঁথিমৌর' নরেনদার স্ত্রীর লেখা — বৌদির লেখা — রাধারাণী দেবীর লেখা নয়। সনেটের সংযম এ বইটিতে নেই। যদি চিঠির বদলে সমালোচনা করতাম, আর হাতে বিস্তর সময় থাকত, এবং সে সময়ের প্রত্যেক ফাঁকে ভারী জিনিষ দিয়ে ভরে দেবার মতন খেয়াল আমার আসত, তাহলে আশা করি দেখাতে পারতাম অসংযম কোথায় এবং কতটুকু।[৮]

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায

প্রমথ চৌধুরী প্রভাবিত রাধারাণী দেবীর সনেট-গ্রন্থ 'সিঁথি-মৌর':

'লীলাকমল' গ্রন্থাকারে প্রকাশের বছর দুই পরে কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারাণী দেবীর বিবাহ হল। বিবাহের প্রথম বার্ষিকীতে (১৭ জৈষ্ঠ্য ১৩৩৯)— প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিঁথি-মৌর'। গ্রন্থখানি রাধারাণী 'কবিভগিনী স্বর্গীয়া এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ্'-কে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে আছে চৌদ্দ অক্ষর পয়ার-পংক্তির চৌত্রিশটি সনেট। দুই মিলের দুটি সংবৃত অথবা বিবৃত চতুষ্ক দিয়ে গড়া অষ্টকবন্ধের পরে একটি

মিত্রাক্ষর যুগ্মক। তারপর একটি সংবৃত চতুষ্ক। সনেট পঞ্চাশত-এর কবি প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে রাধারাণী দেবীর সান্নিধ্যের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। 'সিঁথি-মৌর' রচনায় তিনি একান্তভাবেই 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-পন্থী। একটি নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রথম সনেট.

প্রাণ তীর্থ-যাত্রী মোরা গৃহ-উদাসীন,
কলঙ্কের কলরোল ধ্বনিছে পশ্চাতে,
স্নেহশূন্য স্বজনের গ্লানির সম্পাতে
আজি মোরা অখ্যাতির গৌরবে বিলীন।

সুন্দবেব শঙ্খধ্বনি শুনেছি যেদিন,—
শৈল শৃঙ্গ টলে যথা তরঙ্গ সংঘাতে, —
সর্ব দ্বিধা বাধা লজ্জা ঠেলি দুই হাতে, - -
সাড়া দিচ্ছি সে আহ্বানে ভয়-কুণ্ঠাহীন।

আনন্দ পাথেয় লয়ে চলিয়াছি পথে,
কামনাব গুরুভার নাহি মনোরথে।

যে দেবতা উর্ধ্বে ডাকে মাটির মানবে,
কেমনে আসন তাঁর পাতি ধুলা পরে?
যে প্রেম সংকীর্ণ প্রাণ দিল মুক্ত করে, —
সে-প্রেম কি মূঢ়তায বন্দী হয়ে রবে?[৭৮]

'সিঁথি-মৌর'-এর কবিতাগুলি অভিধাতেই নিগূঢ় অর্থবহ। কবিব স্বগতভাষণ এখানে যেন স্বতঃস্ফূর্ত। কবিতাগুলি যেন কবিমানসের কড়চা। বিবাহের প্রথম বৎসরেব আনন্দিত দিনরাত্রির সাক্ষী এরা। সেদিন সার্থকতার তীর্থে পৌছবার জন্য যে পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল তার অলিখিত ইতিহাস এই সনেটগুলিতে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে·

কেহ বা শাপিয়া কহে — 'কেন মরিল না?
এত শিক্ষা-দীক্ষা তার এ-ই পরিণাম?'
ওদের ও-সব কথা নির্বিকারে শোনা
একান্ত কঠিন, জানি, — তবু ভাবিতাম —
জীবনে বরিলে ওরা কেন ভয় পায়?
সত্যেরে পূজিলে কেন লজ্জা মানে চিতে?
কাচের পুতুল হয়ে বাঁচিবারে চায়!!
ভুলেছে কি প্রাণধর্ম আছে পৃথিবীতে?[৭৯]

'লীলাকমল'-এর কবি প্রেমের প্রশস্তি রচনা করে বলেছিলেন, 'পুঁথির মানুষ হয়ে রবো বেঁচে আর কতো কাল? এখানে উপমান পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে, 'কাচের পুতুল।' চতুর্দশ

সনেটে কবি বলেছেন, 'দৈত্য-মায়া-দণ্ড-ছোঁয়া দীর্ঘ-সুপ্তি-ঘোর' তাঁকে মৃতপ্রায় করে রেখেছিল — প্রেমের সোনার কাঠির অমৃত-স্পর্শে তিনি সঞ্জীবিত হয়েছেন:

যে ছিল পাতালপুরে চিরিনিদ্রালীনা,
সে আজি আলোকরাজ্যে সিংহাসনাসীনা।

আমরা এলিজাবেথ ব্যারেট প্রসঙ্গে বলেছি, রবার্ট ব্রাউনিঙের প্রেম তাঁর শারীরিক পঙ্গুদশা থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। রাধারাণীর জীবনেও একসঙ্গে এসেছিল মৃত্যু ও প্রেম। ২৪ সংখ্যক সনেটে সে ইতিহাস গ্রথিত হয়ে রয়েছে। অসময়ে অকস্মাৎ তাঁর তনুতীরে মৃত্যুর তরণী এসে ভিড়েছিল। সে দিন নিঃশব্দচরণে প্রেমও এসেছিল তাঁর শিয়রে। কবিতায় ষট্‌কবন্ধে মৃত্যু ও প্রেমের সেই অবিস্মরণীয় সংগ্রাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে:

আমার দক্ষিণ-পাণি তুলে নিল এসে
কালের ভৈরব-দূত; বাম পাণি তুমি —
ললাটে চুম্বন দিলে — দোঁহে ভালোবেসে;
তারপরে... ডুবে গেল বিশ্ব-রঙ্গভূমি।
জাগিয়া চাহিয়া দেখি সে গিয়েছে ফিরে —
মৃত্যুজিৎ প্রেম একা আছে মোরে ঘিরে।[১১]

এই মৃত্যুজিৎ প্রেমই 'সিঁথি-মৌর' কাব্যগ্রন্থের আলম্বন।

২) বনবিহগী (১৩৪০ বঙ্গাব্দ: ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)

এই কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে। উৎসর্গ পত্রে লেখা:

চিরতরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ নিত্যনবীনেষু। রবির আলোকে যে বিহগী পাখা মেলেছে তাকে রবিকরেই সমর্পণ করলাম আপনার স্নিগ্ধ স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে — রাধারাণী [১২]

প্রসঙ্গতঃ অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য 'লীলাকমল' কাব্যগ্রন্থটি সম্বন্ধে যা বলেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য:

রাধারাণী দেবীর মানস-কমল যখন উন্মীলিত হচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় যৌবন। বলাকা-পূরবী-মহুয়ার কবি যৌবনের দীপ্তরাগে জ্বলদর্চি তনুতে উদ্ভাসিত হয়েছেন। কবি রাধারাণী হৈ বলাকা-পূরবী-মহুয়ার কবির কাছে প্রতিবদ্ধচিত্ত। অভিসারিণী নির্ঝরিণীই তাঁর আত্মার প্রতীক। শুদ্ধান্তঃপুরের অবরোধে বন্দিনী নারীসত্তা সারস্বত আকাশে প্রেমে র আলোয় কি করে সমস্ত অবরোধ ভেঙে দিয়ে বন্ধনমুক্তির আনন্দে উদ্বেল হল, তারই ছন্দিত ইতিহাস

'লীলাকমল'-এর প্রতিটি রচনায় উদ্‌গীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের আলো নারীচিত্তের বেদনার মেঘে-মেঘে যে ইন্দ্রধনু-বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়েছে তারই নমুনা হিসাবে 'বিকাশ'-এর তৃতীয় স্তবকটি উদ্ধার করছি :

স্ফুরি সপ্তবর্ণচ্ছটা চিত্তপটে স্বপ্ন-ইন্দ্রধনু
টানে মুগ্ধ-তুলি,
বসন্ত-বল্লরী সম কুসুম -প্লাবনে বর-তনু
উঠিল উচ্ছলি।
নিশার নিকষ-প্রান্তে প্রভাত সঞ্চার সম ধীরে,
অপৰূপ ৰূপ রাগে দেহ মন প্রাণ ঘিরে ঘিরে
রচি ইন্দ্রজাল,
শীর্ষ সিন্ধু-স্রোতস্বিনী ভবা-ভাদ্র-পূর্ণিমাব ক্ষণে
নিমেষে উত্তাল।

এই 'নিমেষে উত্তাল' 'সিন্ধু' স্রোতস্বিনীর দুর্বাব অগ্রগতির ছন্দেই লীলাকমলের কবির হৃদয় উচ্ছ্বসিত।"[১৩]

এবং অধ্যাপক ভট্টাচার্য অতঃপর কবি রাধারাণী দেবীব "লেখনীমুখে নবীন পূর্বরাগের বলিষ্ঠ গীতোচ্ছ্বাসের" উদাহরণসহ সুন্দর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন.

বাধারাণীব জন্ম অগ্রহায়ণের শুক্লা চতুর্দশীতে। 'লীলাকমল'-এব 'কালি শুক্লা বাসন্তিকা বাতে' কবিতায় কবি তাঁর নবজন্মেব কথা শুনিয়েছেন·

কালি শুক্লা-বাসন্তিকা রাতে
বকুল বীথিকাতলে
নব-শ্যাম-দূর্বাদলে
কুসুম ঝরিল মোর মাথে।
চুমিয়া ললাট গ্রীবা ছুঁয়ে কবরীর কালো চুল
ঝরিয়া পড়িল কটি বৃন্তখসা শিথিল-বকুল, —
অসহ-হরষ-রসে শান্ত-তনু তটিনী-দুকূল
প্লাবি এল বান।
বক্ষ-তটে হল শুরু
ঘন-কম্প দুরুদুরু
যৌবনের গান।

কবির জন্মলগ্নে হেমন্তের শুক্লা চতুর্দশী ছিল কুহেলিকাচ্ছন্ন। কবির নবজন্ম শুক্লা বাসন্তীকা রাতে। প্রেমের আলোয় জীবনের কুহেলিকা অপসারিত হয়েছে। সেদিন শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনী বিগতনাথা তরুণীর লেখনীমুখে নবীন পূর্বরাগের বলিষ্ঠ গীতোচ্ছ্বাস বাংলার বিদগ্ধ রসিকসমাজকে বিস্মিত করেছিল।

অচিন্ত্যকুমার কেন বলেছিলেন, 'বিপ্লব তাঁর কবিতায় আভাত হয়েছে'—এ-সব কবিতা পড়লে তার অর্থ বোধগম্য হয়। বস্তুত, এমন কুণ্ঠাহীন আত্মঘোষণা বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বে আর কোনো নারীকণ্ঠে শোনা যায়নি।

দুঃখ-কারা পরিত্যাগ করে আনন্দ-মন্দিরে যাওয়ার আহ্বান এল গোধূলি লগ্নের স্বপ্নে। গোধূলীর রক্তরাগকে প্রিয়তম-প্রেরিত 'সিঁথার সিঁদুর' মনে হল তাঁর। সেই অভিলষিত মিলনের কল্পনায় সমস্ত চেতনা মধুময় হয়ে উঠল। মনে জেগে উঠল 'মিঠা লাজ'! বাঞ্ছিত বল্লভের বন্দনায় কলকণ্ঠী কপোতীর আনন্দ-কূজনে রুদ্ধগৃহ মুখরিত হল:

ওগো দূর-প্রিয়তম!
গোধুলির গায়ে দেছ কি পাঠায়ে সিঁথার সিঁদুর মম?
এতদিন পরে ক্ষণিকের তরে মোরে কি স্মরেছ বঁধু?
তাই সারা প্রাণ গেয়ে ওঠে গান মধু—মধু—সবি মধু।[১৪]

রাধারাণী দেবীর তৃতীয় কাব্য-সংকলন 'বনবিহগী'। গ্রন্থখানি 'চিরতরুণ' কবি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে কবি বলেছেন, 'রবির আলোকে যে বিহগী পাখা মেলেছে তাকে রবিকরেই সমর্পণ করলাম।' কবিতাগুলি ১৩২৯ থেকে ১৩৪০ সালের মধ্যে রচিত। অর্থাৎ কবির উনিশ বছর বয়স থেকে ত্রিশ বছর বয়সের আনুপূর্বিক রচনবালীর নির্বাচিত সংকলন 'বনবিহগী'।''[১৫]

দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি ও প্রেম দুটি অনুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। একটি মানসলোক ও অন্যটি মৃত্তিকালোক। রোমান্টিক গীতিকবির অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনা এক ভাবময় অনুপ্রেরণায় পর্যবসিত হয়েছে। এক মিস্টিক কবির মতই বাস্তব থেকে কল্পনার জগতে, নিকট থেকে দূরে, জানা থেকে অজানার দিকে, বহির্জগত থেকে মনোজগতের প্রতি তাঁর কল্পনা অগ্রসর হয়েছে। বনবিহগীর মতই তাঁর মুক্ত কল্পনা ধাবিত হয়েছে। সৌন্দর্য ও প্রেম সম্বন্ধে রোমান্টিক গীতিকবির মনে যে পরিকল্পনার আদর্শ থাকে, সেই আদর্শকে জগত ও জীবনেররসে জারিত করে বস্তু-নিরপেক্ষ একটি ভাবময় অনুভূতির প্রকাশ এই কাব্যে তাই প্রকৃতি, সৌন্দর্য ও প্রেম একাত্মতা লাভ করেছে। প্রকৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ ও গভীর মমত্ববোধ — এর সঙ্গে, হার্দিক অনুভূতির অপূর্ব সমন্বয়ে এই কাব্য একটি ভাবগত ঐক্য স্থাপন করেছে —

যৌবন বহ্নির তাপ ঘুচাইবে গৃহ তরুচ্ছায়া!
মমতা-মাধুরী মোহে রচি দিবে স্বপ্ন-মুগ্ধ মায়া!
ক্লান্ত জীবনের প্রান্তে বেঁধো এসে বিশ্রামের নীড়!
সেথায় রবে না বন্ধু, বাহিরের কোলাহল ভীড়!
মুক্তির বিশাল ক্ষেত্রে বিশ্বের অঙ্গনে তুমি, জানি —

শক্তিরূপে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিবে মমপাণি।।[১৬]
—(আকাশ ও নীড়: বনবিহগী: মানসলোক, পৃঃ — ৫)

গভীর নিশীথে কান পেতে কভু শুনেছ তুমি
অন্ধকারের আকুল কান্না নিশুতি তলে?
স্তব্ধ আকাশে যখন কেবল তারারা জ্বলে
অন্ধকারের মূক ক্রন্দনে গগন গলে,
অসীম শূন্যে মিশে যায় এই পৃথিবী ভূমি?[১৭]
—(গভীর নিশীথে: বনবিহগী: মৃত্তিকালোক, পৃঃ — ৫৮)

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের বিশ্লেষণে 'মানসালোক', 'মৃত্তিকালোকের' কবিতার আলোচনার উল্লেখ এখানে পাঠ-সহায়ক বলেই মনে করি:

কবিতাগুলি দুই ভাগে বিভক্ত করা — মানসালোক ও মৃত্তিকালোক। মানসালোকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা, 'জীবনদেবতা'। এই কবিতার সঙ্গে 'লীলাকমল'-এর উৎসর্গ কবিতার একটি অলক্ষ্য যোগসূত্র রয়েছে। লীলাকমলেব উৎসর্গ-কবিতায় কবি বলেছিলেন :

আমি যারে দিব অর্ঘ্যখানি,
তুমি তো সে-জন নহ, জানি।
আঁধারে করিয়া ভুল
এসেছিনু দিতে ফুল, —
সে ভুল কি নিতে হবে মানি?
সে-যে রাজ-অধিবাজ, যার এই অর্ঘ্য অমলিন
কেমনে মলিন করে এ পুষ্প স্পর্শিবে তুমি, দীন।

অর্থাৎ জীবনদেবতার উদ্দেশ্যে যে অর্ঘ্য নিবেদিত, মর্ত্যের সামনে দীন মানুষ কি করে তাকে স্পর্শ করবে? বিবাহের বৎসর দুই পূর্বে লেখা এই উৎসর্গ রচনার দিনে প্রেমের দেবতার মুখে নিশ্চয়ই কৌতুক হাসি বিকশিত হয়ে উঠেছিল। আদর্শবাদিনীর এই অহমিকা নম্র হল সর্বসমর্পণ করা আত্মনিবেদনের মহিমায়। কবি বুঝতে পারলেন, প্রেমের স্পর্শে সামান্যই অসামান্য হয়ে ওঠে। মানুষের দেহেই দেবত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাই তিনি বললেন·

দুঃখের দুঃসহ হোমানল,
যে-প্রেমেরে করে সমুজ্জ্বল,
যে-প্রেম ত্যাগের পরে
আসন রচনা করে
জীবনে যা ধ্রুব অচঞ্চল!

জাগে যদি সেই প্রীতি মৃত্তিকায় মানবেরে ঘিরি, —
তুচ্ছ করি ফিরায়ো না, — জীবনদেবতা যাবে ফিরি।

'বনবিহগী'র এই উপলব্ধিতেই 'লীলাকমল'-এর ছদ্ম প্রত্যাখ্যানের অপরাধ প্রক্ষালিত হয়েছে।

'বনবিহগী'র 'মৃত্তিকালোক'-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'মৌন প্রশস্তি'। রবীন্দ্রনাথের বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হলে ১৯৩১ সালে যে জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন হয়েছিল সেই উপলক্ষেই কবিতাটি লেখা। এ উৎসবে 'প্রকৃতির অন্তর্যামী' কবিকে নীরব কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছে বিশ্বপ্রকৃতি। এসেছে প্রভাতসংগীত-এর নির্ঝরিণী, এসছে কবির যৌবনদিনের পদ্মা, এসেছে গ্রাম্য বেণুকুঞ্জ, বর্ষার নদীতট, ছায়াঘন বৃদ্ধ বট, স্বচ্ছ পল্লী দিঘি। এসেছে ফাল্গুনের আম্রবন, নিকুঞ্জের পুষ্পরাজি। এদের সবার সঙ্গে কবি নিজের পূজা-উপচার নিবেদন করে বলেছেন,

আমি মনে ভাবি তাই তব যোগ্য পূজা-উপচার
কী দিয়া রচিব নাহি জানি!
আকাশ-বাতাস আলো শ্যাম ধরা যাঁর অর্ঘ্যভার
পদপ্রান্তে বহি দিল আনি।

এই অভিনব প্রশস্তিগাথা রবীন্দ্রকাব্যলোকে অনুবিষ্ট কবিভক্তের রাগানুগা ভক্তির সার্থক নিদর্শন।

'বনবিহগী'র সর্বশেষ কবতির নাম 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়'। এই কবিতায় মৃত্যুজিৎ প্রেমের জয়ধ্বনি পুনর্বার উচ্চারণ করেই কবিকণ্ঠ নীরব হয়েছে। কবিতার অন্তিম স্তবকটি যেন কবির জীবনযজ্ঞের পূর্ণাহুতির মন্ত্র:

জীবন-যজ্ঞাগ্নি মোর ম্লান যেন নাহি হয় কভু,
এই শুধু চাই,
নিভুক বাহিরে দীপ, অন্তরের দিব্যলোকে তবু
কোনো দৈন্য নাই।
প্রাণের অমৃত দিয়া মৃত্যুরে করিব আমি জয়
মর-ধরণীতে,
প্রেমের দুর্লভ স্বর্গে রবো নিত্য অজয়-অক্ষয়
ভাষাহীন গীতে।

প্রকৃতপক্ষে 'বনবিহগী'র পরে কবির স্বনামে আর কোনো কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়নি। এ-দিক দিয়ে এই কবিতাটি যেন দৈববাণীর মর্যাদা বহন করেছে।[১৮]

৩) বুকের বীণা: অপরাজিতা দেবী (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ/১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ)

ড্রামাটিক মনোলগের আকারে লেখা 'বুকের বীণা'র মাধ্যমে রাধারাণী দেবী ওরফে অপরাজিতা দেবীর আবির্ভাব ঘটল। ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'নিশীথ কলহ' ও 'সখী সঙ্গমে' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগতে প্রবল সাড়া পড়ল। তিনি প্রমাণ করলেন যে মেয়েলি ভাষা বলে ভাষা তো আছেই — তাতে ছন্দ বৈচিত্র্যের মাধ্যমে চারিত্রিক বৈচিত্র্য ও শৈল্পিক পরীক্ষাও করা যেতে পারে।

'বুকের বীণা'-র রচয়িত্রী কিন্তু রাধারাণী দেবী নন, অপরাজিতা দেবী; 'বুকের বীণা'র রচয়িত্রী:

'কবি নিজের নাম-পরিচয় দূরে সরিয়ে রেখে নবীন অনুরাগের স্বপ্নসম্ভোগে বিভোর হয়ে আছে। আলংকারিকগণ সঙ্গমপূর্ব রতিকেই বলেছেন পূর্বরাগ। পূর্বরাগে অঙ্গসঙ্গ হয় না বটে, কিন্তু লীলাবিলাসের সমস্ত বাসনাই মনে মনে আস্বাদিত হয়। অনাস্বাদিত মিলনের এই মনোময়ী বাসনাই স্বচ্ছন্দকাব্যরূপ পেয়েছে 'বুকের বীণা'য়। অন্তরে বাসনা জেগেছে, বাস্তবে জীবনে তার পরিতৃপ্তির পথ অবরুদ্ধ—এই অতৃপ্ত বাসনার সুকুমার অনুভবগুলি কুড়িয়েই 'বুকের বীণা' রচিত। জন্মদিনে কোন রঙের শাড়িখানি পরলে প্রিয়তমের ভালো লাগবে, কলেজ বোর্ডিং-এ অনূঢ়া তরুণীদের কোন রসালোচনা সবচেয়ে রুচিকর, এ-সব কথা তো আছেই। সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দাম্পত্যজীবনের 'চিরপুরাতন বিরহ-মিলন-লীলা'। নারীকে সমাজ চিরদিন নির্বাক করে রেখেছে বলেই, নারীজীবনের অন্তরঙ্গ কথাগুলিকে প্রগল্‌ভ বলেই মনে হয়। 'দিনের শুরু' কিংবা 'নিশীথ কলহে' প্রভৃতি কবিত্রয় কবি বাঙালি-জীবনের যে ঘরোয়া ছবি এঁকেছেন তার মাধুর্য অনস্বীকার্য। সবচেয়ে সার্থক এর বাগ্‌ভঙ্গি। অপরাজিতা দেবী প্রতিদিনের কথাবার্তার আটপৌরে ভাষাতেই তাঁর কবিতা রচনা করেছেন। নির্ভুল ছন্দে বার্তালাপের ভঙ্গিকে ক্ষুণ্ন না করে এ-ধরণের কাব্য রচনা যে বিশেষ অনুশীলন-সাপেক্ষ তা মানতেই হবে। মুখের ভাষাকে 'বুকের-বীণা'য় ফুটিয়ে তুলে অপরাজিতা দেবী বাংলা কাব্যলোকে নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। 'সিঁথি মৌর'-এর কবিতাগুলির সঙ্গে,

কলঙ্ক আজ চন্দন মোর, নিন্দা হয়েছে ফুল,
প্রাচীনসমাজে কুলায়নি ঠাঁই, ভেঙেছে স্বজন-কূল!—

—এই দুই পংক্তির আশ্চর্য্য মিল লক্ষ্য না করে পারা যায় না। 'বুকের বীণা' 'প্রিয়তম'কে উৎসর্গ করা। উৎসর্গ কবিতাটিতেও 'লীলাকমল'-এর কবিকণ্ঠকে চিনতে ভুল হওয়ার কথা নয়:

জীবনের চেয়ে সত্য ত্রিলোকে কিছু নেই কোনোখানে,
তনু-মন-প্রাণ ভরে গেছে মোর আজি এ কবির গানে,
হৃদয়ের চেয়ে বড় নেই কিছু — দু-দিনের দুনিয়ায়

জনমের পিছু মরণের ডাক অহরহ শোনা যায়!
মূঢ় সমাজের বিধিনিষেধের বিপুল শাসন মিছে —
মানুষের প্রেম নিকষিত হেম — সে নহে কাহারও নীচে —
'—শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

'মূঢ় সমাজের বিধিনিষেধের বিপুল শাসন' সাধারণ দাম্পত্যজীবনের বিরহ-মিলনের কবিতায় আসবার কথা নয়। এ যে একটি বিধিনিষেধের নিগড়ে বাঁধা বিশেষ মনের স্বপ্নকামনা— একথা বলাই বাহুল্য।[১৯]

কলেজ বোর্ডিং-এ ছাত্রীটি বা নববধূ অথবা বাসনমাজা দাসীটি প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা বা ভঙ্গী আছে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মুখে তাদের চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী উপযুক্ত ভাষা দিয়েছেন অপরাজিতা। কিন্তু এ যে নারীরই নিজস্ব ভাষা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এখনো যে ফিরল না ব্যাপার কী তার?
এতো দেরি কখনো তো করেনি সে আর!
তাইতো।...কী হল?...এতো ভালো কথা নয়;
না — না — ওই আসছে সে! — ঠিক! — নিশ্চয়!'[২০]
—(আঁধারে আলো: বৈকালে জানালায়একা: পৃঃ — ২৩)

"আমি কেঁদে আজ জিতেছি এ অভিশাপ
তোমাকেও যেন দহে দিদি এই তাপ।
তোমার প্রাণের রুদ্ধ প্রেমের দ্বার
বিচূর্ণ যেন হয়ে যায় একবার।
আমার এ ব্যথা তোমার মর্মতলে
জেগে ওঠে যেন এমনি অশ্রুজলে।
সেদিন বুঝিবে কী জ্বালা রুনুর বুকে
জ্বলে উঠে তার পোড়ানো সকল সুখে।[২১]
—(দম্পতির দ্বন্দ্ব: বুকের বীণা: পৃঃ — ৩১)

শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায় এই কাব্যগ্রন্থের সমালোচনায় লিখেছিলেন:

...বাংলার নারী রচিত কাব্যসাহিত্যে এই পুস্তকখানি যুগ পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু এখানিতে কবিতা আছে দুটি কি একটি। যেমন 'শেষ রাত্রি' ও 'কৈফিয়ৎ'। বাকিগুলিতে কবিতার পাপড়ি ইতস্তত ছড়ানো থাকলেও সেগুলিকে আমরা মেয়েলি ছড়া ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারি নে। কিন্তু কজন লেখিকা এঁর মতো মডার্ণ, এঁর মতো মেয়েলি, এঁর মতো নিঁখুত তাল ও মিল দিতে সমর্থ?...[২২]

এবং অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র দাশ লেখেন:

> *তাঁর "বুকের বীণায়" সঞ্চিত ব্যথায় গানের full throated ease" -এযে আকুতি, তাতে অধিকাংশ আধুনিক লেখকের "sensuous strain" আছে সত্য, কিন্তু তার বিকৃতি নেই; প্রকাশের ভঙ্গিমা সংযমের বাঁধনে সুন্দর হয়ে উঠেছে। এধরণের "verse de societe" বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম— ইংরাজী সাহিত্যে অবশ্য Austin, Dobson, Gay প্রভৃতির লেখা কবিতায় এ ধরণ যথেষ্ট আছে।*[১৩]

৪) আঙিনার ফুল (১৩৪০ বঙ্গাব্দ: ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)

এখানেও নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিকের বর্ণনা করা হয়েছে। বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য, শব্দ-ব্যবহার ও কথার অন্ত্যমিল ও ছন্দের মধ্যে নারীর ব্যক্তিগত চিহ্ন যেন বর্তমান। লিরিক্যাল মুহূর্তগুলি ড্রামাটিক মনোলগের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিকার জীবনসঙ্গী নির্বাচনের প্রক্রিয়া বা ননদ-ভাজের কথোপকথনের মধ্যে জড়িয়ে আছে তখনকার মধ্যবিত্ত সমাজের চলমান রূপরেখা। সেই অর্থে একে সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাসের ভূমিকা বলা চলে।

> *অপরাজিতা দেবীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'আঙিনার ফুল'। 'ভূমিকা'য় আত্মপরিচয়ের ছল করে কবি বলেছেন :*
>
> *গন্ধবিহীন দীন কালো ফুল,—*
> *সভায় আমারে এনো না ডাকি।*
> *প্রিয়বল্লভ-পল্লব ছায়ে*
> *বেড়ার আনালে গোপনে থাকি।*
> *রবির আলোয় চন্দ্র-কিরণে*
> *ফোটে শত শত রঙিন ফুল, —*
> *আমি আঁধারের, আমাকে খুঁজিয়া*
> *রসিক জনেরা কোরো না ভুল।*
>
> *গূঢ়ার্থ প্রতীতিতে একে এক ধরনের অপহ্নুতি অলংকার বলা যেতে পারে। এই কাব্য প্রকাশের পূর্বে কবির বিবাহ হয়েছে। কাজেই 'প্রিয়বল্লভ-পল্লব ছায়ে বেড়ার আড়ালে গোপনে থাকা' বিশেষ অর্থবহ হয়েছে। তাছাড়া রাধারাণী দেবী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েরই একান্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। সে-কথা চিন্তী করলে 'রবির আলোয় চন্দ্রকিরণে' কত শত রঙিন ফুলের ফুটে ওঠাও অর্থমণ্ডিত। এই 'কত শত'দের মধ্যে কবি কেউ নন, তিনি আঁধারের — এই নিষেধোক্তির মধ্যেই নিশ্চয় প্রতীতি নিহিত আছে। এও এক ধরনের আলংকারিক Denial — তাই একে অপহ্নুতি অলংকারের সগোত্র বলে মনে করা যেতে পারে।*

'আঙিনার ফুল' -এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'স্ক্যান্ডাল'। অভিজাত সমাজে এক ধরনের নারী আছে যারা সকলের কুৎসা রটিয়ে বেড়ায়। এই কুৎসা-রটন-পটীয়সী নারীটিকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে কবি এই কবিতায় মূর্তিমতী করে তুলেছেন। এমন কি তার মুদ্রাদোষটুকুও বাদ যায়নি। তাই রসনারোচন কেচ্ছাগুলি শেষ করে সে যেন হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলছে:

সন্ধ্যে কখন উৎতরেছে?...ঈষ্। রাত্রি ঘনায় যে রে।
কথায়-কথায় হয়নি খেয়াল আর।...
...ষাট্ যদি না-ই পারিস নিদেন পঁচিশ টাকাই দে রে
মাসকাবারেই শোধ দেব তোর ধার।

বাংলা কাব্যে এই ধরনের চরিত্র আর সৃষ্টি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অবশ্য 'বুকের বাণী'র মতোই 'আঙিনার ফুল'-এও দাম্পত্য জীবনের চটুলতার প্রতি কবির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। 'বাসর ঘরে', 'রুদ্ধ গৃহে' প্রভৃতি কবিতাই তার প্রমাণ। কিন্তু ওরই ফাঁকে ফাঁকে ক্বচিৎ কখনও অপরাজিতার কণ্ঠে রাধারাণীর ভাষা শুনতে পাওয়া গিয়েছে। 'আজ' কবিতাটিকেই উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক। শিলং পাহাড়ে আগের রাত থেকে বাদল নেমেছে, আকাশ হয়েছে মলিদা রঙের। কবি বলছেন,

বকুল-মালিকা কোনও মালবিকা দেয়নি আমায় এনে!
এলাই নি কেশ, এলো-খোঁপা শুধু নিজেই বেঁধেছি টেনে।
ভালো নেই মোর অলকাতিলক, তনুতে পত্রলেখা,
ভবন-বলভি-শিখরে আমার নাচে না মত্ত কেকা।।
যূঁথিপরিমলে গৃহগুহা মোর মোটে নয় সুরভিত।
প্রবাসী প্রিয়ের বিরহ-দহনে গুমরি দহে না চিত।।

চিকন সবুজ পাহানের গায়ে বৃষ্টিধারার চিক্
স্ফটিক-পর্দা দিয়েছে টাঙিয়ে দেখি চেয়ে অনিমিখ।।
শিখরে-শিখরে শুভ্র মেঘের চপল ঝুলন-মেলা।
শ্যামল-ভ্যালির স্নিগ্ধ বুকেতে শ্রাবণের লীলাখেলা।।
সুনীলকান্ত মণিনিভ মেঘ সুদূর শৈলশিরে,
দিয়েছে পরায়ে রঙিন কিরীট উন্নত চূড়া ঘিরে।।
সবুজের বুক চিরে চলে গেছে সিঁদুর-বর্ণ পথ—
নব-বিবাহিতা শ্যামা-রূপসীর রক্তিম সিঁথিবৎ।।

এই কবিতায় কবি আর আত্মগোপন করতে পারেননি —কেন না এ-ভাষা 'বুকের বীণা', 'আঙিনার ফুল'-এর কবিভাষা নয়; এর মধ্য দিয়ে 'লীলাকমল', 'বনবিহাগি'র মঞ্জুভাষিণী কবির কণ্ঠই শোনা যাচ্ছে।"[২৪]

আর একটি উদ্ধৃতি :

ফিউচারটাই ভেবে দেখা চাই বিয়ের ব্যাপারে আগে;
খালি ভাবে ভুলে ঝাঁপানো অকূলে
নভেলেই ভালো লাগে।
'জি পি. নোট' ছাড়া ব্যাঙ্কেও কিছু
জমা আছে যাব ক্যাশ
সাজানো গোছানো নিজের বাড়িটি,
মোটর গাড়িটি ব্যাস।
এ হলেই হবে; এর বেশী আর লোভ
কিছু নেই, ভাই।
ছেলে-পিলে? - না না রাতাবাতি নয়—
দু-একটি, পবে চাই।[২৫]

(মনের মতো — আঙিনার ফুল, পৃঃ --- ৪৫)

৫) পুরবাসিনী (১৩৪২ বঙ্গাব্দ : ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)

কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত এই গ্রন্থে আছে বিচিত্র জীবনের কাহিনী, জটিল অশ্রুহাসিতে জড়ানো, নানা শ্রেণীর নানা ধরণের পোট্রেট। একটি স্পষ্ট ফোটোগ্রাফের অ্যালবামের মত স্বচ্ছ ও নির্মেদ। নারীব চোখে দেখা বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের অদ্ভু ত চরিত্রচিত্রণ। নারী ও পুরুষের সামাজিক ও পারিবাবিক ভূমিকা কেমন, পুরুষের চোখে নারী বা নারীব চোখে পুরুষ, নারীপুরুষের নানাবিধ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক, স্বতন্ত্র চরিত্রের স্বতন্ত্র বক্তব্য যেন তাদেরই মুখের ভাষায় প্রকাশ করেছেন কবি অপরাজিতা।

অপরাজিতা দেবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'পুরবাসিনী'। অমাদের গৃহকোণে গৃহিণী-সচিব-সখীরা তো আছেনই, আরও আছেন বৌদিদি-ননদিনী-মা-পিসিমা-মাসিমা-কাকিমা-জেঠিমা। ঠানদিদি আছেন, দিদির ছোটো বোনেরাও আছে। শ্যালিকা -নাতনিদের ও অভাব নেই। এদের প্রত্যেকের মুখের ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গিকে বিন্দুমাত্র না বদলে নিখুঁতছন্দে কবিতা লেখা আয়াসসাধ্য কবিকর্ম। এই কঠিন কবিকর্মে অপরাজিতা দেবী উত্তীর্ণ হয়েছেন — এ তাঁর অসামান্য লিপিকুশলতারই প্রমাণ। একে-একে এদের সঙ্গে পরিচয় করা যাক :

প্রিয়সখী :

এবারের ছুটিতে
তুমি নাকি উটিতে

যাচ্ছ বেড়াতে?...হ্যাঁ গো! সত্যি কি? - বলো না!—
আমি বলি তার চে
এ প্রিল-মার্চে
কাশ্মীরে এ বছর যাই কেন চল না!!—

সচিব :

খরচ কমানো হুজুগ উঠেছে দেশে—
তোমারও চাকরি যায় যদি এতে শেষে
যাবেই না হয়। চিন্তা কিসের অতো?
যতই ভাববে, বাড়বে ভাবনা ততো।

গৃহিনী :

বাইরে এসেছে বন্ধুরা ওঁর, চা পাঠিয়ে দিই,
নিমকি ভাজি!
ডাকছেন উনি,—কেষ্টা নাই কি?
জিগেস করুক, তামাক চাই কি?
যাঃহ! ভুলে গেছি!... নেমন্তন্ন জামাইকে করে
পাঠাই আজই!

পিসিমা :

ষাট্! ষাট্! ষাট্!—ওকি করো বউ!
ছেলেকে বকো না সন্ধেবেলা!
কিছুই তো আহা করেনি বাছারা,
মাঠে গিয়েছিল করতে খেলা!
'পোড়ার-মুখো' কি বলতে আছে গো?
মা-ষষ্ঠী হন রুষ্ট এতে!
গালাগালি দিলে— কেনে নেন ছেলে!—
ষষ্ঠিতলায় আঁচল পেতে
তোমাকে দিয়েছি মাদুলি কবচ,—
নিজে কাটিয়েছি মানত করে
তবে না বেঁচেছে ওই গুঁড়ো-কটা,
মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে শিবের দোরে।
কখনও এমন মা দেখিনি বাপু!
মরা-হাজা ওই তিনটি কণা,
যখন-তখন যা-তা গাল দেওয়া!!...
—অতো ভালো নয় গিন্নিপনা।।

মাসিমা :

ও কে? অমিয়েশ? ... আয় বাবা, আয়!
—কেমন আছিস বল্!
থাক্-থাক্ ওরে!—পায়ে হাত নয়,—
হয়েছে।—ওপরে চল্!
এতদিন কেন আসিসনি অমু?
দেখিনি যে মাস চার।
বড়ো হয়ে বুঝি মাসিমাকে তোর
মনেই পড়ে না আর?

কাকিমা ·

বড়ঠাকুরের আসার সময় হল,—
বড়দি!—তোমার সেলাই এখন তোলো!
—জলখাবারের জোগাড় কিছুই নাই।
চারটে তো প্রায় বেজেই গেছে —, তবু
এখনও আজ মন্টু-মানিক-নবু
ইস্কুলেতে রইল কেন ভাই?
আমি বলি, আনতে ওদের মহেশ চাকর যাক না
বড়দি! তোমার ভাবনা কি নেই? —সেলাই এখন থাক না।

বাংলার ঘরোয়া জীবনে, বাঙালির সংসারে এঁরা চিরন্তনী। অন্তঃপুরের মেয়েমহলে তাঁতিনীদেরও নিত্যকালের আনাগোনা।"[২৬]

আর একটি উদ্ধৃতি :

"বিয়ে হয়ে 'বধি তিনটি বছর
দিইনি তো ভাইফোঁটা।
প্রতি বছরই কেঁদেছি এ দিনে
ননদ দিয়েছে খোঁটা
সারাদিন মাগো মন করে হু হু —
জল আসে চোখে শেষে।
ভাই-দ্বিতীয়ার দিনটিতে কি বা
থাকা যায় দূর দেশে?"[২৭]

(দিদি:পৃঃ ১০৪)

৬) বিচিত্ররূপিণী (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ : ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)

অপরাজিতার কাব্য সংগ্রহের মধ্যে 'বিচিত্ররূপিণী' সম্পূর্ণ অন্য আঙ্গিকে লেখা। বৈষ্ণবআকর গ্রন্থ-রূপগোস্বামী রচিত 'উজ্জ্বলনীলমণি'কে অনুসরণ করে নায়িকার আটটি

রূপ বা মনোভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে অপবাজিতা দেবী বর্তমান সমাজের উপযোগী করেই প্রেক্ষাপটটি সাজিয়েছেন। নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা পুরোনো হয়নি। 'পূর্বরাগ' বা 'স্বাধীনভর্তৃকা' আধুনিক যুগেরই যোগ্য প্রতিফলন। বৈষ্ণব কাব্যকারদের নায়িকার সমস্ত গুণ স্বীকার করেও সযত্নে ও দক্ষতার সঙ্গে আধুনিক কালের নারীর জীবনে কিভাবে ঐ আটটি অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে, তা সুন্দর ভাবে পরিবেশিত হয়েছে। অভিসারিকা, বাসক-সজ্জা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা বা প্রোষিতভর্তৃকা — প্রত্যেকেই আমরা বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। এছাড়া পূর্বরাগ, মিলন বা বিরহ পর্যায়ে বৈষ্ণব সহিত্যে যে ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেইভাবেই সমসাময়িক পরিবেশে ও পটভূমিতে চিত্রিত করা হয়েছে। 'অভিসার' পর্বে তাই নায়িকাকে শ্রীরাধার মতই অভিসারে চলতে হয়েছে গোপনে, সন্ধ্যায়,— সকলের অগোচরে —

বড়ো তাড়াতাড়ি পড়েছি বেরিয়ে এখনো আঁধার জমেনি ভালো
মানুষের মুখ কাছে চেনা যায়, রয়েছে অল্প আবছা আলো।
ঘড়ির কাঁটার পানে চোখ মেলে অধীরে কেটেছে দিনটি সারা,
সূর্য অস্ত যেতে না যেতেই মন হয়ে গেছে আত্মহারা।
আরো কত পথ বাকী আছে মাগো! দুরু -দুরু বুক ভয়েতে কাঁপে,
মুখ চোখে যেন আগুন ধরেছে আপনারি ঘনশ্বাসের তাপে।
থরথর কাঁপে সারাটি শরীর, হাত-পা অবশ অসাড় পারা।
শীতেও কপালে ঘাম ফুটে গেছে, ঐ না এদিকে আসছে কারা!"[২৮]
(বিচিত্ররূপিণী: অভিসারিকা: সন্ধ্যার পরে : পৃঃ ১২৮)

'স্বাধীনভর্তৃকা' — পর্বে আধুনিকা নারীর একটি অন্য রূপ ফুটে উঠেছে —

"নেল-পলিশিং কেসটা কোথায়? ভ্যানিটি ব্যাগেই আছে।
লিপস্টিক যে ফুরিয়ে এল। কিনতে হবে কালই।
আইব্রাউ পেন্সিলটা এনে দাও না আমার কাছে —
উঃ! কী গরম! ফ্যানের নীচেও উঠছি ঘেমেই খালি।
বয়কে বল — আনুক আইসক্রীম
প্রোগ্রাম তো ওপেন হবে উইথ 'দ্য লাভার্স ড্রীম'?'[২৯]
(স্বাধীন-ভর্তৃকা: বিচিত্ররূপিণী)

একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ ও আলোচনা :

অপরাজিতা দেবীর সর্বশেষ কাব্য-সংকলনের নাম, 'বিচিত্ররূপিণী'। 'পুরবাসিনাতে' নারীর পারিবারিক চেহারায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'বিচিত্ররূপিণী'

তে কবি নারীর ভাবমূর্তিগুলি রসিক সমাজের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। প্রাচীন আলংকারিকগণ প্রেমিকা নায়িকার মানসিক অবস্থাভেদে তাদের অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা প্রভতি নানা ভাবে বিভক্ত করেছেন। রসশাস্ত্রে নায়িকা -প্রকরণে উদাহরণের সাহায্যে এদের লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রেমময়ী শ্রীরাধাকে কবিগণ এইসব বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়েই প্রেমের পরমতীর্থে পৌঁছে দিয়েছেন। মধ্যযুগের সেই পরিবেশ আর নেই। কিন্তু নরনারীর চিত্তে সেই বৃন্দাবনলীলা আজও আছে, চিরদিনই থাকবে। আধুনিক জীবনে আধুনিক পরিবেশে অভিসারিকা-বাসকসজ্জিকা-প্রভৃতি নায়িকার কথা বলা হয়েছে 'বিচিত্ররূপিণী' তে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, কবিতাগুলি বুঝি অলংকার শাস্ত্রে উদ্ধৃত উদাহরণেরই আধুনিক সংস্করণ, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, এগুলি অলংকার-শাস্ত্রসম্মত পদ্য নয়— বাস্তবজীবনসঞ্জাত কাব্য।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 'অভিসারিকার' নায়িকা গিয়েছে পুরীর সমুদ্রতীরে। নায়ক ব্রতবীর সন্ধ্যায় স্লিপ পাঠিয়েছে সমুদ্রতীর ধরে পশ্চিমে স্বর্গদ্বারের শেষসীমায় যেতে। অভিভাবিকারা মন্দিরে যাবেন, আরতি দেখে ফিরতে রাত হবে। এই সুযোগে নায়িকা বেরোবে অভিসারে। অপরাহ্নে তার মনের অবস্থা :

মুক্তার টাপ্ বদলিয়ে কানে নিই পরে নীল ঝুমকো দুটি,
মভ্ রং শাড়ি? না এখানা থাক। স্কার্লেট-ক্রেপে চুমকি-বুটি
এখানিও নয়। সমুদ্রতীরে চলবার পথে পুরুষ-মেয়ে
শাড়ি বাহারে নজর জড়ালে তাকিয়ে কেবলই দেখবে চেয়ে।

তারপর পরিবেশের বেশে সজ্জিতা নায়িকা বেরিয়ে পড়ল স্বর্গ-দ্বারের উদ্দেশে। মনের তাড়ায় একটু আগেই বেরিয়ে পড়েছে। চেনা লোকের সঙ্গে পাছে দেখা হয়ে যায়, এইজন্য সংকোচও আছে। কিন্তু ধনুকের তীরের মতো মনের গতিকেও একবার ছুঁড়ে দিলে আর তো ফেরানো যায় না। তাই সে এগিয়ে চলতে লাগল। আরেকটু এগোলেই ব্রতবীরের দেখা পাওয়া যাবে। কবিতাটির শেষের চারটি চরণে অভিসারিকার অন্তিম মনোভাবটি উচ্চারিত:

অন্ধকারেতে ঢেকে গেছে দিক্। প্রায় জনহীন তটের বালি,
ফস্‌ফরাসের আলোর ফিন্‌কি পদতলে দীপ জ্বালায় খালি!
বাইরে মত্ত সাগরের ঢেউ আছড়িয়ে পড়ে বালুর পরে,
আমারও বুকের ভিতরে সাগর অমনি উথালি-পাথালি করে

বলাই বাহুল্য, এ-কবিতা অলংকারশাস্ত্রের উদাহরণ মাত্র নয় —এর-মধ্যে জীবনের ছন্দ, এমন-কি নায়িকার হৃৎস্পন্দনটি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বিপ্রলব্ধা। নায়ক তিন বছর বিলেতে কাটিয়ে দেশে ফিরে আসছে। নায়িকা (এক্ষেত্রে স্বকীয়া) তিন বছর ধরে এই দিনটির জন্য দিন গুনছে; আজ তার প্রতীক্ষা সার্থক হবে। সজ্জিত শয়নগৃহের সুচারু প্রসাধনটি নয়নাভিরাম :

ধবধবে সাদা দুধের ফেনার মতো
বিছানা পেতেছি জোড়া-খাট জুড়ে আজ,
সার্থক হবে সেলাই করছি যত
কুশনে-কভারে-পর্দাতে কারুকাজ।
বেডশিটে দিছি ফুল তুলে কোণে -কোণে,
কেলি-কদম্ব-কমলকলির সাথে,
ড্রেনথ্রেড টেনে চারপাশে জালি বুনে,
এমব্রয়ডারি করেছি নিজের হাতে।
মাথার বালিশে মরালমিথুন আঁকা,
রেশমী-তোষকে বনবসন্ত ছবি;
— তিনটি বছর এ-দিনের আশে থাকা,—
আজ চোখে তাই রঙিন ঠেকছে সবই।

এই সজ্জা রচনার মধ্যে নায়িকার মনের মিলন-বাসনাটি ইঙ্গিতে-ভঙ্গিতে স্ফুট হয়ে উঠেছে। বর্ণনাটি যেমন বাস্তব, ইঙ্গিতটিও তেমনি নিগূঢ় মনস্তত্ত্বসম্মত। কিন্তু প্রতীক্ষা সার্থক হল না। স্টেশন থেকে গাড়ি ফেরে এল দুঃসংবাদ বহন করে। নায়ক (এক্ষেত্রে স্বামী) বম্বেতে নেমে সেখানে আরও দশ-বারোদিন থাকবেন স্থির করেছেন—কবে আসবেন চিঠি লিখে জানাবেন। এই অবস্থায় নায়িকার মনের প্রক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। এই মুহূর্তে তার সমস্ত জীবনটাই বিস্বাদ বোধ হয়। দুঃখ-অভিমানে-হতাশায়-বিরক্তিতে সবচেয়ে প্রিয়বস্তুও বিরস ও বিবর্ণ হয়ে ওঠে। মনের এই অবস্থায় নায়িকা বলে :

পাশের বাড়ির গ্রামোফোনে আসে কানে
রবিঠাকুরের গীতালির গানখানা,
এমন খারাপ সুর আর কথা,—গানে
রবিবাবু দেন,—ছিল না-তো আগে জানা।

বৈষ্ণব পদাবলীর বিরহিনী রাধার কমনীয় তনুতে চন্দন আর চন্দ্রালোকও অগ্নিজ্বালা সৃষ্টি করেছিল; কোকিলালাপ হয়েছিল কর্কশতায় পূর্ণ। আধুনিক নাগরিকার বিরহ জর্জর চিত্তে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ও সুর বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। মনস্তত্ত্বের এই জীবনাশ্রয়ী সূক্ষ্ম কবিকর্মে অপরাজিতার কবিতা যুগসত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেই এ যুগের বিরহ-মিলন-কথাকে নিত্যকালের সামগ্রী করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথ অপরাজিতা দেবীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে তাঁর কবিতাগুলিকে ইংরেজি সোসাইটি ভার্সের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বলেছিলেন, ' এদের নৈপুণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প।' ' পুরবাসিনী', 'বিচিত্ররূপিনী'তে পৌঁছে অপরাজিতা দেবী শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে সাহিত্যের নিত্যকালের বস্তুকে সার্থক মিলনে মিলিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন, 'নিকুঞ্জে পাখিও আছে, রঙিন পাখার পতঙ্গমও আছে— কিন্তু যদি কেবল পতঙ্গম থাকে তাহলে অভাব থেকে যায়। তোমাব কাব্যে প্রজাপতি দেখা দিয়েছে, তাদের পাখার লীলা দেখলুম, কিন্তু পাখির গানও শুনতে চাই।' রবীন্দ্রনাথ যদি জানতেন রাধারাণী দেবীই অপরাজিতা দেবী, তাহলে নিশ্চয়ই এ-কথা বলতেন না। অপরাজিতা দেবীর 'বুকের বীণা', আঙিনার ফুল'-এ যদি প্রজাপতির পাখার লীলাই দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে তার আগেই রাধারাণী দেবীর 'লীলাকমল'-এ পাখির গানও শোনা গিয়েছে। তাছাড়া অপরাজিতা দেবীর কবিতায় শুধু প্রজাপতির পাখার রঙ-ই আছে, পাখির গান নেই, একথা 'পুরবাসিনী'-'বিচিত্ররূপিণী'তে অপ্রমাণিত হয়েছে।"[৩০]

কাব্যানুবাদ : মিলনের - মন্ত্রমালা : (১৩৫১ বঙ্গাব্দ : ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)

হিন্দু বিবাহের সংস্কৃত মন্ত্রগুলিকে ছন্দের মাধ্যমে বাংলায় অনুবাদ করা হয়। মন্ত্রগুলির ভাবানুবাদ হওয়ায় বিশিষ্ট মন্ত্রগুলি বিশেষ অর্থ বহন করছে সুললিত ছন্দ ও শব্দ ব্যবহার এই কাব্যের মূল বিশেষত্ব। মূল মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভাবানুবাদ লিপিবদ্ধ হওয়ায় মন্ত্রের অর্থও সুস্পষ্ট হয়েছে —

অবলোকন (বর ও কন্যার সম্মুখীকরণে)

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ
সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সঃ মাতরিশ্বা সং ধাতা
সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।।"

অনুবাদ:

আমাদের উভয়ের হৃদির প্রকাশ
দেবতারা সকলে করুন।
দিন্ উন্মোচনকরি যুগল হৃদয়
বারিরাজ দেবতা বরুন।
মরুৎ করুন নিজে সংযুক্ত দোঁহারে
কৃপা করি দুজনার প্রতি।
আমাদের যুক্ত করে দিন চিরতরে
উপদেষ্ট্রী দেবী সরস্বতী।।[৩১]

—(মিলনের মন্ত্রমালা, পৃঃ — ৭)

পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্নের "পুরোহিত দর্পণ", পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের "বিবাহ মঙ্গল" এবং পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের "বিবাহ্ পদ্ধতি" গ্রন্থগুলির সহায়তায় গ্রন্থটি রচিত। রাধারাণী এই গ্রন্থটির 'নিবেদন' অংশে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট করে দেন।

শ্রী অশোকনাথ শাস্ত্রী রচিত একটি মূল্যবান কথামুখ গ্রন্থটির পাঠমূল্য বর্ধিত করেছে।

খ: গল্প এবং সমজাতীয় গদ্যরচনা

গল্পকার রাধারাণীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, গল্পকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি আমি শুনিনি, জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবীর মতো।[৩২]

এবং

এই সংকলনের প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ ও গল্পগুলি যিনি লিখেছিলেন সেই নিঃসঙ্গ তরুণীটি কিন্তু আমার মা নন। তিনি ১৩ বছর বয়সে বিধবা একটি অল্পবয়সী মেয়ে। যাঁর স্বামী, সন্তান, সংসার, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা, উপার্জনক্ষমতা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা — কিছুই ছিল না। তাঁর হাতে ছিল কেবল একটিই ঈশ্বরদত্ত চাবি,— প্রতিভা, যেটি দিয়ে ঘরের দরজা খুলে বহির্বিশ্বে পদক্ষেপ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। লেখনীস্বরূপ সেই দৈব চাবিটিকেই তিনি ব্যবহার করতে পেরেছিলেন আজকের জীবনে এসে পৌঁছানোর জন্য। এই গল্পগুলি সেই মেয়েটির কলম-চালনার অ-আ-ক-খ। মা পরে বড়দের গল্প আর লেখেনি। গল্পকার হিসেবে মায়ের প্রসিদ্ধি ছিল বলেও শুনিনি। কন্যা হিসেবে আমি চেয়েছিলাম লেখিকা-মায়ের শ্রেষ্ঠ, পরিণত কীর্তিটুকুই কেবল লোকচক্ষে প্রকাশিত থাকা। প্রকাশ্যে সেটুকুই থাক, মায়ের মেধার শান যেখানে ঝলসে উঠেছে। কচি-কাঁচা এই লেখাতে মায়ের পরিচিত ধীমত্তার ছোঁয়া আমি পাইনি।
[৩৩]

রাধারাণী দত্ত নামে দুঃসাহসী তরুণীটির সাহিত্য জীবন সরল হয়নি, 'শনিবারের চিঠি'র অনেক আক্রমণ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর গল্প থেকে, 'মণি-মুক্তা' অংশে উদ্ধৃত করবার মতো আপত্তিজনক অংশ খুঁজে পেতেন সম্পাদক, যদিও বালবিধবা মেয়েটির লেখা গল্পগুলিতে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সর্বদাই প্লেটনিক। (এমন কি প্রবন্ধেও বিদ্রূপের রসদ তাঁরা খুঁজে পেতেন)।...[৩৪]

...প্রেমে দেহের জিৎ তাঁর চোখে মনুষ্যত্বের পরাজয়। তাঁর নায়িকারা প্রেমে পড়ে বটে, কিন্তু তারা সনাতন সংজ্ঞায় সতী, — অনায়াসে দেহকে উত্তীর্ণ করে যেতে পারে তাদের প্রেম। একের পর এক গল্পে দেখতে পাই বালবিধবা কন্যার, বা

বয়স্থা কুমারীর একাকিত্বের কাহিনী। তারা সাহস করে বিদ্রোহ করে না, নিয়ম ভাঙে না, নিজেরাও ভেঙে পড়ে না। আত্মিক বলে ঋজু থাকে।[৩৫]

আমাদের আলোচনার "গল্পগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট সাধারণ সূত্র এই — যে প্রতেকটির কেন্দ্রেই আছে একটি বাঙালী মেয়ে। যে-মেয়েটির জীবন নানাভাবে জটিল ও অসুখী। মধ্যবিত্ত বাঙালির সমাজজীবনের ছকে মনিয়ে চলতে হলে মেয়েটির ব্যাক্তিগত জীবনে কিছু অপূর্ণতা থাকতে বাধ্য। নানাদিক থেকে বিভিন্ন ধরনের চাপ আসে ওর ওপরে, এই চাপগুলির চরিত্র আলাদা, কিন্তু শেষ হিসেবে জীবনে তার ফলাফল দাঁড়ায় একই। নিতান্ত পুরুষতান্ত্রিক হিন্দু সমাজব্যবস্থার ফলে ঠিক-ভুল, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য বিষয়ে মেয়েটির নিজস্ব বিশ্বাস এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে সেচ্ছাতেই সে-মেয়ে তার আপন জীবনকে প্রচলিত অর্থে ব্যক্তি-সুখহীন এবং নিঃসঙ্গ করে ফেলে, কিন্তু তাতেই সে মনুষ্যজীবনের সার্থকতা ও মহত্ত্বের আলো-বাতাস খুঁজে নেয়। লেখিকার হৃদয়ের তন্ত্রী ওই একই তারে বাঁধা। তিনিও নারীর আত্মত্যাগের মধ্যেই নারীর মনুষ্যত্ব দেখেছেন, তাঁর প্রবন্ধগুলিতে তাঁর প্রমাণ পাই। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' তাঁর নিজের আদর্শ বলেই তাঁর মূল চরিত্রদেরও আদর্শ। নির্মম সমাজ যতই চাপ সৃষ্টি করুক, অসীম আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে সেই চাপ তারা ঠিকই সহ্য করে নিতে পারে। বিদ্রোহ করে না, ভেঙে পড়ে না, ভেঙে ফেলতেও চায় না। পুরুষতন্ত্রের নারী শিক্ষায় তারা প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ স্বর্ণপদক পেয়ে। তলহীন তাদের সহ্যধৈর্য, অসীম তাদের বুঝদারি। নারীত্বের বৈশিষ্ট্য আত্মত্যাগে, ও মাতৃত্বেই নারীত্বের চরম পূর্ণতা।"

উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বাল্যবিধবা কিশোরীকে জীবনে টিকে থাকার জন্য যে সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, রাধারাণী দত্তের গল্পের নায়িকারা ঠিক সেইভাবেই চলে।

ব্যতিক্রম মোটে দুটি-একটি। যেমন — 'যমের অরুচি' (১৩৩২) গল্পের অরক্ষণীয়া মেয়েটির সহ্যশক্তি শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। তীব্র অভিমানে সে গায়ে আগুন দেয়। সমাজের অন্যায় অবিচার ও নোংরামি, অবশ্য তাতেও থেমে থাকে না। আর 'হায়রে হৃদয় তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।' (১৩৩৪) - এই দীর্ঘ নামের ছোটগল্পটি একটি গরীব মেয়ের গল্প, রাণী নামটি যার জীবনে বিদ্রূপ হয়ে দাঁড়ায়। 'হা-ঘরের মেয়ের আবার এত রূপ কিসের!' জঠরাগ্নির জ্বালায় এবং অত্যাচারী স্বামীর প্রতি ঘৃণায় রাণীর সহ্যশক্তি ভেঙে পড়ে। সতীত্বের চেয়ে তার কাছে বেঁচে থাকাটাই জরুরি হয়ে ওঠে। রাধারাণী দত্তের ২২ বছর ও ২৪ বছর বয়সে লেখা এই গল্প দুটি আজও লেখা যেতে পারত। যে-অত্যাচারের ছবি এতে ফুটেছে, সেই অত্যাচার ১৪০৬-এ পৌঁছেও বন্ধ হয়নি। মেয়েদের এই অসহায়তার ছবি শুধু বাংলার নয়, এ ছবি সর্বভারতীয়।

যে-মেয়েটি পাশের বাড়িতে গানের রেওযাজ করে ('গতানুগতিক'— ১৩৩৯) , স্বামী তার প্রশংসা কবলে বৌ হঠাৎ মুখঝামটা দিয়ে ওঠে। তারও যে কুমারীকালে গানের অভ্যাস ছিল, সংগীতের প্রতি ভালোবাসা ছিল, কিন্তু সংসারের যাঁতাকলে তা পিষে গেছে স্বামীগৃহে এসে। স্বামীটির সে-বিষয়ে সচেতনতা পর্যন্ত নেই, স্ত্রীর বিরক্তির কারণ সে বুঝতে পারে না। বৌটি ক্ষুব্ধ হয়, কেননা সে জানে পাশের বাড়ীর কুমারী মেয়ের ভবিষ্যৎও একদিন তারই মতো এমনই বেসুরো হয়ে পড়বে।

'দাবি হারা' গল্পটি শৈলী ও থীম দু'দিক দিয়েই বিশিষ্ট। 'দাবি হারা'- তে প্রধান প্রশ্ন — 'নারীজীবনে রমণীত্ব আর মাতৃত্ব এই দুয়েব মধ্যে কোনটায় বেশি সার্থকতা, বলতে পারো?' — উত্তর গল্পের মধ্যেই নিহিত। মাতৃত্বে। সেটি স্থির করে দিয়েছেন অবশ্য পুরুষই। 'দাবি হারা' গল্পটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তার আঙ্গিকের জন্যও। রাধারাণী দত্ত এখানে ড্রামাটিক মনোলগ ব্যবহার করেন, তিনজন চরিত্রের মুখের কথায়(স্বগতোক্তি নয়, কথাবার্তা শোনার মানুষটির উপস্থিতি এখানে উহ্য আছে) গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে।

কাহিনী একাধিক সমস্যা ছুঁয়ে যায় — কিন্তু শুধু একটি আলোচনা করে। দ্বিতীয়বার বিবাহ করাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে এর দুটি চরিত্র-একজন নারী - যে দোজবরে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে, আরেকজন পুরুষ - যে দ্বিতীযবার বিবাহ করছে। দুজনেরই এই আদর্শ বিরুদ্ধ কাজ করবার কারণটি কিন্তু দেহউত্তীর্ণ, যৌনতা মুক্ত। একটি মাতৃহীন শিশুকে মা দিতে চাওয়া। বিবাহের পর এই তরুণীর জীবনের একটিই অর্থ, একটি মাতৃহীন শিশুকে মা দিতে চাওয়া। বিবাহের পর এই তরুণীর জীবনের একটিই অর্থ, একটিই উদ্দেশ্য দেখেছি - একটি মা-হারা পুরুষ শিশুর মা হওয়া। এর জন্য তাকে মূল্য দিতে হয় প্রচুর। স্বামী তার সঙ্গে পতি-পত্নীর সম্পর্ক স্থাপন করবেন না, কেননা মৃতা স্ত্রীর প্রতি তিনি চিরবিশ্বস্ত থাকতে চান। এজন্য তিনি কিঞ্চিৎ অপরাধী বোধ করছেন নববধূর প্রতি। আহা, নিরীহ মেয়েটিকে স্বামীসুখে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটি স্বার্থপরতা হচ্ছে। আশ্চর্য এই, যে সেই উদার মাতৃহৃদয় মেয়েটি কিন্তু কিছুই মনে করছে না! বরং এই 'মহৎ হৃদয়-দেবতার দাসী' হতে পেরেই সেই নারী ধন্য! - যে তেজস্বিনী রাধারাণীকে আমি দেখেছি, তাঁর সঙ্গে এই মনোবৃত্তির একটুও মিল পাই না। কিন্তু ছবিটা কেমন চেনাচেনা। দেখিনি, কিন্তু এর কথা আমি শুনেছি। সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েই যার সুখ ছিল। নিজের কথা ভাবতো না যে-মেয়ে।

'বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ' (১৩৩৮) একটি অন্যরকম মেয়ের কাহিনী। বাবা যাকে আদর করে বলনে 'পাগলি' আর মা অভিশাপ দেন, 'কপালে অনেক দুর্গতি আছে'। মেধাবী মেয়ে, জেদী মেয়ে, উচ্চাশী মেয়ে, সে চায়

লেখাপড়া করতে। তার চরিত্রের প্রধান দোষ : 'সব কিছুতেই পুরুষদের সমান হতে চাওয়া।'— সংসারে বাবা তাকে স্নেহ করলেও মায়ের মন ছিল তার প্রতি বিরূপ। মা অন্য বোনদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতেন। বিধিবদ্ধ ভাবনাচিন্তা ছিল যাদের।

মেয়েটি পডতে চেয়েছিল বলেই বুঝি তার পড়াশুনো বন্ধ করে দেয়া হল। সে বিয়ে করতে চায়নি বলেই তার বিয়ে হয়ে গেল অকস্মাৎ। এবং বৈধব্যও এল অতি অকস্মাৎ। ১৯১৬-র সেই প্রসিদ্ধ এশিয়াটিক ফ্লু-তে সেই মেয়ের স্বামীর মৃত্যু হলো। মাতৃসমা বিধবা গিন্নিদের কী প্রবল উৎসাহ, কিশোরীটির সধবার সাজ ভেঙে তাকে বিধবা সাজাতে।

এ গল্প অনেকখানি রাধারাণীর নিজের জীবনের প্রতিবিম্ব, তাঁর স্বামীও ঐ বছর এশিয়াটিক ফ্লু-তে মারা যান। গল্পটি একটি উচ্চাশী, স্বপ্নদর্শী, মেধাবী মেয়েব ভেঙে যাওয়ার, হেরে যাওয়ার। উদার এবং কোমল চিত্ত বাবার ইচ্ছে যেখানে পরিবারে দুর্বল, অকৃতকার্য। সনাতনপন্থী, কঠোর, এবং অনুদার মায়েরই ইচ্ছের জোর অনেক বেশী। অনেকগুলি ভাইবোনের মধ্যে এই জেদি মেয়েটি মায়ের অপ্রিয়। তাকে স্ববশে আনা যায় না। কিন্তু জীবন তাকে স্ব-বশে রাখলো। এতদিন তার জীবনে যা কিছু ঘটেছিল, মেয়েটি ভেবে দেখেছে, 'সবগুলিই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আপত্তি সত্ত্বে এসেছে। বৈধব্যের বোঝা ঘাড়ে নিতেই হল তাকে। এবার সে শুনছে এ বোঝা নাকি স্বয়ং ভগবানের মারফৎ এসেছে।' অতএব সেই পনেরো বছর বয়স্কা সদ্যবিধবা 'নির্জলা একাদশী হবিষ্যান্ন আহার শুরু করলে, মেঘের মতো চুলের রাশ নিঃশেষে কেটে ফেললে। পরনে রইল শুধু একখানি থানধুতি মাত্র। এবার সে তার ভাগ্যাপরীক্ষায় বদ্ধপরিকর। সে দেখতে চায় এবার কার ইচ্ছার জয়। নিজেকে নিষ্ঠুর দণ্ড দিয়ে মনে মনে হাসে আর ভাবে, এর কর্তা কে ? ভগবান না মানুষ ? জীবনটা আমার নিজের, সুখদুখঃ ভোগ করব আমি, অথচ এর নিয়ন্তা আর সকলে ! এর অর্থ কি ? আমার ভালোমন্দ শুভাশুভের দায়িত্ব আমার নিজের নেই কেন ? কিন্তু কিছুই বলে না, না ভালো, না মন্দ। কিন্তু এই পনেরো বছর বয়সেই সমস্ত অন্তর তার যেন কারুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়। সে মানুষই হোক - ভগবানই হোক - সমাজই হোক- নিয়তিই হোক।' — বিন্দুর মনের কথাগুলি আমাদের খুব চেনা মনে হয়।... কিন্তু সে জীবনের মধ্যেও যে ফাঁকি ছিল, করুণা ছিল, তার ছবিও আমরা পাই 'শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে' (১৩৩৯) গল্পে। সেখানে ফুটে উঠেছে এই দ্বিতীয় ছবিটি, যখন পরিবারের এই সচেতন সম্ভ্রম ও মমতার আড়ালে প্রবাহিত করুণা, কৃপার মধ্যে নিহিত অপমান নায়িকাকে স্পর্শ করে ফেলে। সে নিজের স্থানটি যথাযথ চিনতে পারে, বুঝতে পারে তাকে 'ভুলিয়ে রাখা' হয়েছিল, মিথ্যে মায়ার ঝুমঝুমি দিয়ে। গল্পের

নায়িকা বালবিধবা, কিন্তু ধনী পিতৃগৃহে সে প্রায় কুমারীর সাজসজ্জাতেই আছে। সংসারের সব কাজেই তাকে প্রয়োজন হয়, তার পরামর্শ তার অংশগ্রহণ অপরিহার্য। হঠাৎই একটি বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে তার বৈধব্যজনিত অশুচিতা উন্মোচিত হয়ে পড়ে, কোনো অতিথি আত্মীয়তার অন্যমনস্কতায়। চকিতেই মেয়েটির চৈতন্য উদয় হলো।— তার বিবাহিত জীবন বা বৈধব্য তার নিজের স্মরণে যদিও নেই-কিন্তু পরিবারের সকলেই তাকে বিধবা ছাড়া আর কিছু ভাবে না, তা সে যে-ছদ্মবেশেই থাকুক না কেন। এই সত্য তার সামনে সহসা উদঘাটিত হয়ে যেতে, সে স্বেচ্ছায় কুমারীর সাজসজ্জা ত্যাগ করে, বৈধব্যের নিরলঙ্কার রিক্ততার লক্ষণগুলি অঙ্গে ধারণ করল। যদিও বিবাহ ও বৈধব্য দুটিই তার কাছে সমান তাৎপর্যহীন। কিন্তু অন্যের কারুন্যের ছায়ায় বৈধব্যকে গোপন রাখতে কুমারীর ছদ্মবেশ ধরে থাকতে তার আর রুচি হল না।

১৩৩৪-এর কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত 'আলো - কোথায় ওরে আলো' – নামেই মনে পড়িয়ে দেয় ইবসেনের 'গোস্ট' নাটকের অন্তিম মুহূর্ত। গল্পটির বিষয়বস্তু : পিতার সিফিলিস রোগের কারণে সন্তানের অন্ধতা' স্বামীর অসংযত জীবনযাত্রার বিষময় ব্যাধির ফলে একটি মেয়ে পর-পর সন্তান হারাচ্ছে। রুগ্ন ছেলের অন্ধত্বের প্রকৃত কারণ জানতে পেরে, মায়ের অসহায় অপরাধবোধ। — গল্পটিতে সেই যন্ত্রণা, সেই আকুলতা তীব্র —'সে মূর্খ অশিক্ষিতা নারী, জননী হইবার উপযুক্ত দায়িত্বজ্ঞান যাহার নাই - সে জননী হইয়াছিল কোন ভরসায়? কোন্ স্পার্ধায়? স্বামীর আদরে সোহাগে সে অন্ধ হইয়াছিল'

'বিমাতা' (১৩৩১) গল্পের অনেকগুলি স্তর আছে—মাধুরী বালিকাবয়সে মাতৃহারা তপনের মা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিবাহের পরে সেই সম্পর্কটির দায় আর সে যথাযথভাবে বহন করতে পারে না - ছোটভাইটিকে কাছে এনে রাখার অনুমতি পায় না সে। বিবাহ হয়েছে দ্বিতীয় পক্ষে- এখানে একটি সৎ ছেলে আছে তার। শিশুটিকে মায়ের মতই ভালোবাসতে চায়। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে অন্যান্য আত্মীয়রা শিশুটিকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চায়। সৎমা কে বিশ্বাস করে না কেউ। উল্টে — ' তোর মা ও কেন হবে? তোর মাতো স্বর্গে গেছে' - এই কুপরামর্শ দিয়ে শিশুটিকে নিরাশ্রয় করে দেয়, মা-কেও দূরে সরিয়ে দেয়। পরিবারে বিমাতার যে চিরাচরিত নির্মম অত্যাচারীর ভূমিকা, মাধুরীর স্বভাব তাতে খাপ খায় না, কিন্তু তার প্রথা-ভাঙা চরিত্রটি সমাজ বুঝতেও রাজী নয়, মানতেও রাজী নয়। তাতে শিশুটিও কষ্ট পেলে পাক।

'পাতানো-মা' (১৩৩৫) -এর থীমটি ঘুরে ঘুরে আসে। নিতুর পাতানো মাকে নানা সামাজিক অপমান সহ্য করতে হয়-বামুনের ছেলে নিতু পাড়ায় সহায়সম্বলহীন তরুণী বিধবা কায়স্থবধূকে 'মা' ডাকলেই সে তার ছেলে হয়

নাকি? পাড়ার লোকের নানা কটূকথায় নিতু তার 'মা'কে সান্ত্বনা দিয়ে বলে— মা হওয়ার জন্য অনেক দুঃখ পোহাতে হয়। দশমাস গর্ভধারণ, প্রসবযন্ত্রণা, বুকের দুধ দিয়ে বড় করা-সেসব যেহেতু অনসূয়াকে করতে হয়নি নিতুর জন্যে, তার বদলে সামাজিক তাড়নার যন্ত্রণাটা সহ্য করেই সে নিতুকে পুত্র করে নিক। অন্তরের সম্পর্ক যতই গভীর হোক,সমাজের 'তাড়না' আছেই। 'সহ্য' করতে হবে। 'সুখ' নেই। এটাই নিয়তি।

'মাসী' (১৩৩৪) গল্পে আরেকটি আশ্চর্য সুন্দর সম্পর্ক দেখি। তরুণী বিধবা মাসীর মধ্যে মাতৃত্বের আত্মত্যাগের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এখানেও মূলমন্ত্র 'সহ্য', 'ত্যাগ'। সুখ নেই। মহত্ত্ব আছে। আর আছে ভালোবাসা। বড়ো ভালোবাসা, 'যা শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়।' রাধারাণীর গল্পে এই ভালোবাসার নানান রূপ দেখতে পাই।

'মা' গল্পটিতে (১৩৩৪) পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা চিরদিনই কেমনভাবে সন্তানদের ভুলত্রুটির জন্য স্বামীর কাছে দায়ী হয়ে এসেছেন, কর্তার গঞ্জনা সহ্য করেছেন (স্ত্রী-পুত্র সবাই তো কর্তার প্রজা!) — তার ছবি।

'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' (১৩৩৪) এবং 'অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' (১৩৩৪) গল্পদুটিতে নায়িকারা বিবাহিত না হলেও, সতী-সাধ্বী। একটিতে বাগ্দান ভেঙে গেছে, প্রেমিকার অসুস্থতার কারণে প্রেমিকের মনবদলের ফলে। কিন্তু প্রেমিকার মন তাতেও বদলায়নি। সে যক্ষারোগে মারা যাবার আগে তার উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিককে ক্ষমা করে যাচ্ছে। অন্যটিতে সুধার বাগ্দান ভেঙে গেছে, বিলেত থেকে ফেরার পথে তার বাগদত্ত স্বামীর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আকস্মিক মৃত্যুতে। সুধা নিজেকে বিধবা মনে করতে শুরু করেছে। জীবনে নতুন প্রেম এলে সে তাকে অনায়াসে ফিরিয়ে দেয়, পুরাতনের প্রতি বিশ্বস্ততায়। এখানেও মেয়েরা অসুখী, মহৎ। চির-নিঃসঙ্গ। একমুখী।

'পরম তৃষা' (১৩৩৫) গল্পের আদি, মধ্য, অন্ত শীর্ষক তিনটি ভাগ আছে, এবং 'দাবি-হারা'র মতো এখানেও সন্তানলোভকে কেন্দ্র করে তিনটি মানুষের সম্পর্ক। সন্তানহীনা সন্তানাকাঙ্ক্ষী সুভাষিণী জোর করে নিজের স্বামীর লজ্জাবোধ করে এবং সুভাকেই অভিযুক্ত করে - 'তুমি ছেলের লোভে চিত্রার কাছে স্বামীকে বিক্রি করনি?'

'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা' (১৩৩৫) একটি অদ্ভুত সংস্কারের গল্প।— যেখানে গভীর প্রেম এবং আর সবকিছু ঠিকঠাক হওয়া সত্ত্বেও কোষ্ঠী মিলল না বলে বিয়ে হয় না। মালতীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সন্তানের মা হবার পরেও, মৃত্যুকালে অচৈতন্য অবস্থায় সেই সধবা মালতী তার প্রথম প্রেমিককেই খোঁজে, তারই নাম ধরে ডাকে। সতীত্বের ধারণাটি এখানে প্রচলিত

ধারণার চেয়ে ভিন্নতর। এখানে সতীত্ব বিবাহনির্ভর নয়, বরং তার বিপরীতে। অন্তরের একটি গভীর সম্পর্কের প্রতি বিশ্বস্ততায় সতীত্বের পরিচয়।

'নিশীথ রাতের বাদলধারা' (১৩৩৪০ গল্পটির মূল্য অন্যত্র। গল্পের নায়ক এক মৃত্যুপথযাত্রী যক্ষ্মাগ্রস্ত উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পুরুষ, যে অবিকল পূর্ববর্তী গল্পগুলির নায়িকাদের মতোই আত্মত্যাগে মহান। তরুণী স্ত্রীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে দূরে সরিয়ে রাখছে, তার কৌমার্য অটুট রাখছে, এবং এমনভাবে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে যাতে সে অন্তর থেকেই মুক্তি পেতে পরে। লিখছেন মুসলমান দম্পত্তির গল্প, কিন্তু লেখিকার যেহেতু মুসলমান সমাজের সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই-কিশোরী নায়িকা আমিনা তাই হিন্দুমেয়েদের রুচি অনুকরণ করতে ভালোবাসে-এমন-কি ছোট সিঁদুর টিপ পরে পর্যন্ত। বারান্দায় বেলফুল ফুটলে তার মালা গেঁথে আনে স্বামীর জন্য, অবিকল অপরাজিতা দেবীর কবিতার প্রণয়িণী পত্নীদের মতো। আর রেগে গেলে বলে, ' মেয়েদের জীবন ক্ষণে ক্ষণে তো বদলায় না!' অসীম সংযমে, বিপুল আত্মত্যাগে, প্রবল যন্ত্রণায় পুরুষটি তার প্রেমের গভীরতা প্রমাণ করে। ভাষায়, ভাবে, কাহিনীতে মুসলমান সংস্কৃতির কোনো বৈশিষ্ঠ্য এখানে নেই বটে, তবু চরিত্রচয়নে মুসলমান দম্পত্তির কথা ভাবাটুকু মূল্যবান নিশ্চয়।

একটিমাত্র সুখী সধবা মেয়ের ছবি আছে 'ভাঁইফোঁটা' গল্পে (১৩৩৩)। বিবাহিত মেয়েটি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়িতে এসেছে ভাইফোঁটা দিতে৷ বাড়িতে স্বামী, শাশুড়ি আছেন, ফেরার তাড়া আছে, দাদা স্বদেশী করেন। ভাইবোনে খুনসুটির অপূর্ব মধুর সম্পর্ক। গল্পটি ড্রামাটিক মোনোলগ - মেয়েটির একার জবানবন্দীতে লেখা। অবিকল এই রচনাশৈলিই রাধারাণী দেবী ব্যবহার করেছিলেন তাঁর অপরাজিতা দেবীর কবিতাগুচ্ছে। এখানে যে কৌতুক, স্নেহ, ব্যস্ততায় উচ্ছল জীবনপ্রবাহ আছে, অপরাজিতায় সেই সুরটি ঝংকৃত। গল্পটিকে শব্দচিত্র বলাই উচিত, একটি যুগের মেয়েদের কথা ভারি সুন্দর ফুটেছে এখানে। সেলাই-ফোঁড়াই, আসন তৈরী, রান্নাবান্না, ঘর-গুছনো, শাশুড়ি-সেবা, আর বাপের বাড়ির জন্য মন-কেমনের ফাঁকে ঘরের মেয়েদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাবও দেখতে পাই — সংসারের কাজের মধ্যে চরকা কাটা, খাদির ধুতি-শাড়ি বোনাও রয়েছে।

বাঙালি মেয়ের জীবনের নানাধরনের সামাজিক বিড়ম্বনার সাক্ষ্য এই গল্পগুলিতে ধরা পড়েছে। এখানে আছে দোজবরে বিয়ে হবার একাধিক কাহিনী, সৎমায়েদের স্নেহের গল্প, জননী-না-হয়ে শুধু মাতৃস্থানীয়া হবার সামাজিক সমস্যা। অরক্ষণীয়া মেয়ের পরিবারের কথা, বিধবা তরুণীদের কাহিনী, সতীন-ঘর করার ছবি, বাগ্‌দান ভেঙে-যাওয়া মেয়েদেরগল্প, বন্ধ্যা নারীর অসহায় মাতৃস্নেহ - বিভিন্ন ধরণের মর্মস্পর্শী পরিস্থিতিতে বাঙালি মেয়েদেরজীবনযাপন

ফুটেছে এইসব গল্পে। বিদ্রোহ নেই,সামাজিক সমাধানও নেই. আছে শুধু সমস্যাগুলিব তীব্র, নগ্ন, অন্তর্ভেদী উপস্থাপনা। আর আছে. একটি বাঙালি বিধবা মেয়ের নিজস্ব চোখ।[৩৬]

দীর্ঘায়তন এই উদ্ধৃত অংশটি রাধারাণী দেবীর গল্প রচনার প্রেক্ষাপট ও তাঁর মানসগঠন কে স্পষ্ট কবে তুলেছে।

সংকলিত গ্রন্থ

কিশোর সাহিত্য : প্রথম ভাগ (১৩৪১ বঙ্গাব্দ)

রাধারাণী দেবী সম্পাদিত 'কিশোর সাহিত্য' প্রথম ভাগ (১৩৪১) ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির তৃতীয় শ্রেণীর দ্রুতপঠনের জন্য লিখিত হয়েছিল। 'ভূমিকা' অংশে বলেছিলেন যে- বিষয় নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ক্যারিকুলামকে অনুসরণ করা হয়েছিল। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের বয়সের স্বল্পতা বিবেচনা করে প্রকৃতি বিজ্ঞান ও জীবজন্তু বিষয়ক রচনাগুলি কথোপকথনের ছলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাতে এই সকল বিষয়ে ছাত্রদের কাছে কঠিন বা তিক্তবোধ না হয়ে বরং চিত্তাকর্ষক হয়। রচনাগুলির মধ্যে দিয়েও বিবিধ প্রকারের চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষা, যাতে সুকুমার মতি বালক বালিকাদের জীবন গঠনের ও মূল্যবোধের সহায়তা কবে, তার চেষ্টা করা হয়েছে। গল্পগুলি সমস্তই সদ্ভাবনামূলক ও নৈতিক শিক্ষাপ্রদ। এদের নতুনত্বের দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কিছু কিছু কৌতুককর গল্প ও কবিতাও সন্নিবেশিত হয়েছে। সংকলনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য যে এর ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। এই প্রসঙ্গে 'ডেভিড হেয়ার' রচনাটি ও 'রামসুক তেওয়ারী' কবিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

মোট রচনার সংখ্যা ২৪টি; তার মধ্যে গদ্য রচনা ১৩টি এবং পদ্য রচনা ১১টি। ভূমিকায় কবি বলেছেন :

কয়েকটি খ্যাতনামা কবির কবিতা এই বইখানিতে সঙ্কলিত হইয়াছে;" এবং " ছোট ছোট বালক-বালিকাদের পাঠ্যপুস্তক যাহাতে তাহাদের ভীতিপ্রদ না হইয়া প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছে।[৩৭]

কিশোর সাহিত্য : দ্বিতীয়ভাগ : (১৩৪১ বঙ্গাব্দ)

ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য সংকলিত কিশোর সাহিত্য দ্বিতীয় ভাগ ১৩৪১ সালে প্রকাশিত হয়। এর বিষয় নির্বাচনেও শিক্ষাবিভাগের ক্যারিকুলামের অনুসরণ করা

হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের চিত্তাকর্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি কথোপকথনের ছলে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গল্পগুলির দু'একটি পৌরাণিক, অধিকাংশই ঐতিহাসিক ও সত্যঘটনা মূলক। 'কোন বস্তুই তুচ্ছ নয়'— গল্পটি বৌদ্ধ জাতকের আখ্যানবিভাগের অনুসরণে রচিত। 'শুদ্ধকথা' শীর্ষক গল্পটি ছেলেমেয়েদের প্রীতিপ্রদ হবে অথচ এর মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুও যথেষ্ট আছে। 'বঙ্গমাতা' কবিতায় ছন্দ এবং কাব্যিক আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধের সমন্বয় ঘটেছিল। 'ভূমিকম্পের কারণ' ও 'নিদ্রাযন্ত্রের কাহিনী' শীর্ষক প্রবন্ধে বৈজ্ঞনিক বিষয়কে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা হয়েছিল। জগদ্বিখ্যাত বাঙালীদের নাম ও কীর্তি যাতে সরলমতি বালক বালিকাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে তার চেষ্টা করা হয়েছে। 'ব্যায়ামে বঙ্গবালিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে অরুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারীরিক শক্তি ও ব্যায়াম চর্চার কাহিনী বিবৃত করে বালিকাদের স্বাস্থ্যচর্চায় ব্যায়ামের-প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

এই গ্রন্থের রচনার মোট সংখ্যা পঁচিশ ; তার মধ্যে পদ্যরচনা দশটি এবং গদ্যরচনা পনেরোটি। ভূমিকায় কবি লিখছেন :

> *চরিত্রগঠনমূলক গল্প, জীবনী ও কবিতা এবং সাধারণ জ্ঞানমূলক বিষয়সমূহের সমাবেশে বইখানি যাহাতে সুকুমার মতি বালক বালিকাদের জীবনগঠনে সহায়ক হইতে পারে, তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি।*[৩৮]

এছাড়াও কিশোর সাহিত্য, তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪-এ। এবং ১৯৫৩ তে ইউ.এন.ধর থেকে প্রকাশিত হয় ''নীতি ও গল্প'' গ্রন্থটি।

গল্পের আলপনা :

একুশটি কিশোর পাঠ্য গল্প কাহিনীর সংকলন-'গল্পের আলপনা' ১৯৫৫ সালে (মহালয়া ১৩৬২) প্রকাশিত হয়। কিশোর মনে সাহস, রোমাঞ্চ, কৌতূহলের যে ইচ্ছা থাকে সেই ইচ্ছাকে কাজের মাধ্যমে ফলবতী করার অন্যতম প্রয়াস এই 'গল্পের আলপনা'। জীবনবোধ, শব্দচয়ন ও লেখনী কৌশলে এই গল্পগুলি অভিনবত্ব লাভ করেছে। এই গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল— এর চিত্রসূচী। আটটি সুন্দর চিত্রের মাধ্যমে গল্পগুলিকে চিত্রিত করা হয়েছে। সেইসময়ে কিশোর পাঠ্য গ্রন্থগুলিতে চিত্রাঙ্কনের যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল এটি তারই প্রতিফলন। এর মধ্যে 'তেপান্তরের মাঠ', 'সন্ন্যাসীর বিপদ' ও 'মায়াকানন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গদ্য রচনার নিদর্শন :

> *সকাল হয়ে গেল। সে বনে তো সূর্যের প্রবেশ নেই। বেলা দুই প্রহরে যখন বনের বাইরে প্রখর রৌদ্রে চারিদিক উজ্জ্বল — তখন বনের মধ্যে অল্প অল্প অস্পষ্ট আলো — সন্ধ্যার ম্লান ক্ষীণ আলোর মত।*

রাজা গাছ থেকে নেমে বনের বাইরে যাবার পথ খুঁজছেন — এমন সময়ে তার কানে ভেসে এল সেই নিবিড় বনের ভিতরে, বহুদূর থেকে মেয়েলি গলায় করুণ কান্না। রাজা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সে কান্না লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন। গভীরতর বনের মাঝ-মধ্যিখানে গিয়ে দেখতে পেলেন এক পরমাসুন্দরী কন্যা। একটি মস্ত বড় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা অবস্থায় খাড়া দাঁড়িয়ে করুণ স্বরে কাঁদছে। মেয়েটি অপূর্ব রূপসী। সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে হীরা, মোতি, মণি, পান্নার উজ্জ্বল অলংকার। মেয়েটির সেই কাতর কান্নায় বনের পশুপাখিরও প্রাণ গলে — মানুষেব তো কথাই নেই[৩৯] (মায়াকানন, পৃঃ — ১৩৯ ১৪০)।' উদ্ধৃত অংশটিতে ভাষা শৈলী ও বর্ণনা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করিযে দেয়।

গ্রন্থটি আশাপূর্ণা দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। সংক্ষিপ্ত অথচ বিশ্লেষনী একটি লেখায় উৎসর্গ-পত্রটি উজ্জ্বল, ব্যক্তিস্পর্শের ছোঁয়ায় মনোরম :

...পাকা মনের পুরু আড়ালে সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে কাঁচা মন। যেমন শৈশবে জাগ্রত হয় বিপুল কৌতূহলে, বিস্ময়ে আর আনন্দের প্রাবল্যে। বিশ্বকে প্রথম আস্বাদনের আর আবিষ্কারের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা যে মনের সম্পদ। আমরণকাল মানুষের মনের অন্তঃপুরে জীবন্ত থেকেও যে মন বাইরে বেরুতে লজ্জা পায়। তোমার শৈশব ও বাল্যের সেই গল্পাস্বাদী মনের কাছে এই গল্পের আলপনা এগিয়ে দিয়ে মহাকবির ভাষায় বলি, —

— দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পরো কিনা?"

তোমাদের বৌদিদি
রাধারাণী দেবী[৪০]

কিশোরপাঠ্য এই গল্প গ্রন্থে কোন পদ্যরচনা নেই, আছে মোট ২১টি গল্পকাহিনী। আর স্বতন্ত্র চিত্রসূচী সমেত মোট ৮টি ছবি। নিবেদন অংশে কবির বক্তব্যের কিয়দংশ :

... এর মধ্যে "প্রয়োজনীয় মূল্যবান বিষয়বস্তু" পাওয়া যাবে না। যা ওরা বড়ো হয়ে উঠবার অনেক আগে থেকেই আমরা আজকাল ওদের মনের ভাণ্ডার বোঝাই করে তুলবার চেষ্টা করি। এখানে আছে শুধু শিশুমনের স্বচ্ছন্দ কল্পনাবৃত্তিকে যেমন-খুসি উড়ে যেতে দেওয়ার মত অনেকখানি খোলা আকাশ। [৪১]

গ. প্রবন্ধ ও অন্যবিধ রচনা

বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকায় রচিত প্রবন্ধগুলিকে ভাগ করলে একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে রাধারাণী দেবীর রচনার মূল বিষয় নারী। তাই অধিকাংশ প্রবন্ধের শিরোনাম নারীকেন্দ্রিক। তাঁর নারী বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে 'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক না প্রসারক', 'নারীর ভালবাসা',

'নারী', 'সাহিত্যবিচারে পুরুষ নারী ভেদ', 'বাংলাদেশের মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', 'নারী প্রকৃতির বিবিধরূপ', 'বাংলা সাহিত্যে নারী: এক শতাব্দীর ইতিহাস', 'শিব ও শক্তি', 'আশাপূর্ণার লেখা', 'মহিলার জন্য মহিলার গল্প'।

রাধারাণী দেবীর প্রবন্ধগুলিকে ভালো করে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে-যদিও রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যগুরু, হয়তো বা সেই জন্যই, তাঁর লেখার পনেরো আনা জুড়ে আছে নারী। নারীর সামাজিক মূল্যায়ন ও তার সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত নারী-লেখনীর সাহিত্যিক মূল্যায়ন এ দুটিই তাঁর লেখাতে ফিরে এসেছে বারে বারে। আত্মসচেতন মহিলা বলেই তিনি কোন অবলা বান্ধবের অনুপ্রবেশে রাজী নন। আত্মমর্যাদার আলোকেই তাঁর প্রবন্ধগুলিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাঁর 'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক না প্রসারক' শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে। রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইন প্রণয়ন করা হল বটে কিন্তু সতীত্বের মতাদর্শের ভূত আমাদের চেতনার কাঁধে ভর করল। ধীরে ধীরে নারীর সতীত্ব বিশুদ্ধ ভারতীয়ত্বের প্রতীক হয়ে ধর্মের আবরণে নিজেকে আড়াল করে আমাদের মনোজগতকে অধিকার করল, যার জের টেনে চলেছি আমরা আজও, সামাজিক বিশুদ্ধাচরণের নামে মেয়েদের শিক্ষা ও মানবিক অধিকার লঙঘন করার মধ্য দিয়ে। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতার বনেদী ঘরের অন্তঃপুরের মধ্যে থেকে রাধারাণী দত্তের পক্ষে সতীত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করার প্রয়াস অসম সাহসিকতা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

'নারীর ভালবাসা' (১৩৩২) বিশ্লেষণে পেছপা হননি তিনি। নারী জীবনের পূর্ণতম বিকাশ ও সার্থকতা মাতৃত্বে। এই মাতৃত্ব জগতের যে সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করেছে তা কেবল সন্তান সৃষ্টির জন্য নয়; আত্মত্যাগ ও সত্য ভালবাসার জন্য। ধৈর্য্য, সংযম ও আত্মত্যাগ নারীর সহজাত বৃত্তি ও স্বভাবগত ধর্ম। নারীত্বের ক্রমবিকাশের সঙ্গে তা আপনিই ফুটে ওঠে। আত্মত্যাগই নারীজীবনের মূলমন্ত্র। তাই নারী যত আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ করতে পারে পুরুষ ত পারে না। অতএব Love is woman's existence.'

'অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে অন্তঃপুরের মেয়েদের চোখে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করা হয়েছে। সাধারণ পাঠিকাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কত আপনজন, মেয়েদের জীবন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি যে মেয়েদের কতদূর অন্তস্পর্শী— এই প্রবন্ধে তা আলোচিত হয়েছে।

> *বাংলার অন্তঃপুরিকারা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কমলের বর্ণ, আয়তন, ঔজ্জ্বল্য, তাঁর বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক বা দার্শনিক তথ্য ও তুলনামূলক আলোচনায় অনভিজ্ঞ। কারণ তারা এ-সকল দিকে কোনওদিন দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন অনুভব করেনি এবং এভাবে দেখবার, শক্তিও তাদের নেই। তারা কমলের মর্মপুটের মধুস্বাদে মাতোয়ারা হয়েছে, সুন্দর সৌরভে বিহ্বলা হয়েছে। তাদের*

কাউকে রবীন্দ্র-কাব্য-কমলের পরাগ-রেণুর পরিমাণ কিংবা পাপড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বা গঠন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে হতাশ হতে হবে। তারা কেবল এইটুকু মাত্রই প্রকাশ করতে পারবে যে রবীন্দ্রনাথের রচনা বড় সুমিষ্ট-বড় মধুর-বড়ই সুরভিময়"।[১২] —(অন্তঃপুরের রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ — ৮৩)

'ঘরে বাইরে'র রবীন্দ্রনাথ সমালোচনাটি রাধারাণী দেবী প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদেও পাঠ করেছিলেন। নতুন দৃষ্টিকোণের জন্য লেখাটি বহু প্রশংসিত হয়েছিল। সাহসী লেখা বলে খ্যাতিও পেয়েছিল। এখানে মেজোরাণীর চরিত্রের বিশ্লেষণটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"সাহিত্য বিচারে পুরুষ-নারী ভেদ" — ১৩৩৭ প্রবন্ধটি মুসলিম ইন্সটিটিউটে পাঠিত হয়। এর বিষয়বস্তু এখনও সমান জরুরী। বাংলা সাহিত্যের সমালোচকের চোখে নারী-পুরুষ সমান গুরুত্ব পান না। রাধারাণী দেবী বলেছেন জীবনের ক্ষেত্রে না হোক অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কি পুরুষের রচনা বৈশিষ্টের সঙ্গে নারীর রচনা — সমান আসন ও সমান মর্যাদা দাবী করতে পারবে না?

বাংলা সহিত্যে মেয়েদের অবদান নিয়ে দুটি লেখা 'বাংলা দেশে মহিলা -সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' — ১৩৩৮ এবং 'বাংলা সাহিত্যে নারী: এক শতাব্দীর ইতিহাস'— ১৩৪৪ এই দুটি থেকে বোঝা যায় কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুটি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করে তবে এই লেখাগুলি লিখেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্যে নারীর অবদানের এক শতাব্দীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন মেয়েদের সাহিত্য সাধনার যে পরিমাণ নিদর্শন তিনি পেয়েছেন , তাদের সাহিত্য-প্রতিভা নিদর্শন ততটা পাননি।

'শিবশক্তি' (১৩৪৮) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের মানুষ এখন দুটি খণ্ডে খণ্ডিত। একটি স্ত্রী জাতি যা মনুষ্য রুচির ও প্রয়োজনের ফলে তৈরী হয়েছে। এর থেকে বেশী গুরুত্ব তাদের আর নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন পুং মনুষ্য বা তথাকথিত পুরুষমানুষ। মনুষ্যত্ব-বোধ লাভের সর্বপ্রথম অধিকার লাভ করেও যারা মনুষ্যত্ববোধ বিস্মৃত। ভারতবর্ষের বিরাট নারীসমাজের মুক বধির পঙ্গু চেহারার দিকে তাকিয়ে শক্তি পূজার মহোৎসবকে প্রহসন বলে মনে হয়। যে নারীসমাজকে পদে পদে দলিত ও অত্যাচারিত হতে হচ্ছে, তাদের দেবী পূজার মাধ্যমে শক্তিরূপে কল্পনা করা নিছক ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়। আশাপূর্ণা দেবীর লেখা সম্বন্ধেও সঠিক মূল্যায়ন করেছিলেন (১৩৮১)। আশাপূর্ণার ট্রিলজি উপযুক্ত অনুবাদের মাধ্যমে যদি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করা যায় তাহলে তা কালোত্তীর্ণ হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল।

রবীন্দ্র সাহিত্য প্রসঙ্গে যে দুটি প্রবন্ধ (সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ) পাওয়া যাচ্ছে দুটিতেই দুই ধরণের নারীর ভালোবাসার বিশ্লেষণ আছে। শর্মিলা ও উর্মি, মেজরাণী

ও বিমলা (দুই বোন ও ঘরে বাইরে)— দুটি প্রবন্ধেই সে যুগে পাঠক সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

শরৎ-সাহিত্যের আলোচনাতেও (শরৎ সাহিত্যের মেরুদণ্ড — ১৩৪০) দেখতে পাই শরৎ-সাহিত্যের মেরুদণ্ড হচ্ছে নারী চরিত্র। তেজস্বিনী আত্মপ্রত্যয়শীলা, দৃঢ়চেতা নারীই শরৎ-সাহিত্যের আদর্শ নারী। এই হল রাধারাণীর মতামত।

শরৎচন্দ্র বিষয়ে তাঁর বক্তৃতামালাটি যখন 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত, তখন বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে লিখিত এই প্রবন্ধে রাধারাণী দেবী একটি অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করেন যে হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কখনও কোন সামাজিক বা আইনী বিবাহ সংগঠিত হয় নি। অথচ তিনি যে রোজ শরৎচন্দ্রের পাদোদক খেয়ে দিন শুরু করতেন সেই খবরও দিয়েছিলেন রাধারাণী। শরৎচন্দ্র তাকে জীবনসঙ্গিনী করলেও ধর্মপত্নী করেন নি। মৃত্যুর আগে উইল করে সম্পত্তির অধিকারিণী ও প্রকাশনার দায়িত্ব ন্যস্ত করে যান। এ সম্বন্ধে উইলের সাক্ষী হিসেবে বহু বিদগ্ধ জনের নাম করেছিলেন। এ মত নিয়ে সে সময়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। নানা ধরণের অপমানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে তিনি শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে কখনই এ সত্য প্রকাশ করবেন না। কিন্তু রাধারাণী-নরেন্দ্র দেবের মৃত্যুর পর ঐ সত্যটি প্রকাশের কোন যোগ্য লোক থাকবেন না বলে রাধারাণী সর্বসমক্ষে সত্যটি প্রকাশ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের এই স্বাভাবিক দুঃসাহস তিনি সর্বজন সমক্ষে আনার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন; প্রতিবাদে মুখর তর্জনী-শাসনকে ভয় করা উচিত বলে মনে করেননি। উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলি ছাড়াও একটি প্রশ্ন (জয়শ্রী ১৩৩৮), শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র, অতীতের এক টুকরো, পূজোর স্মৃতি, অতি সাম্প্রতিক কাব্যসাহিত্য, নিরুপমা দেবীর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ বার্তা, কবি রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নের রূপ মাধুর্য, আমাদের সমাজ ও সাহিত্য ও আমার শেষ কথা প্রভৃতি প্রবন্ধের মাধ্যমে রাধারাণী দেবীর প্রবন্ধ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গেও আমরা কবি অধ্যাপক নবনীতা দেব সেনের আলোচনার উল্লেখ করতে পারি :

> যে-সময়ে রাধারাণী দত্ত ছোটগল্পে একক নারীব অস্পূর্ণ জীবনচিত্র আঁকছেন বিভিন্ন দিক থেকে, সেই সময়ে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে তিনি তুলছেন সমাজে স্ত্রী-পুরুষের অবস্থান নিয়ে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে, নানান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 'কল্লোল' ১৩৩১-এ বেরুলো 'পুরুষ' নিবন্ধ, ১৩৩৩-এ 'নারী'। 'পুরুষ'-এর শুরু এবং সারা 'মা' মন্ত্রে। আর নারীর জগৎ জয় করার মন্ত্র 'আত্মত্যাগ'। গল্পগুলিতেও এই বাণীই পেয়েছি আমরা। এতে অবাক হবারও কিছু নেই। রাধারাণীর বালবিধবা-জীবনে সার্থকতার চাবিকাঠি ছিল আত্মত্যাগের মহিমায়।

রাধারাণী লিখছেন : 'পুরুষ ও নারী যাহার মধ্যে ভালোবাসার মূল অথা'ৎ আত্মত্যাগ অধিকতর, তিনিই ভালোবাসায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।' 'নারীর ভালোবাসার' (১৩৩২) প্রবন্ধে পুনরায় ঐ একই থীম। — 'নারীজীবনের পূর্ণতম বিকাশ, পরিণতি ও সার্থকতা মাতৃত্বে '...' ধৈর্য, সংযম ও আত্মত্যাগ নারীর সহজাত বৃত্তি বা স্বভাবগত ধর্ম।... আত্মত্যাগই নারীজীবনের মূলমন্ত্র, প্রধান অবলম্বন এবং শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। তাই নারী যত স্বার্থত্যাগ করিতে, আত্মত্যাগ করিতে বা ভালোবাসিতে পারেন, পুরুষ তা পারেন না।'

১৩৩১-এ তিনিই বির্তক জুড়েছিলেন 'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক' এই নামের প্রবন্ধে সতীত্ব শব্দের অর্থ, ও সতীর প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে ভাবনা প্রকাশ করে।—'যে বিধি হৃদয় ও মনকে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া নরকের বিভীষিকা ও সমাজের উৎপীড়নের ভয় দেখাইয়া ক্রমাগত নিজের অন্তরস্থ চিরমুক্ত স্বাধীন মানবাত্মাকে সঙ্কুচিত ও মৃতপ্রায় করিয়া তোলে, তাহা কোনদিনই জাতি ও সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না।

'শিব ও শক্তি' (১৩৪৮) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন— 'ভারতবর্ষের মানুষ এখন দুটি ভাগে বিখণ্ডিত। এক, — স্ত্রীজাতি, বা মনুষ্যবোধ-বিরহিত স্ত্রী-মনুষ্য; যারা পুং-মনুষ্যের রুচির ও প্রয়োজনের ফলে জীবন্ত পুতুল। এর বেশি কিছু নয়। দ্বিতীয়, পুং-মনুষ্য বা তথাকথিত পুরুষমানুষ। মনুষ্যত্ববোধ লাভের সর্বপ্রকার অধিকার লাভ করেও যারা মনুষ্যত্ববোধ বিস্মৃত। ...ভারতবর্ষের বিরাট নারীসমাজের মূক-বধির-পঙ্গু চেহারার পানে তাকিয়ে শক্তিপূজার মহোৎসবকে শোচনীয় পরিহাস বলেই মনে হয় নাকি? এই প্রশ্নটি আধুনিক ভারতীয় নারীবাদের অতি প্রিয় প্রশ্ন। শক্তিপূজার অন্তর্নিহিত আয়রনি। বাংলাসাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই অনুযোগ, 'সাহিত্য-বিচারে পুরুষ-নারী ভেদ' (১৩৩৭) প্রবন্ধে যে পুরুষ সমালোচকদের দৃষ্টিতে নারীর লেখা ধরাই দেয় না, যথার্থ গুরুত্ব পায় না, এ অনুযোগ আজও সত্য। রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনাতেও ('অন্তপুরে রবীন্দ্রনাথ'—১৩৩৫) উঠে আসে নারীচিত্ত ও নারীচরিত্র। 'মানসী'র কবিতাগুলি—বিশেষভাবে "বধূ"—ও 'পলাতকা'র "মুক্তি" কবিতাদুটি আলোচনা করে দেখিয়েছেন সেখানে বাঙালি মেয়ের অন্তরের সত্য গভীরভাবে প্রতিফলিত।

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রসঙ্গে আরও যে দুটি প্রবন্ধ পাচ্ছি, 'দুই বোন' ও 'ঘরে বাইরে' নিয়ে- দুটিতেই দুই ধরনের নারীর ভালোবাসার বিশ্লেষণ আছে-'শর্মিলা' ও 'উর্মি'; মেজরানী ও বিমলা। দুটি প্রবন্ধেই সেযুগে পাঠক-সমালোচকমহলে রীতিমতো সাড়া জাগিয়েছিল। এখনও তাদের গুরুত্ব যথেষ্ঠ। এখানে তাঁর রবীন্দ্র-সম্পর্কিত পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে তিনটির বিষয়বস্তুই নারী।

শরৎসাহিত্য আলোচনাতেও দেখতে পাই সেই একই নারীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি - 'শরৎসাহিত্যের মেরুদণ্ড' (১৩৪০)-'একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে শরৎসাহিত্যের মেরুদণ্ড হচ্ছে নারীচরিত্র।' এই নারীটি হলেন: 'একটি তেজস্বিনী, আত্মপ্রত্যয়শীলা, দৃঢ়চিত্তা, সুচরিতা'-ইনিই শরৎ-মানসী, শরৎসাহিত্যের আদর্শ নারী।

শরৎচন্দ্র -বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ এবং একটি বক্তৃতামালা। বক্তৃতামালাটি যখন 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো তখন রাধারাণী দেবী সত্য প্রকাশ করেন যে হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কখনো বিবাহ হয়নি। অথচ তিনি যে রোজ স্বামীর পাদোদক খেয়ে দিন শুরু করতেন, শরৎচন্দ্র তাকে জীবনসঙ্গিনী করলেও ধর্মপত্নী করেননি। এ নিয়ে প্রবল বাদানুবাদ হয়েছিল। নানা ধরনের অপমানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁদের মৃত্যুর পরে ঐ সত্যটি প্রকাশের যোগ্য মানুষ আর কেউ থাকবে না। শরৎচন্দ্রের এই সামাজিক দুঃসাহস তিনি সর্বজনসমক্ষে আনার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। সনাতনীদের তর্জনী শাসনকে ভয় করা উচিত বলে মনে করনেনি।" [৪৩]

শরৎচন্দ্র: জীবন ও সাহিত্য

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'শরৎচন্দ্র: জীবন ও সাহিত্য' (১৩৮২) বিশেষ বিতর্কের সূচনা করে। এই ধারাবাহিক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধ মহলে একটি বিশেষ ব্যাপারে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সেটি হল শরৎচন্দ্রের বিবাহ এবং তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। বিভিন্ন ব্যক্তি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রাধারাণী দেবীর মতকে খন্ডন করেন। ওই প্রবন্ধে রাধারাণী দেবী উল্লেখ করেছিলেন যে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেননি। হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বসবাস করতেন মাত্র। রাধারাণী দেবী লিখেছেন,

শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে কেউ কি শুনেছেন তিনি বিবাহ করেছেন? শরৎচন্দ্র কখনও কারও কাছে এ কথা উচ্চারণ করেন নি আমি জানি। এ বিষয়ে তিনি একান্ত কঠোর ও সতর্ক ছিলেন। বার্মায় তার বিবাহ হয়েছিল এবং একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল বলে যা প্রচারিত এবং স্বর্গীয় নরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' বইতে যে বিষয়ে তিনি লিখে গিয়েছেন, সে তথ্যটি শরৎচন্দ্রের নিজের মুখ থেকেই আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একত্রে শুনেছি। গোপাল বাবু তাঁর বইতে কেন যে লিখেছেন "নরেনবাবু বলেছিলেন শরৎচন্দ্রের-বিবাহ কাহিনী ও তার পুত্রের কাহিনীটিও আমি গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাছেই শুনেছিলাম। এখানে আমার বিস্ময় ঠেকেছে। এই কথাটিতো শরৎদারই নিজের মুখে নরেন্দ্র দেব ও আমার একত্রে শোনা। গোপালবাবুর হয়তো ভুল হয়ে থাকবে। আমার স্বামী যে কথা

শরৎচন্দ্রেরই মুখে শুনেছিলেন তা গিরিন সরকারের কাছে পেয়েছিলেন বলবেন কেন?[৪৭]

এই প্রবন্ধটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষজন দেশ পত্রিকায় সম্পাদকের কাছে চিঠি পাঠিয়ে এর প্রতিবাদ করতে থাকেন। এমন কি হিরণ্ময়ী দেবী সম্পর্কেও অনেক বাদানুবাদ চলতে থাতে। এবং এই সূত্রে শরৎচন্দ্রের উইল, তাঁব উকিল ও সাক্ষীদের— প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করবার প্রবণতা দেখা যায়। বিতর্ক যাই ঘটুক, এই লেখাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সমাজেও বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশায় হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন, কি করেন নি- তুমুল হট্টগোলের কারণ এটাই। যাঁরা জীবনীমূলক আলোচনায় আস্থা রাখেন না, তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে শরৎচন্দ্র বিবাহ করুন বা না করন তাতে কিছু আসে যায় না। সাহিত্যের তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু অপর পক্ষ বলেন— সাহিত্য ও জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একজন লেখককে ও তৎকালীন সমাজকে বুঝতে হলে লেখকের বিশেষতঃ সেই লেখকের রচনা যদি সামাজিক বিধি নিষেধ ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তবে সে সব ক্ষেত্রে তাঁর নিজের জীবনের তথ্যাদিও অতীত জরুরী হয়ে ওঠে। কেননা পাঠক লেখকের মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনের স্পর্শও পেতে চায়। তাই জীবন ও সাহিত্যকে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা থেকেই এই বিভ্রান্তি ঘটে। শরৎচন্দ্রে মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব ও প্রবণতা ছিল, ছিল বৈচিত্রও, তার প্রমাণ তাঁর নিজেরই গল্প-উপন্যাস। তা ছাড়া সমাজেব মধ্যমণি ও সমাজপতিদের তিনি ভালোই চিনতেন। তঁদের মুখ বন্ধ করার বিভিন্ন উপায় তিনি জানতেন। তাই বিবাহ বা সামাজিক বন্ধন সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ অভিজ্ঞতাই ছিল এর নজির তঁার লেখাতেই আছে। শরৎচন্দ্রে অনুরাগী পাঠকরা তাঁর জীবন ও সাহিত্য থেকে মূল সত্যটিকে উপলব্ধি করতে পারবেন, সেকথা এই ধারাবাহিক প্রবন্ধে লেখিকা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া শরৎচন্দ্রকে খুব কাছের মানুষ হিসেবে দেখার ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুলত: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতামালা(১৯৭০) উপলক্ষে ১৯৭৫-এ রামকৃষ্ণ মিশনের শিবানন্দ হলে রাধারাণীদেবী এই বক্তৃতা দেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বক্তৃতামালা উদ্বোধন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ঐ ১৯৭৫ কে বিশ্বনারীবর্ষ বলে চিহ্নিত করা হয়।

পরবর্তীকালে —

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর লেখা বই "শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য" "দেশ" পত্রিকায় ২৭ভাদ্র ১৩৮২ বঙ্গাব্দ হইতে ৮ই ফাল্গুন ১৩৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছে...[৪৫]

এর অল্পদিন পরেই "শরৎচন্দ্র: মানুষ এবং শিল্প" নামে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। পূর্ণেন্দু পত্রীকৃত প্রচ্ছদশোভিত গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ অকটোবর ১৯৭৬-এ। দ্বিতীয় মুদ্রণ-মার্চ ১৯৮০। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।

মুদ্রিত পুস্তকে সূচী ছিল; তাতে চারটি অধ্যায়ের উল্লেখ পাই— বন্ধনহীন গ্রন্থি, অদৃশ্য তর্জনী, শেষের পরিচয় এবং পরিশিষ্ট।

ঘ. রাধারাণী দেবীর রচনাসম্বলিত উপন্যাস

১) অষ্টমী — ২০১ পৃষ্ঠা সম্বলিত ৮ জন লেখকের লেখা আটটি অধ্যায়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। প্রত্যেকটি অধ্যয়ই লিখেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন ঔপন্যাসিক বা লেখকেরা। প্রথম অধ্যায়টি লিখেছিলেন নরেন্দ্র দেব। অন্যান্য লেখকেরা হলেন শচীন সেন, মৃণাল সর্বাধিকারী, রাধারাণী দেবী, প্রবোধকুমার সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আশালতা সিংহ ও অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল।

গ্রন্থটি কাত্যায়নী বুকষ্টল থেকে অগ্রহায়ণ ১৩৪২-এ প্রকাশিত হয়।

২) রসচক্র — কলিদাস রায় সম্পাদিত এই উপন্যাসটি ১৩৪৩ সনের ১১ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৯। এটি একটি বারোয়ারী উপন্যাস। 'রসচক্রে'র সদস্য দের দ্বারা পরিকল্পিত ও রচিত এই উপন্যাসটির নাম দেওয়া হয়েছিল "রসচক্র"। এর ১—৩১ পরিচ্ছেদের মধ্যে ৭—৮ পরিচ্ছেদ নরেন্দ্র দেব ও নবম পরিচ্ছেদ রাধারাণী দেবী লিখেছিলেন। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, মনোজ বসু, বিশ্বপতি চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৩) শেষের পরিচয় — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত ও অসমাপ্ত এই উপন্যাসটি রাধারাণী দেবী সম্পূর্ণ করেছিলেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১৪। শরৎচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর আগে উপন্যাসটির পঞ্চদশ অধ্যায় অবধি সমাপ্ত করে যেতে পেরেছিলেন। প্রকাশক তাঁর নিবেদন অংশে লিখেছেন—

> *শরৎচন্দ্রের আকস্মিক তিরোধানের পর শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে 'শেষের পরিচয়' শেষ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করি। কারণ শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার এই অসমাপ্ত রচনা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিবার সুযোগ ইনি লাভ করিয়াছিলেন।* [৪৬]

১৬—২৬ অধ্যায় রাধারাণী দেবী লিখে সম্পূর্ণ করেন। 'শেষের পরিচয়' লেখার পশ্চাৎ ইতিহাস বিষয়ে রাধারাণী দেবী তাঁর 'শরৎচন্দ্র মানুষ এবং শিল্প' গ্রন্থে বিষদ আলোচনা

করেছেন। "প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায় কেন যে উপেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবীদের মতন সে যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে নামী উপন্যাস লিখিয়েরা থাকতেও বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের এককালের ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিকেরা থাকতেও আমার মতন সামান্য ব্যক্তির উপরে এ ভার চাপিয়েছিলেন।... শরৎচন্দ্রে লোকান্তরের সপ্তাহ দুই পরে হরিদাস বাবু (প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়) আমাদের বাড়িতে এসে বলেছিলেন "রাধা, শরৎদার 'শেষের পরিচয়' শেষ করার ভার তোমাকে নিতে হবে।' আমি চমকে উঠেছিলুম। বলে ফেলেছিলুম অসম্ভব, 'একেবারেই অসম্ভব।' আমি কিছুতেই মনে ভরসা পাইনি। রাজীও হইনি। হরিদাস বাবু অবিচলিত অনড় ছিলেন তাঁর ইচ্ছায়। তিনি বলেছিলেন,— অত নার্ভাস হয়ো না।" শরৎদা রেগে গিয়ে গল্পের চরিত্রগুলোর মানে খুলে বলেছিলেন। তুমি শুনতে পেয়েছ তাঁর মুখেই। সেই কথাগুলো আগে মনে করে করে নোট লিখে ফেল। এইটেই সবচেয়ে জরুরী। আমার যে যে পয়েন্টগুলো মনে আছে বলে দিচ্ছ নোট করে রাখ। নরেনও তোমার পয়েন্ট নোট করে দেবেন। দেখ অন্য লেখকদের লিখতে দিলে তারা নিজের খুশীমত সিদ্ধান্ত চাপাবেন। সেটা ঠিক হবে না। 'আমি তবুও অনিচ্ছুক। আশঙ্কিত হয়ে বারবার বলেছি পারব না। শরৎদার বই শেষ করা অসম্ভব কথা। ... হরিদাস বাবু আমার আপত্তি কানেই তোলননেনি। যাবাব সময়ে বলে গেলেন, তাহলে ওই কথাটি রইল কিন্তু। তুমি একা মাসের মধ্যে আমাকে পুরো কপি দিয়ে দেবে। শুধু লক্ষ্য রেখ শরৎদার যত ফর্মা লেখা আছে তার চেয়ে তোমার ফর্মা যেন বেশী না হয়ে যায়। সমান সমান হলে চলবে, কম হলে আরও ভাল।"[৪৭] (শরৎচন্দ্র মানুষ ও শিল্প, পৃঃ — ১০৩ ও ১০৭—১০৮)

৪) **কবি-পরিচিতি** — প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্রপরিষদ থেকে কান্ত পাব্‌লিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত দুশো চার পৃষ্ঠার বইটি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক রচনার সংকলন। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিন উদ্‌যাপন প্রকাশিত গ্রন্থটির রাধারাণী দেবী—'ঘরে বাইরে' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (পৃষ্ঠা ১২৭-৪৪)। অন্যান্য লেখকরা হলেন প্রমথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ মৈত্র, নীহাররঞ্জন রায়, গিরিজা মুখোপাধ্যায় এবং মৈত্রেয়ী দেবী। এখানেই রবীন্দ্রনাথ একটি প্রদত্ত অভিভাষণ এবং সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি কবিতাও এখানে সংকলিত হয়েছে।

ঙ: নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত গ্রন্থ

১) কাব্য দীপালি— নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত কাব্য-দীপালি প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (১৯২৭); ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় সংস্করণ। এই গ্রন্থে বিভিন্ন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। বলা যায় বাংলা কাব্য জগতে—

নারী-পুরুষ যুগ্ম সম্পাদনায় এই প্রথম কাব্য সংকলন প্রকাশিত। বস্তুত এটি বাংলা সাহিত্যেব অনুরূপ দ্বিতীয় কাব্য সংকলন। এই কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্য জগতেএক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইঙ্গিত করে বহু সমালোচনা হয়েছে এবং এ বিষয়ে 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ও 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক জলধর সেনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের মধ্যে বিবাহ সংগঠিত হয়। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার সেই বিবাহ অনুষ্ঠামে সমালোচক জলধর সেন ও সজনীকান্ত দাস উপস্থিত ছিলেন।

এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা রাধারাণীকে পাই সহ-সম্পাদক রূপে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় রাধারাণী দেবী লিখেছেন :

> *...প্রথম সংস্করণে আমি যে সামান্য একটা সাহায্য করেছিলাম তাঁকে, সেটা তাঁর কাজে লাগায় তিনি আমাকেই এবাব তাঁর সহকাবী সম্পাদক করে নিযে অনেকদিন পরে দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিয়েছেন। (তাঁকে অর্থাৎ 'নরেন্দ্র দেবকে')*

এই অংশই এই সংস্করণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বেশ স্পষ্ট .

> *...আমরা এবার কাব্য-দীপালিতে যে-সব গীতি-কবিতা নির্বাচিত করে দিয়েছি তার অনেকগুলিই প্রেমাত্মক। দ্বিতীয় সংস্করণের কাব্য-দিপালিকে বাংলা ভাষায রবীন্দ্র যুগের শ্রেষ্ঠ নীতি-কবিতার সঙ্কলন বলা যেতে পারে।*

এ ছাড়াও জানিয়েছেন :

> *... প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ কবিতাই বর্জন করে সে স্থলে তৎ তৎ কবির নূতন নূতন কবিতা রচনা প্রথম সংস্করণে দিতে পারা যায়নি এবার তাঁদেরও অনেকের রচনা দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়েছে।*

অতঃপর রাধারাণী দেবীর বলিষ্ঠ বক্তব্যঃ

> *...বাংলা কাব্য-সাহিত্যের গত পঞ্চাশ বছরের পরিচয় এই সঙ্কলনের মধ্যে পাওয়া যাবে।*

এম.সি. সরকার এ্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে এগারো জন খ্যাতনামা শিল্পীর আঁকা মোট কুড়িটি ছবি আছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, যতীন্দ্রকুমার সেন, চারুচন্দ্র রায় প্রমুখ শিল্পীরা এই ছবিগুলো এঁকেছেন।

গ্রন্থটির লেখকসূচী সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

> *রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম লেখকের রচনা পর্যন্ত এ সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে।*[৮]

২) সোনার কাঠি— এই গ্রন্থে বিভিন্ন কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পের সংকলন করা হয়েছে। এই গ্রন্থটিও দেব-দম্পতির যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত। মূলতঃ কিশোর পাঠ্য রূপকথা ও কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলিকে একত্র সমাবেশিত করা হয়েছে। শুধু কিশোররাই নয় এ গল্পগুলি বড়দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই গ্রন্থটিও দেবদম্পতির যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত। গ্রন্থটি ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে দেব সাহিত্যকুটির থেকে প্রকাশিত হয়।

৩) কথা- শিল্প— এটিও একটি গল্প সংকলন; তবে বিদেশী গল্পের অনুকল্পে দেশীয় রীতিতে এই গল্পগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিশেষতঃ জাপানী ও রাশিয়ান গল্পগুলিকে বাংলা গল্পের অনুসরণে সংকলিত করা হয়েছে। দেবসম্পত্তির যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ "কথা শিল্প।" প্রতিষ্ঠিত রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানির সক্রিয় উদ্যোগ ও উৎসাহে ১৯৪৫-এ এটি প্রকাশিত হয়। এর লেখকসূচীতে আছেন- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুবোধ বসু, বাণী রায় এবং অশাপূর্ণাদেবী। এই সংকলনের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে পুরষ্কৃত হয়েছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিহাস' গল্পটি।

দেবদম্পতি রচিত 'কৈফিয়ৎ (ভূমিকা) অংশ থেকে উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি ঃ

'... প্রত্যেক গল্পের জন্য একশতটাকা প্রণামী অর্থাৎ তদানীন্তন প্রচলিত দক্ষিণার চতুর্গুণ বেশি দিয়ে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পের জন্য অতিরিক্ত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে এই 'কথাশিল্পি' গ্রন্থখানি প্রকাশের সংকল্প হয়।

... 'কথাশিল্প' প্রকাশে বহু বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় বইখানি প্রকাশে বিলম্ব হয়ে গেল এবং অপ্রত্যাশিত বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কাজ করার ফলে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতিও রয়ে গেল। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ দেশের অবস্থা বুঝে নিজগুণে সকল ত্রুটি মার্জনা করবেন। —১৫ই আশ্বিন, ১৩৫৩

চ অন্যের লেখা গ্রন্থের ভূমিকা রচনা

১) আকাশ-পথের যাত্রী : সুষমা মিত্র — ১৯৫১ তে প্রকাশিত এই গ্রন্থে মহাকাশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের ভূমিকায় রাধারাণী দেবী এই জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। ভাষায় ও ভাবে যথার্থ এই ভূমিকাটিএই গ্রন্থের উৎকর্ষতাকে ও গুরুত্বকে যথেষ্ট সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছে।

২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : রজনী — ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাধারাণী দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে এবং উপন্যাসের রূপ ও রীতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান ও দান নির্ধারণের সযত্ন প্রয়াস এ গ্রন্থেব মৌল উদ্দেশ্য।

৩) বসন্তের লিপি ঃ অমিয় কুমার মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। ১৯৫১ তে প্রকাশিত এই প্রেম-গীতিকাব্য-সংকলনে প্রেম-বিষযক গী৷তিকবিতাই স্থান পেয়েছে। মোট কবিতার সংখ্যা একাত্তর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস,জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস থেকে শুরু করে আধুনিক কবিদের কবিতাও এতে ছিল। চুরাশি পৃষ্ঠা সম্বলিত এই সংকলন গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেন রাধারাণী দেবী।

৪) ইউ. এন. ধর প্রকাশিত 'নীতি ও গল্প' নামের গল্প সংগ্রহের ভূমিকা লিখেছিলেন রাধারাণী দেবী।

ছ. চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ এবং রাধারাণী দেবী এবং অন্যান্য

শান্তিকেতন

কল্যাণীয়া রাধারাণী

তুমি যে সমস্যার কথা আমার কাছে উত্থাপন করেচ, তার গ্রন্থি ত আপনিই খুলে গেছে। জটিলতা কিছুই নেই। মেলবার বাধা কোন পথেই দেখচিনে। সংসারের দিকেও গণ্ডী গেছে মুছে। বাকী যে কথাটা আছে সেটা এক হিসেবে সামান্য আর এক হিসেবে গুরুতর। যেমন ভূতের ভয় ; ভূতটা অবাস্তব বলেই ভয়টা এত শক্ত।

দেহের চিরকৌমার্যকে পবিত্র বলে একটা বানানো কথা আছে। প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটলে তাকে দমন করায় পুণ্য আছে। কিন্তু তার অভাবটা হয় শরীরের নয়, মনের অপরিণতির লক্ষণ। কোন কোন গাছের ফল ধরানো নিরুদ্ধ করে তার ফুল ফোটানোর তেজ বাড়ানো যায়। তাই বলে, যে গাছ স্বতই অফলা, সেই গাছই যে পবিত্র, একথা একেবারে অশ্রদ্ধেয়। বিশেষ কোন ব্রত পালনের তাগিদে পুরুষ কিংবা মেয়েকে কৌমার্য স্বীকার করতে হয়। কিন্তু যেখানে তাগিদ নেই, সেখানে অকারণ ব্রহ্মচর্য্য, রোগের মতই অবাঞ্ছনীয় ত্রুটি রোগে আহারের ক্ষুধা থাকে না। সেই অভাব ক্ষুধার শুচিতা নয়, তার বিপরীত। দরকার হলে উপবাসে মৃত্যু স্বীকার করে মনের তেজ দেখাতে পারি। কিন্তু আহারের স্বাভাবিক ক্ষুধাটাকে যদি গাল দিয়ে কেউ উপবাস করে তবে তাকে সুস্থ প্রকৃতির মানুষ বলে গণ্য করা চলবে না। স্বভাব- নির্দ্দিষ্ট সব প্রবৃত্তিই তার স্বস্থানে সুন্দর ও পবিত্র স্বভাবের সীমা পেরোলেই অশুচি। মানুষ আপন কল্পনার জোরে স্বাভাবিক প্রকৃতিকে অস্বাভাবিক করে বাড়িয়ে তোলে — পশুরা প্রায় তা করে না। প্রকৃতি আপন কাজ উদ্ধারের জন্য যেখানে কিছু পরিমাণ চিনির লোভ দেখিয়েছেন

মানুষ সেখান থেকে সেই চিনিটিকে ছেঁকে নিয়ে তাকে মদ করে বানিয়েচে। নিন্দে এই অস্বাস্থ্যকর অনাবশ্যকমাতলামিকে নিয়ে — চিনির ভোগ নিযে নয়। ভাইবোনের সম্পর্ককে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক কবে তোলা তেমনই অপরাধ। অবশ্য শরীরের মধ্যেই যাদি কোন অনিবার্য্য বাধা যাকে এবং সেই বাধাবশতই যদি দেহের স্বাবাভিক ক্ষুধা দুর্বল হয়ে থাকে তবে সে অন্য কথা। কিন্তু ক্ষুধার একান্ত অভাবকে কিংবা অকারণেই তাকে দমন করাকে কেউ যেন শুচিতার লক্ষণ বলে গৌরব না করে।

কাল রবিবারে কলকাতায় যাচ্ছি দার্জিলিঙয়ের পথে। যদি দেখা হয় বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। শনিবার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

ইতি

জ্বরাভিভূত শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৪১]

ব্যবহারিক ও বিবাহসূত্রে রাধারাণী দেবী ওরফে অপরাজিতা লেখিকা হওয়ার সুবাদে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও লেখক লেকিকার সংস্পর্শে এসেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের আদান প্রদান ছিল। সেই চিঠিপত্রগুলিকে সাহিত্যিক সংজ্ঞায় উত্তরণ করা যায়। তাঁর সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান প্রদানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল, গৌরী আইয়ুব, সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চত্রবর্ত্তী, দিলীপ কুমার রায়, শান্তিচন্দ্র ঘোষ, অমিয় চক্রবর্ত্তী, প্রবোধকুমার সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নিরুপমাদেবী, অনুরূপা দেবী প্রভৃতির যোগাযোগ ছিল। অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল জলধর সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী রায়, প্রমথনাথ চৌধুরী, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রফুল্ল কুমার সরকার, অসিত কুমার হালদার, অমল হোম, অন্নদাশঙ্কর রায়, ভুপতি চৌধুরী, শামসুন নাহার, সুফিয়া কামাল, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, বিমলচন্দ ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ—এঁদের নাম অবশ্যই উল্লেখ করা যায়। তারই মধ্যে নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী কিঞ্চৎ রক্ষণশীল হলেও আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনে কুণ্ঠিত হন নি। এই যোগাযোগ নিছক সাহিত্যিক যোগাযোগ না হয়ে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথাতেও সুন্দর পারিবারিক চিঠি হযে উঠেছে। অনুরূপা দেবীর একটি চিঠি উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

শ্রীমতি অনুরূপ দেবী
সম্পাদিকা "এডুকেশন গেজেট"

১৯এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
শ্যামবাজার, পো: কলিকাতা,
৩১শে আষাঢ়

কল্যাণীয়াসু,

তোমার হাঁপানির সংবাদে বিশেষ দুঃখিত। একটি মাদুলী দিলাম, যদি ইচ্ছা হয় মঙ্গলবার বা শনিবার প্রাতে শুচিবস্ত্রে লাল সুতায় গলায় পরিবে। পরিবার সময় কালীমাতার জন্য কিছু

পূজা তুলিয়া রাখিবে ও প্রত্যহ প্রাতে কালিমাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া মাদুলীটি ধুইয়া জল খাইতে হইবে। মাদুলীটি বুকের উপর থাকিবে। আঁতুড়ের বা শ্মশানের ধোঁয়া লাগিতে না পায়। (বিশেষ প্রয়োজন হইলে মাদুলি খুলিয়া রাখা চলিবে। আশীর্ব্বাদ লইও।)

আশীর্ব্বাদিকা
শ্রীমতি অনুরূপা দেবী

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর লেখা এই চিঠিটিতে রাধারাণী দেবী এবং অন্যান্য মহিলা কবি সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয় তা খুবই যুগোপযোগী ও যথার্থ বলে মনে হয়।

১৩৪, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট্
কলিকাতা
২০/১১/৩০

অপরাজিতা দেবী,
এই সংখ্যায় 'ভারতবর্ষে' আপনার কবিতাটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কবিতাটির শেষে আপনি যে personal touch দিয়েছেন আরও ভাল লাগল সেইজন্যেও। কবিতাটির মধ্যে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করার যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় আপনি দিয়েছেন তা চমৎকার। দু-তিন সপ্তাহ আগে বিজলীতেও আপনার একটি সম্পূর্ণ কবিতা আমি পড়েছি। আপনি, রাধারাণী দত্ত ও আরও দু একজন মহিলা কবির রচনা পড়ে বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে আমার মনে হয়। আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ইতি শিবরাম চক্রবর্ত্তী[১]

(অপরাজিতা দেবী-র ''নিশীথ কলহ'' প্রকাশিত হয়েছিল ''ভারতবর্ষ'' পত্রিকায়)

জ. সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাবলী

১) জয়শ্রী, প্রবাসী ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, শনিবারের চিঠি প্রভৃতি সাময়িক পত্র পত্রিকায় রচিত বিভিন্ন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও সমালোচনায় লেখিকার ব্যক্তিত্ব ও সত্তার পরিচয় দেয়। প্রবাসী ১২২৮ এ প্রকাশিত (একটি প্রশ্ন) ১২২৮, জয়শ্রী ও প্রবাসী উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত — 'বাংলাদেশের মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।' ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যে নারী', প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেবতা' কবিতা; এছাড়া অসংখ্য প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। মুখ্যতঃ সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমেই রাধারাণী দেবী সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্ত্তীকালে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা ঘটে তার যে সূচনা এই সাময়িক পত্রিকাগুলির মাধ্যমেই ঘটেছিল। তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধের

বেশীর ভাগ প্রবাসী ও ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি প্রবাসী ও মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'সাহিত্যবিচারে পুরুষ-নারী ভেদ' — প্রবন্ধটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ফাল্গুন, ১৩৩৭-এ প্রকাশিত। ২৫শে জানুয়ারি কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের সারস্বত সম্মেলন সভায় পঠিত হয়েছিল।

২) 'সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ' সংকলন গ্রন্থে 'ঘরে বাইরে' নামে কুড়ি পাতার একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি পাঠকালীন সময়ে নাম ছিল— "প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নের রূপ-মাধুর্য"। প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র পরিষদ -রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক এই প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করে। এই সংকলনের অপরাপর লেখক-লেখিকা হলেন — প্রমথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ মৈত্র, নীহাররঞ্জন রায়, গিরিজা মুখোপাধ্যায় এবং মৈত্রেয়ী দেবী। সমকালীন সাহিত্য স্রষ্টাদের সংগে শুধুই এক ব্যাপক ব্যক্তিগত যোগাযোগ নয় বরং সাহিত্য জগৎ ও সমালোচনা জগৎ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার কত সমৃদ্ধ ছিল, এই সংকলন গ্রন্থে, 'ঘরে বাইরে' প্রবন্ধ থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়। সমালোচনা শুধু বিরূপতা নয় বরং যথার্থ সমালোচক লেখকদের ব্যক্তিসত্তা ও লেখকসত্তার মধ্যে যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দ্দেশ করে এই প্রবন্ধের সমালোচনা তা প্রমাণ করে।

৩) " 'শরৎ বন্দনা' গ্রন্থের 'শরৎ সাহিত্যে বাৎসল্যরস" — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাতান্নতম জন্ম দিবস উপলক্ষে (১৯৩২) প্রকাশিত ও নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত 'শরৎ বন্দনা' গ্রন্থের অন্তর্গত "শরৎ সাহিত্যে বাৎসল্যরস" রাধারাণী দেবীর নিজস্ব রচনা। শরৎ সাহিত্যের একটি বিশেষ ও জনপ্রিয় দিক হল বাৎসল্য রস। এই রসকে কেন্দ্র করেই শরৎ সাহিত্যের মাতা, কন্যা, জায়া, প্রেমিকা ও পুত্রের সম্বন্ধ আবর্তিত হতে থাকে। রামের সুমতির নারায়ণী, শ্রীকান্তর রাজলক্ষ্মী, অন্নদা দিদি, বিন্দুর ছেলের বিন্দু, শেষের পরিচয়ের সবিতা, পল্লীসমাজের জেঠাইমা, গৃহদাহের পুঁটি, দেবদাসের পার্বতী, প্রভৃতি চরিত্রগুলি চিরন্তনী বাৎস্যল রসের পরিচায়ক। শুধু মাতৃ-হৃদয়ই নয়। সমাজ ও সংসারের বিভিন্ন সম্পর্কের নারী চরিত্রের মধ্যেই যে মাতৃহৃদয় সুপ্ত থাকে তাকে রাধারাণী দেবী শরৎ সাহিত্যের মধ্যে থেকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন।

ঝ. অপরাজিতা রচনাবলী
সম্পাদক: নবনীতা দেবসেন

এই গ্রন্থটি 'বুকের বীণা', 'আঙিনার ফুল', 'পুরবাসিনী' এবং 'বিচিত্ররূপিনী' কাব্য গ্রন্থসমূহের সংকলন। নবনীতা দেবসেনের দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলনটিকে স্বতন্ত্র

মূল্য দান করেছে। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা — পূর্ণেন্দু পত্রীর। অপরাজিতা দেবীই যে রাধারাণী দেবী — এই পরিচয় লেখিকা নিজে স্বেচ্ছায় দীর্ঘ বারো বছর গোপন করে রেখেছিলেন। দ্বাদশবর্ষ, বোধ করি, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কালসীমাকে মনে রেখে। প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখার ফলে নিজেকে নাতনীর সাজে সাজান। আর তার, চিঠির জবাব দিতে গিয়ে — রবীন্দ্রনাথ শুধু দাদু হয়েই ওঠেন না, তাঁকে অপরাজিতা পরিচয়ে দাঁড়াতে হয়। প্রবাসিনী কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আধুনিকা' এবং চতুর্থ কবিতা 'গরবিণী' অপরাজিতার উদ্দেশ্যেই রচিত। এই অপরাজিতা যে রাধারাণীর প্রিয় বান্ধবী নন, বরং স্বয়ং রাধারাণী সে কথা কবি নিজে জেনে যাননি। জানাবার বিষয়ে প্রধান অসুবিধার মূল কারণটি কিন্তু রাধারাণী নিজেই।

'পুরবাসিনী' কাব্যটির উৎসর্গপত্র নিম্নরূপ : রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের করকমলে। আর তাই এই সমস্যা। আসল কথাটা তুলেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে —

"মেয়েরা ভালো লিখলেও তাদের লেখায় নাকি
স্বকীয়তার ছাপ ফুটে ওঠে না।"

এই কথাবার্তার পর দর্পিকা রাধারাণী 'লীলাকমলের' বদলে 'বুকের বীণায়' দিলেন ঝংকার। অপরাজিতার ছদ্মবেশ ধরে পাঠক-পাঠিকাদের আনকোরা শব্দসমূহের নতুন উপহার দিলেন। রাধারাণী আর অপরাজিতায় আর কোনও অমিল রইল না। নতুন স্বাদের কবিতায় অপরাজিতার জয়-জয়কার পড়ে গেল। 'বুকের বীণার' পর 'আঙিনার ফুল' (১৯৩৪), 'পুরবাসিনী' (১৯৩৫) ও 'বিচিত্ররূপিণী' (১৯৩৭) — প্রকাশিত হোল। কিন্তু তারপরই হঠাৎ অপরাজিতার প্রস্থান এবং অন্তর্ধান — বাংলার কাব্যমালঞ্চ থেকে। বাংলা কাব্য জগতে অপরাজিতা দেবীর প্রবেশ ও প্রস্থান — দুটিই আকস্মিক ও নাটকীয়। এই আকস্মিকতাই অপরাজিতা দেবীকে সেদিনের তরুণ পাঠক সমাজের কাছে স্মরণীয় করে রেখেছে।

ঞ. রাধারাণী দেবী-অপরাজিতা দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ

এই রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য অংশ সংযোজন — শিরোনামটি; অপরাজিতা লিখেছিলেন — 'নারীপ্রগতি', তার জবাব দিলেন রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিকা' লিখে। নাতনির পত্র ও দাদুর উত্তর — উভয়ই কবিতায়; অথবা বলা যায় — রাধারাণী ও অপরাজিতাকে লেখা কবির ছন্দবদ্ধ পত্র এবং বিষটিএই রচনাবলীর মর্যাদা অবশ্যই বহুল পরিমাণে বাড়িয়েছে। একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি বিষয়টির পূর্বাপর ঘটনাকে যেমন স্পষ্ট করবে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাধারাণী দেবীর অন্তরঙ্গ স্নেহের সম্পর্কটিকেও তেমনি আমরা উপলব্ধি করতে পারব :

"... 'বুকের বীণা' উপহার পেয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই অজ্ঞাতপরিচয় কবিকে প্রথম যে চিঠিখানি লিখেছিলেন - তা সমগ্রভাবেই উদ্ধার করছি --

কল্যাণীয়াসু,
তোমার কবিতাগুলি পড়ে দেখলুম। ভালো লাগল। তোমার রচনার ভাষা ভঙ্গী তোমার স্বকীয় পন্থা অবলম্বন করেছে, অথচ তার স্খলন হয়নি! আমার কেবল একটা কথা বলবার আছে। এইরকম কবিতাকে ইংরেজিতে বলে সোসাইটি ভার্সেস। এদের নৈপুণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প। চলমান স্রোতের উপর যে রঙীন ছায়া আকাশের চলমান মেঘের অনুবর্তন করে ভেসে চলে যায়, কোনো চিহ্ন রাখে না এবং তলায় গিয়ে পৌঁছায় না, এও সেইরকম। নিকুঞ্জে পাখিও আছে রঙীন পাখার পতঙ্গমও আছে — কিন্তু যদি কেবল পতঙ্গম থাকে পাখি না থাকে তাহলে অভাব থেকে যায়। তোমার কাব্যে প্রজাপতি দেখা দিয়েছে, তাদের পাখার লীলা দেখলুম, কিন্তু পাখির গানও শুনতে চাই। যারা তোমার কবিতার অশ্লীলতার অপবাদ দিয়েছে, তাদের কথায় কান দিয়ো না। তাদের মন অশুচি। কাব্যরচনা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার মতো কোনো অপরাধ তুমি করোনি। যে সহজশক্তি তোমার আছে তা নিয়ে তুমি গৌরব করতে পারো।...

দ্বিতীয় পত্র :

আমার মনে পড়েছে তোমার বইখানি যখন আমার হাতে এল, তখন সংযত সতর্ক ভাষায় প্রশংসার একটুখানি আভাসমাত্র দিয়েছিলাম। যারা বিজ্ঞলোক, তারা হাতে রেখে কথা বলে। যদি সব কথা পুরোপুরি বলতুম তাহলে তোমার অহংকার হত। তুমি আমার সমব্যবসায়ী, সেই জন্যে তোমাকে প্রশ্রয় দিতে সাহস হলো না, কী জানি কোন দিন হয়ত বলে বসবে যে — থাক সে কথা।
"আমার বলবার ইচ্ছে ছিল, তোমার লেখার যে-ভঙ্গী, যে-রঙ্গ, যে-কটাক্ষ, হাসির কলকল্লোল, ভাষার যে বিচিত্র নাট্যলীলা, বাংলা-সাহিত্যে আর-কারো কলমে সেটা চঞ্চল হয়ে ওঠেনি। দুষ্ট ঘোড়ার মত ওর অবারিত চাল, অথচ খানা-ডোবাগুলো পার হয়ে যায় এক এক লাফে। কারো বলবার যো নেই তোমার হাসি আর কারো হাসির মতো, তোমার গলার সুর আর করো সুরে সাধা।

তৃতীয় পত্র ('আঙিনার ফুল'-উপহার পেয়ে) :

তোমার লেখনীর একটি স্বকীয় চেহারা আছে, তার ছবি আঁকা চলে। পাহাড়ে ছোট নদীতে নতুন বর্ষার বান নামলে নুড়ি ঠেলে ঠেলে জলের ধারা যেমন কলকল করে টগবগ করে ছোটে, তেমনি তার কলভাষা, তার উচ্চহাসি, তার প্রাণের উদ্বেলতা। তোমার বাণীতে তোমার নিজের স্বর খুবই সুস্পষ্ট।...

চতুর্থ পত্র :

... ১৩৪০ সালের বিজয়া-দশমীতে লেখা এই পত্রের পরে অপপাজিতার শেষ দু-খানি কাব্যগ্রন্থ 'পুরবাসিনী' এবং 'বিচিত্ররূপিণী' প্রকাশিত হয়েছে। আত্মপরিচয় গোপন করবার জন্য কবি 'পুরবাসিনী'কে উৎসর্গ করলেন 'রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের করকমলে'। বই দুখানি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ চতুর্থ পত্রে ৩০.০৩.৩৭ তারিখে লিখছেন —

> *তোমার নতুন দুখানি বই পেলুম। মেয়েদের সংসারের উপরিতলে যে আলোর ঝলক চমক খেলে, যে-সব ছায়ার আভাস ভেসে চলে যায়, তারই ধ্বনি ও ছবি আশ্চর্য সহজ নৈপুণ্যে তোমার রচনার মধ্যে লীলায়িত হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এই রঙ্গিমা ও ভঙ্গিমা অপূর্ব। তোমার ভাষার সঙ্গে তোমার লেখনীর পরিহাসকুশল সখীত্ব দেখে বিস্ময় লাগে।*

'কবিগুরুর এই পত্রচতুষ্টয়ের ভাষা একটু তুলনামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, তাঁর সপ্রশংস স্বীকৃতি নব-নব বিশেষণ রচনা করে এই অজানা কবিকে অভিনন্দিত করেছে। অপরাজিতা দেবীর সমস্ত রচনাই তাঁর অভিন্নহৃদয় বান্ধবী রাধারাণী দেবীর হাত দিয়ে সাহিত্য সমাজে পরিবেশিত হত। রাধারাণী দেবীই যে অপরাজিতা দেবী, এ-কথা রবীন্দ্রনাথও মর্ত্য থেকে বিদায় নেওয়ার আগে জেনে যেতে পারেননি।'

'১৩৪১ সালের মাঘ মাসে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথেব 'নারী-প্রগতি' নামক কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তার উত্তরে অপরাজিতা দেবীকে তাঁরই ব্যবহৃত ছন্দে উত্তব লিখে পাঠান। 'প্রহাসিনী'র 'আধুনিকা' কবিতাটি তারই প্রত্যুত্তরে রচিত। অপরাজিতা দেবীর উত্তর 'সে কালিনী' ও 'আধুনিকা' এবং রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর 'আধুনিকা' নামে ১৩৪১ সালের চৈত্রমাসের প্রবাসীতে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল।'

'কবি গুরুর সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও অপরাজিতা দেবী আত্মপ্রকাশ করেননি। এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের বছর তিনেক পরে লেখা কবির চিঠি (৩০.৩.৩৭) থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অপরাজিতা দেবীর এই রহস্যময় অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে রাধারাণী দেবী 'বঙ্গের মহিলা কবি' গ্রন্থের লেখককে যে পত্রখানি লেখেন তা অপরাজিতা-রহস্য-উন্মোচনের সহায়ক।'

> *রাধারাণী দেবী বলেছেন,*
> ***অপরাজিতার ছদ্মনামে নতুন গঠনের কবিতায় হাত দিয়েছি যখন, মনে তখন দুরন্ত আবেগ। মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলাম, দ্বাদশ বর্ষ নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে, ছদ্মনামে ও ছদ্ম-পরিচয়ে এই পরীক্ষা করব, রচনা তার শক্তি ও উৎকর্ষের দ্বারা যথার্থ মূল্য পেতে পারে কিনা। এই আত্মপরীক্ষায় আমাকে বহু কঠিন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বহু দুঃখ সইতে হয়েছে।***

'রাধারাণী দেবীর সবচেয়ে অগ্নিপরীক্ষার দিন এল যখন রবীন্দ্রনাথকে জনৈক বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলে এলেন যে, অপরাজিতা মেয়ে নয়, পুরুষ। ক্রুদ্ধ কবি রাধারাণী দেবীকে ডেকে পাঠালেন। সেদিনও রাধারাণী দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞায় অটল থেকে কবিকে বললেন —

> *অপরাজিতা আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। এখন আত্মপ্রকাশ করার উপায় নেই তার। তবে অপরাজিতা তার আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। অজ্ঞতবাসের কাল উত্তীর্ণ হলেই সে আপনার সামনে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে আপনাকে প্রণাম করে ধন্য হবে।*

রাধারাণী দেবীর আত্মগোপন-ক্ষমতা অসামান্য। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহ পূর্ব থেকেই তিনি অপরাজিতা নামে কবিতা লিখতেন। হাতের লেখাও একেবারে আলাদা করে ফেলেছিলেন। অপরাজিতার প্রথম গ্রন্থ 'বুকের বীণা' বিবাহের আগে প্রকাশিত হয়। বিবাহের পরেও বেশ কিছুদিন নরেন্দ্র দেব জানতে পারেননি, তাঁর স্ত্রী-ই অপরাজিতা দেবী। একদিন মধ্যরাত্রে পড়ার ঘরে স্ত্রীর সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর টেবিলে দুই ভিন্ন হস্তাক্ষরে লেখা কবিতার খসড়া ও তার অনুলিপি দেখে প্রথম বুঝতে পারেন রাধারাণীই অপরাজিতা। বিস্ময়ের বিষয়, নরেন্দ্র দেবও গৃহিণীর এই কথা কোনোদিন কাউকে প্রকাশ করেননি।"[৫২]

গ্রন্থপঞ্জী: চতুর্থ অধ্যায়

১ সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ — জগদীশ ভট্টাচার্য
২. চতুর্দশপদী কবিতাবলী ড. ভবানীগোপাল সান্যাল
৩. চতুর্দশপদী কবিতাবলী — দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
৪. বাংলা সাহিত্যে সনেট — উত্তম দাশ
৫. বাংলাসাহিত্যে প্রাক্ রবীন্দ্রযুগ — হরপ্রসাদ মিত্র
৬. সিঁথি-মৌর - রাধারাণী দেবী - ১৯৩২
৭. লীলাকমল — " ১৯২৯
৮ বনবিহগী — " ১৯৩৭
৯. বুকের বীণা — অপরাজিতা দেবী ১৯৩০
১০. আঙিনার ফুল — " ১৯৩৪
১১. পুরবাসিনী — " ১৯৩৫
১২. বিচিত্ররূপিণী — " ১৯৩৭
১৩. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — ভারবি
১৪. "বিচিত্রা" - বৈশাখ ১৩৪০; শ্রাবণ ১৩৩৮
১৫. "উত্তরা" — আষাঢ় ১৩৪০
১৬. "শতদল" — ১৩৩৮
১৭. "মিলনের মন্ত্রমালা" — রাধারাণী দেবী - ১৯৩৫
১৮. রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন ১: ১৯৯৯
১৯. কিশোর সাহিত্য — প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ — রাধারাণী দেবী
২০. গল্পের আল্পনা — রাধারাণী দেবী; ১৩৬২ বঙ্গাব্দ
২১. শরৎচন্দ্র: জীবন ও সাহিত্য —- রাধারাণী দেবী — দেশ (ধারাবাহিক প্রকাশ; পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৭৬; আনন্দ পাবিলিশার্স)
২২. "শেষের পরিচয়" — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (অসমাপ্ত); রাধারাণী দেবী (১৩-২৬ অধ্যায়)
২৩. "ভারতবর্ষ" — ফাল্গুন, ১৩৩৭
২৪. "বিচিত্রা" — মাঘ ১৩৪১

প্রসঙ্গসূত্র: চতুর্থ অধ্যায়

১. সিঁথিমৌর — রাধারাণী দেবী: উৎসর্গ
২. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা - ভূমিকা জগদীশ ভট্টাচার্য পৃষ্ঠা ৮-৯
৩. সিঁথিমৌর রাধারাণী দেবী: চার সংখ্যক সনেট
৪. 'বিচিত্রা' বৈশাখ: ১৩৪০
৫. 'উত্তরা' — আষাঢ় ১৩৪০: ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৬. লীলাকমল - বিকাশ: রাধারাণী দেবী ৩৩
৭. লীলাকমল – নারী ও প্রেম: রাধারাণী দেবী ৬৭
৮. সিঁথিমৌর — প্রথম সনেট: রাধারাণী দেবী (প্রাণ তীর্থ যাত্রী মোরা) ৫২
৯. সিঁথিমৌর — বিপুল বেদনা মূল্য: রাধারাণী দেবী ৫৪
১০. সিঁথিমৌর - রাধারাণী দেবী
১১. তদেব
১২. বনবিহগী — রাধারাণী দেবী উৎসর্গ
১৩. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা - ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য ১০ ১১
১৪. তদেব ১১ ১২
১৫. তদেব ১৩
১৬. বনবিহগী — আকাশ ও নীড়: মানসলোক (রাধারাণী দেবী) ৬৪
১৭. বনবিহগী — গভীর নিশীথে: মৃত্তিকালোক (রাধারাণী দেবী) ৮০
১৮. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য ১৪-১৫
১৯. তদেব ১৮-১৯
২০. বুকের বীণা — আঁধারে আলো: রাধারাণী দেবী ১১১
২১. বুকের বীণা — দম্পতির দ্বন্দ্ব: রাধারাণী দেবী দশম কবিতা
২২. বিচিত্রা — শ্রাবণ ১৩৩৮: অন্নদাশংকর রায়
২৩. শতদল — ১৩৩৮: শ্রীশচন্দ্র দাস
২৪. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য ১৯-২০
২৫. আঙিনাব ফল — মনের মতো: রাধারাণী দেবী ১১৭
২৬. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য ২০-২২
২৭. পুরবাসিনী – দিদি: রাধারাণী দেবী

২৮. বিচিত্ররূপিনী — অভিসারিকা: রাধারাণী দেবী ১৬০
২৯. বিচিত্ররূপিনী — স্বাধীন ভর্তৃকা: রাধারাণী দেবী ১৭০
৩০. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য ২২-২৪
৩১. মিলনের মন্ত্রমালা — রাধারাণী দেবী (অবলোকন) ৭
৩২. রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন ১: নবনীতা দেবসেন ৬
৩৩. তদেব ৭
৩৪. তদেব ৮
৩৫. তদেব ৯
৩৬. তদেব ১০-১৬
৩৭. কিশোর সাহিত্য — প্রথম ভাগ: ভূমিকা: রাধারাণী দেবী
৩৮. তদেব — দ্বিতীয় ভাগ: তদেব
৩৯. গল্পের আপলনা — রাধারাণী দেবী "মায়াকানন" ১৩৯-১৪০
৪০. তদেব -- তদেব: উৎসর্গ
৪১. তদেব — তদেব : নিবেদন
৪২. অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ — রাধারাণী দেবী ৮৩
৪৩. রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন ১: নবনীতা দেবসেন ১৬, ১৭, ১৮
৪৪. শরৎচন্দ্র — জীবন ও সাহিত্য: রাধারাণী দেবী
৪৫. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৪৬. শেষের পরিচয় — প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়: 'নিবেদন'
৪৭. শরৎচন্দ্র --- মানুষ এবং শিল্প: রাধারাণী দেবী ১০৩, ১০৭, ১০৮
৪৮. কাব্য-দীপালী — সম্পাদনা নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী ভূমিকা
৪৯. রবীন্দ্রনাথের চিঠি — জ্যৈষ্ঠ১৩৩৮; রাধারাণী দেবীকে লেখা, রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন ২ ৩০৪-৩০৫
৫০. অনুরূপা দেবীর চিঠি — ৩১ আষাঢ় তদেব : তদেব ৩১৬-১৭
৫১. শিবরাম চক্রবর্তীর চিঠি — ২০/১১/৩০ তদেব : তদেব ৩২৫
৫২. রাধারাণী দেবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা — ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য ১৫-১৭

পঞ্চম অধ্যায়

মূল্যায়ন

বাংলা গীতিকাব্যের সাধনার ধাবায় পুরুষ কবিদের অবদান ঘোষিত হলেও মহিলা কবিদের ভূমিকাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই পর্বে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, মানকুমারী বসু, মৃণালিনী সেন, সরলা দেবী চৌধুরাণী ও কুসুম কুমারী দাশ প্রমুখেব অবদান উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য এই পর্বে বাংলায় সাংস্কৃতিক নবজাগবণের শুরু হয়েছে। সহিত্যে, ধর্মে, সংস্কৃতিতে নূতন জোয়ার শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বাধীনতা আকাঙক্ষী এক পরাধীন জাতির মনোবেদনা। এই পর্বেই সাহিত্যেও নতুন যুগের শুরু হল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার আগমনে এই পরিবর্তন ধ্বনিত হ'ল। বিশেষ করে ভারতী, শনিবারের চিঠি, সবুজপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য একটা নতুন মাত্রা পেল। সাহিত্যের এই পর্বের মাঝখানেই রাধারাণী দেবীর আগমন। ১৯২৪ থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। পুরানো গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে লীলাকমলের সূচনা। পরবর্তী কালে বনবিহগী, পুরবাসিনী, বিচিত্ররূপিণী, বুকের বীণা ও আঙিনার ফুলের মাধ্যমে নতুন কবিতার জন্ম হল। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অনুভূতি নয়, নারীর দৃষ্টি দিয়ে দেখা জীবনের বিভিন্ন দিক এই কাব্যগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এই কাব্যগুলির অধিকাংশ কবিতা 'অপরাজিতা দেবী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা সহিত্যে রাধারাণী দেবীর যে সময়ে আগমন ঘটে সেটি ছিল বাংলা সাহিত্যের এক নবযুগের সূচনা। ''শনিবারের চিঠি' র অনেক সমালোচনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা রাধারাণীর লেখায় অনেক 'মণিমুক্তা' খুঁজে পেতেন। এর অর্থ হল মহিলা রচিত সাহিত্যে তাঁরা মেয়েলিপনা বা অশালীনতার সন্ধান করতেন। কিন্তু সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রাধারাণীর রচনা একটি ইতিহাস হয়ে থাকবে। পর্দানসীন ও স্বশিক্ষিত একটি মেয়ে বিভিন্ন গল্প ও কবিতা লিখে পুরুষ মানুষদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে, তা গ্রহণ করার মত মানসিকতা যে যুগের খুব কম পুরুষেরই ছিল। তাই শুধু সাহিত্য নয়, ব্যক্তিগত অনেক আক্রমণও করা হয়েছিল। কিন্তু সুখের বিষয়, সমস্ত প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য

করে রাধারাণী দেবী ওরফে অপরাজিতা দেবী বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ আসন অধিকার করেছেন।

তাঁর কাব্যগুলিকে আলোচনা করলে বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 'লীলাকমল' থেকে 'মিলনের মন্ত্রমালা' পর্যন্ত যে কাব্য রচনার ধারা আমাদের আকৃষ্ট করে, তা হ'ল রচনাসমূহের পরিবর্তন ও ক্রম-বিকাশ। 'লীলাকমলে' মানব জীবনের যে আশা আকাঙক্ষা ও ভাবের বিকাশ 'বনবিহগীতে' তা প্রকৃতি ও প্রেমে পরিণত হয়েছে। 'পুরবাসিনী', 'বিচিত্ররূপিনী', 'বুকের বীণা' ও 'আঙিনার ফুল' বাংলা কাব্য রচনার ধারায় এক ব্যতিক্রমী প্রয়াস। কথ্য ভাষার ভঙ্গীতে ও ভাবে জীবনের বিচিত্র রূপ প্রকাশিত। সখী, মাতা বা কন্যা, বান্ধবী বা ঠিকে-ঝি — নারীজীবনের বিভিন্ন চরিত্র নিজস্বতায় ফুটে উঠেছে তাই এই পর্বকে ব্যতিক্রমী পর্ব বলা যায়। আবার 'সিঁথি মৌর' ও 'মিলনের মন্ত্রমালায়' ব্যক্তিজীবনের স্পর্শ থাকায় তা স্বতন্ত্রভাবেই অভিনন্দিত হয়েছে।

রাধারাণী দেবীর গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উনিশ শতকীয় গল্পের আঙ্গিকে লেখা হলেও তাতে তাঁর রচনার নিজস্ব ছাপ বর্তমান। 'যমের অরুচি' ও 'বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ' গল্পদুটিতে বিশ শতকীয় নারীর প্রতিবাদী চরিত্র ফুটে উঠেছে। 'শূন্য মনা কাঙালিনীর মেয়ে' গল্পে বিধবা সাবিত্রী তার ভাইঝির বিয়েতে উপস্থিত থেকে বুঝতে পারল যে সে কতখানি সহানুভূতির যোগ্য। ভালবাসা নয়, কৃপা বা সহানুভূতিই তার আরোপিত সাজ সজ্জার বাহক তাই শেষে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সাজসজ্জা ছেড়ে ফেলে দিয়ে স্বাভাবিক জীবনের চেষ্টাই তার প্রতিবাদের চিহ্ন। 'সাগর স্বপ্ন' গল্পে রোমান্টিকতা স্থান পেয়েছে। প্রণয়িনীর প্রতি নির্বাক প্রেম এই গল্পের উপজীব্য। পরবর্তী কালে বাস্তবের রূঢ় আঘাতে অবশ্য সমীরের চেতনাভঙ্গ হয়। অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে, 'পরম তৃষ্ণা', 'নিশীথ রাতের বাদল ধারা', 'যে নদী মরুপথে হারাল ধারা' প্রভৃতি গল্পে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রভাব অতি স্পষ্ট। এছাড়া 'বিমাতা', 'পাতানো মা', 'মাসী মা', 'দাবীহারা', 'আলো-কোথায়-ওরে-আলো' গল্পসমূহে চিরাকঙ্ক্ষিত মাতৃহৃদয়ের বুভুক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলিতে স্পষ্ট বোঝা যায় একজন নারীর চোখ থেকে দেখা সমাজ ও নারীর জীবন যাত্রা।

বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায়ও রাধারাণী দেবীর স্বকীয়তা বর্তমান। যদিও তাঁর প্রবন্ধের বিষয় নারী অথবা নারী সমস্যার বিভিন্ন দিক। তবুও যুক্তিবাদী মননশীলতায় এ প্রবন্ধগুলি কোন বিশেষ দিককে নির্ধারিত করে না বরং একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'সাহিত্য বিচারে পুরুষ নারী' ভেদ প্রবন্ধে এই কথাটি প্রমাণিত হয়েছে। 'বাংলা দেশে মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', 'বাংলা সাহিত্যে নারী: এক শতাব্দীর ইতিহাস', 'মহিলার জন্য মহিলার গল্প' প্রভৃতি প্রবন্ধে নারীদের সাহিত্যিক ক্রমবিকাশের চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক নারীবাদীদের তথাকথিত প্রভাব না থাকা সত্ত্বেও

রাধারাণীর প্রবন্ধগুলি নারী সমস্যা প্রসঙ্গে ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র মেয়েদের অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দিয়েছে। সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সমাজরীতির পরিবর্তন ঘটেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কিংবা অনুরূপা, নিরুপমা, শৈলবালার উপন্যাসে যেভাবে সমাজ-অত্যাচারিতা মেয়েদের কথা পাওয়া গেছে, এখনকার সাহিত্যে সেরকম না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু পুরুষতন্ত্রের প্রক্রিয়াগত কারণে নারী সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হয়ে ওঠেনি। তাই বিংশ শতাব্দীর গল্প-উপন্যাসে নারীর জীবনে পুরুষের একটি বড় ভূমিকা আছে। রাধারাণীর গল্প উপন্যাস এর ব্যতিক্রম নয়। তাই প্রবন্ধগুলিতে নিজস্ব বাক্‌রীতি ও যুক্তির সাহায্যে নারীর স্বপক্ষে মতামত তুলে ধরেছে এ যুগের পটভূমিতেও যার মূল্য অপরিসীম। একে ফেমিনিজ্‌ম না বলেও নাবীবাদের সমার্থক বললেও অত্যুক্তি হয় না। শরৎচন্দ্রের 'মানুষ ও শিল্প' গ্রন্থের একটি অংশ উল্লেখ করলে তা প্রমাণিত হবে :

> *শরৎচন্দ্রের জীবনকালে বাল বিধবারা বাঙালী সমাজের একটি বিরাট অবহেলিত অংশ ছিল। অত্যাচারিতও বটে। তারা সমাজব্যবস্থায় শোষিত হত শাসিত হত তা থেকে বাঁচার কোন সুযোগ পেত না। আমার মনে হয়, আমার প্রতি শরৎদার মমতার একটি কারণ আমার তেরো বছর আট মাস বয়সে বৈধব্য। হয়ত বা প্রধাণ কারণ সেটাই। আমাদের কাছে একটি বিস্ময় শরৎদা তাঁব বইতে বিধবা বিবাহ কোথাও দিতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র যা বহু আগেই 'বিষবৃক্ষে' দিতে পেরেছিলেন। বইতে বিধবা বিবাহ না দিলেও তাঁর গ্রামের বাড়িতে দুর্গা নামে একটি বালবিধবার ব্রাহ্ম কন্যাকে বিবাহিত অবস্থায় আমি দেখেছি স্বামী সহ শরৎদারই বাড়িতে আশ্রিতা রয়েছে। শরৎচন্দ্রই উদ্যোগী হয়ে মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলেন।*
>
> *হিন্দু সমাজের প্রচলিত মানস সংস্কারের বিরোধিতা করে জীবনের এরকম মোড় ফেরানো আমার মতন সাবেকী বাড়ীর শুদ্ধতাবাদী মেয়ের পক্ষে প্রায় অসাধ্য কর্ম ছিল বললে ভুল বলা হবে না। আমার জীবনের মহৎ ঋণ — মানুষ রবীন্দ্রনাথ ও মানুষ শরৎচন্দ্রের কাছে আমি আমরণ বহন করে যাব।*[১]
>
> *—(শরৎচন্দ্র — মানুষ এবং শিল্প, পৃঃ —২১-২২,*
> *রাধারাণী দেবী রচনা সংকলন— ২)*

সনেট রচনার ক্ষেত্রে রাধারাণী দেবীর বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। উনিশ শতকে বাংলা কাব্য সাহিত্যে সনেট রচনার যে জোয়ার এসেছিল রাধারাণী দেবী তারও অংশীদার। তাঁর সিঁথি-মৌর বাংলা সনেট রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। তাঁর পরবর্তী বহু মহিলা কবি সনেট রচনা করেছেন। কিন্তু কেউই সেরকম সফলতা অর্জন করতে পারেন নি। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সনেট রচনার ক্ষেত্রে রাধারাণী দেবী সর্বশ্রেষ্ঠ

মহিলা কবি। সেক্‌সপীয়রিয় ছন্দে রচিত সনেটগুলি প্রেমে মুগ্ধ চিত্ত এক নারীর বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচায়ক। চার চার দুই চার ছন্দে রচিত সনেটগুলি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। বলা বাহুল্য বাংলা সনেট রচনায় রাধারাণী দেবী অতুলনীয়া।

ভাষা ও শৈলীর ক্ষেত্রেও রাধারাণী দেবী ব্যতিক্রমী লেখিকা। মূলতঃ চলিত গদ্যে লেখা তাঁর গল্পগুলি 'সবুজপত্রের' বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারার অনুসারী। বিষয় অনুযায়ী ভাষা নির্বাচনও স্বকীয়তা দাবী রাখে। প্রথম দিকের সাহিত্য রচনায় সাধু ভাষার প্রয়োগ করেও পরবর্তী কালে চলিত ভাষায় সাবলীলতা প্রশংসাব্যঞ্জক। 'লীলাকমল' ও 'বনবিহগীতে' — কবিতার ভাষায় যে ঘনত্ব ও গম্ভীরতা উপস্থিত ছিল 'আঙিনার ফুল' বা 'পুরবাসিনী' কবিতা পর্বে সেই ভার মুক্ত হয়েছে। ষ্টাইল বা শৈলীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তু নির্বাচনেও প্রাঞ্জলতা এসেছে। মূলতঃ রক্ষণশীল ধারাব বিষয় নির্বাচন হলেও প্রতিবাদী মনোভাব সেখানে স্পষ্ট। ভাষাশৈলী এখানে তার ধারক ও বাহক হয়েছে।

শব্দ নির্বাচনে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন; পাত্র পাত্রীর কথ্য ভাষা, তা সে সমাজের উচ্চস্তরের বা নিম্নস্তরের মানুষ হোক না কেন। চরিত্র অনুযাযী শব্দ নির্বাচনেও লেখিকার নিজস্ব দক্ষতার পরিচয় দেয়। কোন কোন শব্দকে তিনি নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছেন অথবা শব্দগুলিকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের পরিচিত ও সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে যে শব্দগুলি নিত্য ব্যবহৃত হয়, তাকে সাহিত্য সৃষ্টিতে স্থান দেওয়া মুখের কথা নয়। এ দুরূহ কাজটি তিনি করেছেন এবং তা আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে।

মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিন প্রকার ছন্দই তিনি ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সৃষ্টিতে তিনি নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। 'লীলাকমল' কাব্যের ছন্দ রচনায় যে অন্তর্মিলের পরিচয় দিয়েছেন যে বিশেষ স্টাইলটি তারই কল্পনা প্রসূত। সেক্‌সপীয়রিয় ছন্দের সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অসীম অতুলনীয়। বত্রিশটি কবিতার মধ্যে একত্রিশটি কবিতাই সার্থক সনেট বলে স্বীকৃত হয়েছে।

সমসাময়িক বিভিন্ন লেখিকাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যায় যে রাধারাণী দেবী জগতেআর্বিভূত হবার অব্য বহিত পূর্বে — বাংলা সাহিত্যে অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শান্তা দেবী প্রভৃতির আগমন ঘটে। এঁদের রচনায় শরৎচন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট। রক্ষণশীল সমাজের বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার এখানে বর্তমান। সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে নতুন কোন দৃষ্টিভঙ্গী এখানে বিবৃত হয়নি বরং হিন্দু সমাজের কৌলিক প্রথা ও বিভাজন রীতির প্রতি আস্থা ও নারীর সতীত্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা বিষয়ে প্রাচীন মতের অনুসরণ করেছেন এঁরা। বিশেষ করে অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর রচনায় এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। শান্তাদেবী মুখ্যত শিশুশিক্ষামূলক রচনা লিখতেন বলে তাঁর রচনায় নীতিবোধের প্রাধান্য বেশী।

শৈলবালা ঘোষজায়া ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর রচনায় গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে সুখ ও সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে। আশাপূর্ণ দেবীর রচনায় সমাজ ও পারিবারিক জীবন নিরীক্ষণ অতি ব্যাপক। বলতে গেলে আশাপূর্ণা দেবীর হাতেই আধুনিক নারী জীবনের উত্তরণ ঘটে।

বর্তমান সময়ে, মহাশ্বেতা দেবী, নবনীতা দেব সেন, বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, তসলিমা নাসরিন এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজ-মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এই মনোভাব কখনও সোচ্চার আবার কখনও নীরব প্রতিবাদে স্পষ্ট। প্রায় এক শতাব্দী আগে মানুষ হয়ে রাধারাণী দেবী ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্যে যে ব্যতিক্রমী ও প্রতিবাদী মনোভাবের পরিচয় রেখেছেন তা বিস্ময়কর :

> *মায়ের ধীমত্তা, তাঁর সাহস, তাঁর সততা, তাঁর স্পষ্ট ভাষণ, তাঁর শব্দচয়ন, চিন্তার স্বচ্ছতা ও ভাষার তীক্ষ্ণতা, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ওপরে তাঁর অসামান্য দখল— আমাকে তাঁর পদতলে মুগ্ধ ভক্ত করে রেখেছিল। মা যা-ই বলতেন, যা-ই লিখতেন, তা হতো অন্যদের চেয়ে আলাদা, গভীর ও বিশিষ্ট চিন্তার আলোতে উজ্জ্বল। নিজস্ব ভাষার গুণে মৌলিক। ইস্কুল-কলেজে পড়েননি বলে মার সব ভাবনা-চিন্তাই ছিল নিজস্ব, সব মন্তব্যই একান্ত মৌলিক। আমাদের পরিচিতি জনেরা এখনও বলে থাকেন, রাধারাণী দেবীর কাছে কিছুক্ষণ বসা মানেই ছিল নতুন কিছু শেখা, মনের মধ্যে নতুন একটি বাতায়ন খুলে যাওয়া। মার মন সর্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকতো জীবনভাবনায় — সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, গণমাধ্যম, সব বিষয়ই তাঁর চেতনা সক্রিয় ছিল — আমি এবং আমার সতীর্থ বন্ধুরা পরম শ্রদ্ধায় এবং বিস্ময়ের সঙ্গে মাকে লক্ষ্য করতাম।*[২]

কবি রাধারাণী দেবী কিন্তু স্বতন্ত্র। পরবর্তী কালে তিনি সাহিত্যকর্ম থেকে যখন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন-তখনও কিন্তু পরম মমতায় তিনি তাঁর কবিতাগুলি নিয়ে বসতেন। প্রায় ছেলে-খেলার মতো করেই পুরোনো কবিতায় সংশোধন করতেন। কিন্তু গল্প নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যান।

> *নেহাৎ অল্পবয়েসের হাত-পাকানোর লেখা— সেইসব তরুণ ভাবনাগুলিকে মা কি পরিণত বয়সে অস্বীকার করতই চেয়েছিলেন? সার্ত্রে যেমন পরবতী জীবনে, বামপন্থী মননের সময়ে, 'বিইং অ্যান্ড নাথিংসে'র দায়বহন করতে চাননি। মায়েরও চিন্তা পরিণতি পাবার পরে, কলমের এবং জীবনের মোড় ঘুরে যাবার পরে, সেই অল্পবয়সের লেখাগুলিকে মা কি তবে মূল্য দিতে চাননি। সম্পূর্ণ মনোমত না হলে সেই লেখা প্রকাশ করায় তাঁর মত ছিল না। লেখা নিয়ে তিনি যারপরনাই খুঁতখুঁতে ছিলেন। যখন তাঁর বড় নাতনী চাকরি করছে, ছোট নাতনী বিদেশে পড়ছে তখনও, মাকে দেখেছি পুরোনো বই বের করে তার ওপরেই সংশোধন করেছেন, রাধারাণীর কবিতা। ... মাকে কখনও তাঁর*

গল্পের প্রসঙ্গ তুলতেই শুনিনি, যদিও বিভিন্ন সময়ে নিজের পুরোনো প্রবন্ধ নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 'দুই বোন', 'ঘরে বাইরে' বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ পড়ে প্রমথ চৌধুরী-রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া, 'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক না প্রসারক' নিয়ে পাঠকদের সমস্যা, 'অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে শনিবারের চিঠির কার্টুন, 'নিরুপমা দেবীর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ'-বিষয়ে অনুরূপা দেবীর প্রতিক্রিয়া—ইত্যাদি প্রসঙ্গে মাকে কথা কইতে শুনেছি [৩]

মূলত : কবি, রাধারাণী দেবী গল্পকার হিসেবে নিজেকে পরবর্তীকালে দূরে সরিয়ে রাখলেও প্রবন্ধকার রাধারাণী দেবী কিন্তু পূর্বাপর সচেতন এবং নির্ভীক ছিলেন :

প্রবন্ধ লেখার সময়ে বালবিধবাটি 'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক' এমন শীর্ষক দিতে ভয় পাননি। তাঁর বক্তব্যও যথেষ্ট বৈপ্লবিক (১৩৩১)। 'নারীর ভালোবাসা' (১৩৩২) বিশ্লেষণেও পিছপা হননি তিনি। কিন্তু সেখানেও দেখি নারীর বল আত্মত্যাগে, ও নারীত্বের চরম বিকাশ মাতৃত্বে। অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের শেখানো পড়ানো বুলিটাই তিনি নিজের করে নিয়েছেন। গল্পে, প্রবন্ধে তারই প্রকাশ। (যদিও তাঁর নিজের ব্যক্তিগত-জীবনে, কি সৌভাগ্য, শেষ পর্যন্ত এই তথাকথিত 'আদর্শ'টি তিনি গ্রহণ করেননি।) যে 'অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিকে ঠাট্টা করে 'শনিবারের চিঠি'তে কার্টুন আঁকা হয়েছিল, সেই প্রবন্ধটি (১৩৩৫) যথেষ্ট জরুরি। তাতে আছে অন্তঃপুরের মেয়েদের জীবন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি যে মেয়েদের কতদূর অন্তরস্পর্শী, ('অন্তঃপুরিকারা রবীন্দ্রনাথকে তাদের মর্ম্মের মানুষ বলে মনে করে') — এই প্রবন্ধে তাই আলোচিত। [৪]

" 'ঘরে বাইরে'র সমালোচনাটি, 'প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নের রূপ-মাধুর্য্য', তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদে পাঠ করছিলেন। নতুন দৃষ্টিকোণের জন্য লেখাটি বহু প্রশংসিত হয়েছিল, সাহসী বলেও খ্যাতি পেয়েছিল। এখানে মেজরাণীর চরিত্রের বিশ্লেষটি বিশেষভাবে নজর কাড়ে। য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে পঠিত প্রবন্ধ 'সাহিত্যবিচারে পুরুষ-নারী ভেদ' (১৩৩৭) এখনও সমান জরুরি। দুঃখকর সত্য এই যে, ১৪০৬-তেও বাংলাসাহিত্যের সমালোচকের চোখে আজও পর্যন্ত নারী ও পুরুষ সমান গুরুত্ব পান না। জ্যোতির্ময়ী দেবী, আশাপূর্ণা দেবীর ক্ষেত্রেও এটা দেখেছি। মহাশ্বেতা এখন প্রধানতঃ আলোচিত - তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ ও সমাজসেবার কর্মকাণ্ডের জন্য। রাধারাণী দেবী বলেছেন :

"জীবনের ক্ষেত্রে না হোক অন্তত সাহিত্যক্ষেত্রেও কি এদেশের মেয়েরা সমালাচকের কাছে মানুষের সহজ ও সাধারণ অধিকার দাবী করতে পারেন না? এখানেও কি এ-সাম্য ও মৈত্রীটুকু সম্ভব নয়?"

ভাবলে বেদনা লাগে যে — এখনও এই প্রশ্নগুলি আমরা করতে পারি। কত উৎসাহে 'একশো বছরের বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকদের অবদান' (১২৪১—১৪৪৩) নিয়ে রাধারাণী দেবী দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, রাধারাণী দেবী 'বাংলাদেশে মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' রচনা করেছেন (১৩৩৮), অথচ কোনো লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনোর সুযোগ তাঁর ছিল না। গবেষণার পদ্ধতিও ঘরের আড়ালে স্বশিক্ষিত এই বালিকাকে কেউ শিখিয়ে দেননি। যা করেছেন সবই আপনার অসীম আগ্রহে। অ্যাকাডেমিক কাজে তাঁর নিজেরই আগ্রহ ছিল অসীম।[৫]

সাহিত্যের প্রতি এই অসীম আগ্রহই স্ব-শিক্ষিত এই নারীকে, প্রায় একশো বছর আগে — সাহিত্যে উদ্যোগী, উৎসাহী ও সমাজভাবনায় কার্যকরভাবে প্রতিবাদী করে তুলেছিল। রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপা দেবীর সঙ্গে মত বিরোধ হয়। ৮৬ বছর বয়সে, তাঁর মৃত্যুর বৎসরে, — মৈত্রেয়ী দেবীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, যে কোনও এক 'প্রকাশ্য সভায় শুভ্রবসনা নিরাভরণা রাধারাণী প্রতিবাদ করেন—অনুরূপা দেবীর হিন্দু বিবাহ আইন সংশোধনের বিরোধিতার বিরুদ্ধে।'

''উনিশ শতকের শেষে নারী সমস্যার কোন জাতিয়তাবাদী সমাধান হয়নি উল্টে এই সময় দিয়েই মেয়েদের লেখাতে পরিবারকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কেনানারকম অভিযোগ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার থেকে বাদ পড়েও সচ্ছল পরিবারের মেয়েরা পত্রপত্রিকা ও বইয়ের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষাকে হাতিয়ার করে সমাজে প্রচলিত রীতিনীতিগুলিকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তোলেন। এরও মধ্যে সবচেয়ে চোখা প্রশ্ন রেখেছেন রাধারাণী দেবী, যে প্রশ্ন আজও মানবীবিদ্যার গবেষণায় বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়। যখন তিনি প্রশ্ন রাখেন: সতীত্ব কি মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক? বিশ্বাস করা শক্ত হয় যে, তিনি আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে এই প্রশ্ন তুলেছেন যখন তিনি অকালবিধবা এবং প্রায় অখ্যাত একুশ বছর বয়সের এক যুবতী।... রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালে সতীদাহ নিবারণ আইন প্রণয়ন করা হল বটে, কিন্তু সতীত্বের মতাদর্শের ভূত আমাদের ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার কাঁধে ভর করল। ধীরে ধীরে নারীর সতীত্ব বিশুদ্ধ ভারতীয়ত্বের প্রতীক হয়ে প্রায় পেছনের দরজা দিয়ে আমাদের মনোজগৎকে অধিকার করল, যার জের টেনে চলেছি আমরা আজও, সামাজিক বিশুদ্ধাচরণের নামে মেয়েদের শিক্ষা ও মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করার মধ্য দিয়ে। সুকুমারী ভট্টাচার্য, উমা চক্রবর্তী, ইন্দিরা চৌধুরী প্রমুখের গবেষণার আলোতে সতীত্বের মতাদর্শের শ্রেণীলিঙ্গভিত্তিকসমালোচনা করে আমরা আত্মপ্রসাদবোধ করে থাকি, কিন্তু এই শতকের দ্বিতীয় দশকে কলকাতার বনেদী ঘরের অন্তঃপুরের মধ্য থেকে রাধারাণী দত্তের পক্ষে এ প্রশ্ন জোর গলায় উচ্চারণ করবার 'অসম সাহসিকতা'ও অনস্বীকার্য। শুধু যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করবার সাহস তিনি দেখিয়েছেন তা-ই

নয়, এ নিয়ে রসিকতা করতেও তিনি পিছপা হননি। সতীত্বের মুখোশ খুলতে গিয়ে তিনি 'আদামসুমারী'র আদলে শব্দ বানিয়েছেন 'সতী-সুমারী'।"...

শব্দচয়নেও কিন্তু তাত্ত্বিক ভিত্তি সুন্দর ও সুদৃঢ়:

> অন্য দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের সতীর সংখ্যা হয়ত হিসাবে শতকরা অনেক বেশী হইতে পারে; কিন্তু সেই 'সতী-কুমারী'র অনুপাত দেখিয়া গর্ব্বে ও উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই; কেননা, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমাদের সতীর সংখ্যা যেমন অন্য দেশের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তেমনি এ কথাও সত্য যে, আমাদের দেশের সতীত্বের মধ্যে গলদ, গোঁজামিল ও ফাঁকিও অনেক বেশী। কিন্তু এই কঠিন সত্য উচ্চারণ করিবার স্বাধীনতা এ দেশের লোকের নাই। একটু ধীরভাবে বিচার করিলে যদিও সকলেই এ বিষয়ে প্রকৃত মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিবেন নিশ্চয়, কিন্তু খব কম লোকেই তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে সাহসী হইবেন।

'আজও যেমন নারীর অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে বিজাতীয়ত্বের দোহাই পেড়ে সমাজে অপাংক্তেয় করে রাখার অপচেষ্টা দেখা যায়, রাধারাণী দেবী যখন স্বাভাবিক মনোবৃত্তির ওপরে আসল সতীত্বকে স্থাপন করবার কঠোরতর আদর্শের প্রস্তাব দেন, সুনীতি দেবীর প্রতিবাদেও (ভর্ৎসনা বলাই বোধহয় সমীচীন) একই সুর শোনা যায়':

> *আর তুমি হিন্দু রমণীর স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের অপঘাত ঘটাইয়া তাহার স্থানে বলপূর্ব্বক যে বিদেশীয় মনোধর্ম্মের আসন স্থাপন করিয়াছ, এইটা কি স্বাভাবিক?" (দ্র. 'বাদানুবাদ' অংশ : রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন১)*

'তখনকার যুগেও 'নবীনা'দের প্রচলিত রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হতো। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী অনুরূপা দেবীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ সংকলিত লেখাতে প্রকাশিত হলো (দ্র. 'বাদানুবাদ' অংশ)। এছাড়া মনে পড়ে, মাসিমার মৃত্যু বৎসরে মৈত্রেয়ী দেবীর স্মৃতিচারণা — কোনও প্রকাশ্য সভায় শুভ্রবসনা নিরাভরণা রাধারাণী প্রতিবাদ করেন অনুরূপা দেবীর হিন্দু বিবাহের আইন সংশোধনের বিরোধীতার বিরুদ্ধে। কথাটি শুনে চমকে উঠলেও পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। এই লেখাগুলি থেকে অনেকটাই পরিস্কার হলো।'

'রাধারাণী দেবীর গল্প ও প্রবন্ধগুলি পাশাপাশি রেখে পড়লে বোঝা যায়, কেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে সাহিত্য-গুরুর আসনে বসিয়েছেন। সমাজের কৃত্রিম অনুশাসনের চোরাবালিতে মানুষের স্বাভাবিক মনোধর্মের 'আকৃতির' মুক্তধারা বারে বারে আটকা পড়ে যায় — রাধারাণী দেবী ছিলেন সে সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। 'শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে' গল্পে সাবিত্রী বা 'বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ' গল্পে উচ্চবর্ণের হিন্দু-বিধবার প্রতি

সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে অভিমান করে বৈধব্যের নিরাভরণ নিঃস্বতাকেই আঁকড়ে ধরে। অরক্ষণীয়া ক্ষেন্তি পিতামাতর দারিদ্র্য, যৌতুকের জন্য চাপ ও সমাজের নিরন্তর সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আত্মহননের চেষ্টা করে। যে আদর্শবাদী যুবক তাকে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে আনে তার গায়ে কুৎসার কাদা ছিটিয়ে সমাজপতিরা ছোট মেয়েটির বেঁচে ওঠাকে বলেন 'যমের অরুচি'। কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে তাঁর এই জেহাদ তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তরুণ সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কৃত্রিমতার অভিযোগের স্বরূপ নির্ণয়ে':

'কৃত্রিম -সাহিত্য-সৌধ-রচনা পূর্ব্বতন সাহিত্যেও চলছিল, আধুনিক সাহিত্যেও চলেছে। মিস্ত্রী বদলের সাথে সাথে মালমশলা ও রং ঢংয়ের বদল হয়েছে এইমাত্র।...

'সামাজিক জীবনযাত্রায় আমাদের প্রাণ না থাকুক ভান আছে যথেষ্ট। সেই ভান দীর্ঘ-শতাব্দী-ব্যাপী অভ্যাসের ফলে আমারা এমনি স্বাভাবিক করে ফেলেছি, যে এখন এর প্রকৃত রূপটি চেনা কঠিন। সাহিত্যেও এই ছদ্ম সুনিপুণ ভানটিই ফুটে উঠেছে। এই ভানটুকুকেই আমরা আমাদের সত্যকারের দান বলে মনে করি।

'যে কৃত্রিমতার নাগপাশে সমাজ ও সাহিত্যের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, তার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। এই প্রতিবাদ কেবলমাত্র অনুশাসনের কৃত্রিমতা র বিরুদ্ধে নয়, নতুনভাবে নরনারীর সম্পর্ক রচনা করবার কাজেও লাগিয়েছেন। 'সাগর-স্বপ্ন' গল্পে সমুদ্রের ধারে দেখা হওয়ার সূত্র ধরে একটি আর্টিষ্ট যুবক মুকুর ও এক অনূঢ়া তরুণী নীলিমা কিভাবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হল — কিন্তু না-বলা কথার আড়ালে একটি সম্পর্ক হারিয়ে গেল, প্রমাণ রইল শুধু এই আর্টিষ্টের আঁকা ছবিটি — যার মুখের আদলে ধরা পড়ে গেল তার মানস সুন্দরী। এই আলতো করে ছুঁয়ে যাওয়া প্রেমের গল্পটির মধ্যে আমরা সামাজিক বিন্যাসের নতুন সম্ভাবনাগুলিকে খুঁজে পাই। পশ্চিমী কথা সাহিত্যের প্রভাব একেবারে উড়িয়ে না দিয়েও বলা যায় যে নরনারীর সম্পর্কের যে নতুন বিন্যাস আমরা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, উপন্যাস এবং গানের মধ্যে পাই, রাধারাণী দেবী সেই ধারাটিকে নিজস্ব রূপ দিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে', 'দুই বোন', এবং 'নারী প্রকৃতির দ্বিবিধ রূপ' আলোচনাতেও তিনি এই নতুন ধরণের প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরেছেন।'

'স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের ফলে অন্তঃপুরে যে পাঠিকাসমাজ তৈরী হয়েছিল, তার থেকেই লেখিকারা বেরিয়ে এসেছেন। পাঠিকাকে লেখিকা বানানোর প্রক্রিয়াটিতে যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অবদান, রাধারাণী দেবী সেটি প্রকাশ করেছেন 'অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। ১৩৩৫ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার মতো সজাগ ও সূক্ষ্ম রসনানুভূতি (intuition) এ'দেশের অসাড়মনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও সম্পূর্ণ জাগ্রত হয়নি। কাব্য-প্রীতি মানুষের সহজ ভাল লাগা বা স্বাভাবিক রসানুভূতির

> উপর নির্ভর করে। নারীজাতির মধ্যে এই সহজ জ্ঞান ও অনুভূতিশক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জাগ্রত। সবরকম শিক্ষার উৎকর্ষ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে অন্তঃপুরের রান্না, ভাঁড়ার ও শোবার ঘরের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে অবরোধবন্দিনী বাংলার মেয়েরা পরমেশ্বরের দান এই সহজ প্রত্যয় ও রসানুভূতি-শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাই তারা তাদের যৎসামান্য বিদ্যার পুঁজি সম্বল করেও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-অমৃতের বিচিত্র মধুর রসাস্বাদনে সমর্থা হ'তে পেরেছে। আর সেইটিকেই তাদের অবরুদ্ধ কারা জীবনের কর্ম ও শাসন-নিষ্পেষিত দিনগুলির একমাত্র আনন্দ-ক্ষণরূপে গ্রহণ করে ধন্যা হ'য়েছে।"

'বাংলা সাহিত্যে নারীর মূল্যায়ন নিয়ে রাধারাণী দেবীর চিন্তাভাবনা মানবীবিদ্যাচর্চা ক্ষেত্রে আজকের দিনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষার জগতে পুরুষের চেয়ে অনেক দেরিতে সুযোগ পাওয়ার দরুন সাহিত্যের জগতেও তাঁদের অনুপ্রবেশ হয় দেরিতে।...

'বাংলাদেশের মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (১৩৩৮)- এবং 'বাঙলা সাহিত্যে নারী : এক শতাব্দীর ইতিহাস' (১৩৪৪) - সে দুটি থেকেই বোঝা যায় কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে এই দুটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তবে এই লেখাগুলি লিখেছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সাহিত্যে মেয়েদের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা বর্হির্জগতে মেয়েদের সামাজিক মূল্যায়নের দিকে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। গোড়ার দিকের নারী-আন্দোলনের লক্ষ্য কেবলমাত্র মেয়েদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়াই নয়, সার্বিকভাবে মেয়েদের আত্মসচেতনতার বিকাশও বটে। সেই অর্থে রাধারাণী দেবীকে ভারতীয় নারী-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সাহিত্যে মেয়েদের অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি তাঁর বিচারের মাপকাঠিকে রেখেছিলেন অনমনীয়। বাংলা সাহিত্যে নারীর অবদানের এক শতাব্দীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেন যে মেয়েদের সাহিত্য-'সাধনা'র যে পরিমাণ নিদর্শন তিনি পেয়েছেন, তাঁদের সাহিত্য-'প্রতিভা' ততটা পাননি।...

'নারীমনের 'আকুতি'র সততা যদি সাহস করে'... কেউ প্রকাশ করতে পারেন তাহলে তিনি সমালোচক রাধারাণীর দেবীর সমর্থন পাবেন। অনেক পরে লেখা হলেও 'আশাপূর্ণার লেখা' প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন:

> *যে-সাহিত্য ভাল হয়েছে, যে-সাহিত্য যথার্থ সাহিত্যগুণসম্পন্ন, সে-সাহিত্য কেন তার সমকালীনদের কাছে সমাদর পাবে না? দূরকালের অনাগত সমালোচকের পেক্ষায় তাদের প্রতীক্ষিত থাকতে হবে!*

এই প্রসঙ্গে তিনি জ্যোতির্ময়ী দেবীর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আশাপূর্ণার ট্রিলজির মধ্যে ডানা-ঝাপটানো নারী-অন্তরাত্মার তিনিটি প্রজন্মের বিবর্তনের মধ্যে যে সারা বিশ্বের

ছায়া দেখতে পেয়েছেন, এই বোধ কিন্তু আজকের মেয়েদের। তিনি বলছেন:

> *এই বন্দী মানবাত্মার বন্ধনমুক্তির আর্তি কোন বিশেষ একটি ভৌগোলিক কোণে ঘটলেও, এ কিন্তু সারা বিশ্বের। বিভিন্ন কালের সীমানায় এরা বিশ্বের সকল দেশে এই একইভাবে বন্ধনে যন্ত্রণা পেয়েছে, কেউ কেউ বিদ্রোহ করেছে পাথরের পাঁচিলে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হয়ে।*

...'সৃজিত-সাহিত্যে'র প্রতি রাধারাণী দেবীর পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে তিনি নির্মাতাও বটে। মানবীবিদ্যাচর্চার পূর্বসূরি রাধারাণী দেবী আজও অপরাজিতা।'[৬]

আর তাই সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে এই সাহিত্যস্রষ্টার রচনা অবশ্যই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জী: পঞ্চম অধ্যায়

১. বঙ্গের মহিলা কবি --- যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
২. নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য — ড. জ্ঞানেশ মৈত্র
৩. বাংলা সাহিত্য: একাল-সেকাল — শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৪. নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণী — গোলাম মোরশেদ
৫. রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ১
৬. রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ২
৭. চতুর্দশপদী কবিতাবলী — ড. ভবানীগোপাল সান্যাল
৮. বাংলা সাহিত্যে সনেট — উত্তম দাশ
৯. লৌকিক উদ্যান — মানবী সংখ্যা (১৯৯৯): সম্পাদনা: প্রেমেন্দ্র মজুমদার

প্রসঙ্গসূত্র: পঞ্চম অধ্যায়

১.	শরৎচন্দ্র: মানুষ এবং শিল্প — রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ২	পৃষ্ঠা ২১-২২
২.	রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন ১: নবনীতা দেবসেন	৫
৩.	তদেব	৭, ৮
৪.	তদেব	৭
৫.	তদেব	৯, ১০
৬.	অপরাজিতা রাধারাণী: যশোধরা বাগচী: রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন ১	২২-২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

সাম্প্রতিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সহিত্যের সমজাতীয় রচনার তুলনা করলে দেখা যায় গত পঞ্চাশ বছরে স্বাধীন ভারতে নারীদের অধিকার বহুল পরিমাণে বেড়েছে এবং সাহিত্যে তার প্রতিফলনও ঘটেছে। যদিও তা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। সমাজ ও সমাজনীতির পার্থক্য নিরূপণ করার ক্ষেত্রে সাহিত্য একটি বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে বা অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা দেবীদের রচনায় সমাজ কর্তৃক নিপীড়িত মেয়েদের কথা দেখা গেছে। কিন্তু বর্তমানে মহিলা লেখিকাদের রচনায় ততখানি অত্যাচরিতা মেয়েদের দেখা পাওয়া যায় না। বিশেষ করে যে সব রচনায় নগর জীবনই প্রধান উপজীব্য। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অধিকারে নগর জীবনে অভ্যস্ত মেয়েরা যতখানি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, গ্রামজীবনে ততখানি অধিকার সচেতনতা লক্ষণীয় নয়। তাই পণপ্রথা, বধূনির্যাতন এখনও অনেক মফঃস্বলে কি অনায়াস সহজতায় চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু তবুও নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত নারীরাও যে পুরুষতন্ত্রের অধীন, তা এখনও বলা চলে। শিক্ষায়, সম্পত্তিতে, কর্মে মেয়েরা সমান অধিকার পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু পুরষের জীবনচর্যা যেমন নারী-নিরপেক্ষ, অধিকাংশ মেয়ের জীবনচর্যা তেমন পুরুষ-নিরপেক্ষ নয়। নারীবাদ বিষয়ে উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা ও অসহিষ্ণুতা অধিকাংশ পুরুষেরই আছে। নারীবাদ বা ফেমিনিজম্ বা নারীর স্বাধীনতার মূল ধারাটি পুরুষতন্ত্রেরই অধীন থাকবে এরকম একটা মতবাদও প্রচলিত আছে, অর্থাৎ নারীকে কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া হবে, কি কি অধিকার সে অর্জন করবে, তার রাশটি যেন পুরুষেরই হাতে থাকে। অর্থাৎ নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে এক নয়া অনুশাসন জহির করবার প্রয়াস দেখা যায়। 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ — বিমলাকে এরকমই স্বাধীনতা দিয়েছিল। বিমলা যতই বহির্জগতে একলা থেকে নিজের প্রয়াসে নিজেকে সম্পূর্ণ করুক তার কোন হৃদয় দ্বন্দ্ব ক্ষমার যোগ্য নয়। সে যেন একান্তভাবেই পতিব্রতাই থাকবে।

বর্তমান সময়ের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও যে পরিবর্তন ঘটেছে তার সূচনা বিশ শতকের গোড়ায় বাংলা সাহিত্যের লেখকদের লেখায় ধরা দিয়েছে। বনফুল থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, এদের রচনায় পুরুষ নিরপেক্ষ নারীদের চরিত্র সাহিত্যের মাত্রা বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিবারাত্রির কাব্য' অথবা রাজশেখর বসুর 'দাঁড়কাকের গল্পের' মাধ্যমে, বনফুলের 'কষ্টিপাথর' প্রভৃতি গল্পে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ সাহিত্যের মাপকাঠিতে ব্যতিক্রমী বলে মনে করা হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে মহিলা লেখিকাদের লেখাতেও এর উল্টোটা দেখা গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন থেকেই প্রতিবাদের ভাষা ক্রমশ সরব হচ্ছিল। অবশ্য সবাই নয়, কেউ কেউ সরব হচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবীর নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। 'প্রথম প্রতিশ্রুতির' সূচনায় সেকথাই বলে দিয়েছেন লেখিকা :

> *"আজকের বাংলা দেশে অজস্র বকুল পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। বকুল পারুলদের দিদিমা মা পিতামহী এবং প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস। তারা সংখ্যায় অজস্র ছিল না, তারা অনেকের মধ্যে মাত্র এক- আধজন। একলা এগিয়েছে... পথ কাটতে কাটতে হয়ত দিশেহারা হয়েছে, বসে পড়েছে নিজের কাঁটা পথের পথ জুড়ে। আবার এসেছে আর একজন, তার আরব্ধ কর্মভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। এমনি ভাবেই ত তৈরী হল রাস্তা, যেখান দিয়ে আজ বকুল-পারুলরা এগিয়ে চলেছেন।"*

সে পথ তৈরীর ইতিহাস আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুল কথা'। তবে এই পথ তৈরীর ইতিহাস কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তার জন্য ক্ষমতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। সামাজিক রীতিনীতি তথা পুরুষতন্ত্রে ক্ষমতার মোকাবিলা করা কঠিন কাজ। এক সময়ে জোর করে সতী করা হত; তারপর বালবিধবাকে একাদশী পালন ও নিরম্বু উপবাস করান হত; সেই সঙ্গে মেয়েদের লেখাপড়া করা পাপ, বাইরে বেরোনো অপরাধ, পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বলা ঘোরতর অন্যায় ইত্যাদি — পরাধীন রাখার অনেক কিছু প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হত। আশাপূর্ণা ইতিহাস অনুসারে এই সামাজিক মাত্রাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধু সেদিক থেকে বিবেচনা করলে এই উপন্যাস ত্রয়ীকে নারী স্বাধীনতার সহিত্যিক ইতিহাস বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু সমাজ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অনুশাসনগুলির পরিবর্তন হওয়াতে কায়েমী স্বার্থের রূপটিও বদলে যায়। যে সব রীতিনীতি সামাজিক বিচার নিয়ে সত্যবতী বা সুবর্ণলতাকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, সে সব রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ক্ষমতার সঙ্গে যেখানে কায়েমী স্বার্থের যোগাযোগ আছে, সেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত কণ্ঠস্বরের একটা রাজনৈতিক মাত্রাও বর্তমান। সে ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরকে চিহ্নিত করেছেন আশাপূর্ণা। সে ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতার সামাজিক ও রাজনৈতিক মাত্রাটি আজও প্রাসঙ্গিক। নারীপুরুষ ক্ষমতা সম্পর্কে প্রধান ভীতি- সদর—অন্দরের বিভাজন। সেই ধারণা থেকেই মেয়েদের জগৎ অন্দরে। পুরুষের জগৎ সদরে,—এই মতবাদ প্রচলিত। এই বিভাজনেই যে পুরুষতন্ত্রের ভিত প্রস্তুত করা হয়। আশাপূর্ণার উপন্যাসে বা রচনায় সেই অসম লিঙ্গবিভাজনই চিহ্নিত। তাই তাঁর সত্যবতী, সুবর্ণলতারা তাদের ভাই ও স্বামীদের থেকে তুলনায় অনেক বেশী বহির্জগত সচেতন। বাইরের দুনিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত তাদের অনেক বেশী সচেতন করে তোলে। আশাপূর্ণা তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে, বিশেষ করে প্রথম দুটি খণ্ডে নায়িকাদের মধ্য দিয়ে কথাটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রথম খণ্ডে সত্যবতীর প্রতিবাদ অনেকটাই তার কজের মধ্য দিয়ে; আর সুবর্ণলতার প্রতিবাদ — তার ভাবনায়। তার অভিব্যক্তিকে, মেয়েদের স্বভাবকে এমনি ভাবেই যুগ যুগ ধরে লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে কখনো নীরবে, কখনও সরবে প্রতিবাদ করতে হয়েছে।

অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিককাজ বহির্জগতের কাজ। অন্দর-বাহিরের সীমারেখা ভেঙে ফেলে অনেক মেয়েই রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করছে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে বহু নারীর সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ—এই মতের সত্যতা নির্ধারণ করে। পরবর্তী কালে কৃষক আন্দোলন বা তেভাগা আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন বা সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি পৃথক হওয়া সত্ত্বেও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে অস্বীকার করা যায়না। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' সেইরকমই একটি বিশেষ নারীচরিত্র। রাজনৈতিক কর্মী পুত্র কিভাবে তার মাকে নিজের কাজের মাধ্যমে আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থন আদায় করে নেয় তার অসাধারণ দৃষ্টান্ত 'সুজাতা' চরিত্রটি। অকালমৃত সন্তান ব্রতীই তার মনোজগতে বিস্ফোরণ ঘটায়। ব্রতীর জন্মসময় থেকেই স্বামী দিব্যনাথের সঙ্গে যে মানসিক ব্যবধান গড়ে ওঠে, ব্রতীর মৃত্যুতে তাঁর নিজের অস্তিত্ব বা বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘর্ষেই তার পরিসমাপ্তি। সুজাতার মৃত্যুতে উপন্যাস শেষ হয়। ব্রতীর মৃত্যু সুজাতাকে চেতনা দিয়েছে। দিব্যনাথের নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা দেখে সুজাতার চেতনায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। যে কোন মায়ের ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে। মায়ের বুকের হাহাকার নিয়ে তিনি শুধু ব্রতী নয়, সেই সত্তর-একাত্তরের সব ছেলেদের চিনেছিলেন। অবাক হয়ে দেখেছিলেন ওদের অস্তিত্ব-যন্ত্রণা, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অবিচল বিশ্বাস। মায়ের কষ্ট ও যন্ত্রণার ছবি হল 'সুজাতা' এক নারীচেতনার কথা, যা আমরা সাহিত্যে আগে কখনো শুনিনি।

'সুচিত্রা ভট্টাচার্যে'র 'দহন' উপন্যাসের নায়িকা রমিতা সুজাতার মতই এক উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। আলট্রা মডার্ণ চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে পুজো-আচ্চাতেও বিশ্বাস করে। আধুনিকতা মানে যে আত্মসচেতনতা তা তাদের জানা নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করারও তাই সাহস নেই তাদের। তাই রমিতা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না। যদিও এই উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্র রমিতা নয়, ঝিনুক। অবশ্য ঝিনুকের মত হলে ঘরে-

বাইরে শুধু নিন্দেই তোমার প্রাপ্য। অথচ ঝিনুক নারীবাদী নয়। সে নেহাতই সাদাসিধে, সামান্য একটা চাকরি করে। সে অন্যায়ের সাথে আপোষ করে না। পুরুষের যৌনতাঘটিত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। আর সেই অন্যায়ের ফয়সালা যখন আদালত পর্যন্ত গড়ায়, তখন সে তার পাশে কাউকে পায় না। এমনকি প্রেমিককেও না। শুধু বৃদ্ধা ঠাকুমা তাকে সাহস যোগান। কিন্তু শুধু মহামান্য আদালতই নয়, আজকের সমাজের পরিবারের শিক্ষিতা, কর্মরতা মেয়েদের অবস্থান কোনখানে, তা লেখিকা খুঁটিয়ে নির্ণয় করেছেন। আমরা জানি ঝিনুকের বাব-মার ভয় অমূলক নয়। মেয়েদের সম্মান আজ এতটাই ঠুনকো। ঝিনুকের বাবা-মার মনে তাই আদালতের মধ্যে মেয়ের কলঙ্কিত হবার ভয় থাকে। এও এক অস্তিত্বের সঙ্কট।

আশাপূর্ণার সত্যবতীর মেয়েকে লেখা চিঠিতে প্রশ্ন ছিল বিবাহ-প্রতিষ্ঠান নিয়ে। বিবাহের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক বিষয়ে সন্দেহ নিয়ে। তার মেয়ে সুবর্ণলতাও জীবন জুড়ে তিলে তিলে বুঝেছে বিবাহ-প্রতিষ্ঠানই মেয়েদের ভোগ্য বিষয়ে প্রতিষ্ঠা কবার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তাই রাধারাণী দেবীর 'সাবিত্রী' বা 'বিন্দু' বুঝেছে তারা যতই ব্যতিক্রমী থাকুন না কেন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাবার স্পর্ধা বা অধিকার তাদের নেই। বালবিধবা সাবিত্রী তার ভাইঝির বিয়েতে বুঝতে পারল যে তার বেশবাস শুধুই ফাঁকি মাত্র। দয়া বা সহানুভুতি থেকে উৎপন্ন। সে সমাজের বা পরিবারের চোখে বাঞ্ছিত নয। তাই শেষে সে চিৎকাব করে প্রতিবাদ জানাল।

'বিন্দু' তার কুমারীজীবন থেকে বিবাহিত জীবনে পৌঁছে দেখল সবই তাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে হয়েছে। শেষে পিসিশাশুড়ির হাতে শাঁখা-সিঁদুর মুছে বৈধব্য বেশ ধারণও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে।

'রাণী' অসাধারণ রূপবতী হওয়া সত্ত্বেও ভাগ্যের ফেরে মাতাল স্বামীর হাতে পড়ে স্বামীরই বন্ধুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করার সময় বুঝে যায় যে সে আর একজন পুরুষের কামনার শিকার হতে চলেছে। কিন্তু সমাজের কাছে নিরুপায় হয়ে তাকে এই পথ অবলম্বন করতে হয়। তাই 'অপরাজিতার'র কবিতা যতই আপ্লুত করুক না কেন মেয়েদের প্রকৃত অবস্থা কিন্তু এই গল্পগুলির মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

আজকের মেয়েরা পুরো একটা মানুষ হয়ে উঠতে চায়। আজকের সামাজিক জীবনে বা সাহিত্যে কখনও যদি দুয়ের মধ্যে সংঘাত বাধে মেয়েরা মানুষ হিসেবে তার জীবন সত্যটিকে চিহ্নিত করতে পারে। অনিতা অগ্নিহোত্রির 'খণ্ডলডিহার দিনে'র কমলিকা বা বাণী বসুর 'কাছের মানুষ'-এর প্রধান নারীচরিত্রগুলি ব্যক্তি ও সামাজিক সংঘর্ষে ব্যক্তিজীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছে। যেখানে মেয়েরা সৃষ্টিশীল বা খ্যাতিমান, পুরুষ অহং-এর সঙ্গে সংঘর্ষ যেখানে বেশী, সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ অবধারিত। তারপর পূর্ব বিবাহের সন্তানদের নিয়ে সমস্যা, নতুন সম্পর্কের সঙ্গে সন্তানের সংঘর্ষ। ইদানীংকালে গল্প-উপন্যাস-

কবিতায় এসব সমস্যা প্রধান উপজীব্য। সম্বন্ধের টানাপোড়েনে মেয়েরা এতদিন মূক হয়ে থাকত। আজ বিভিন্ন অধিকার সচেতন হওয়ার ফলেই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে 'ইগো'র সমস্যাও প্রবল। তবুও সব টানাপোড়েনের পর শেষ অবধি অবশিষ্ট থাকে সম্পর্কের রেশ, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। নারী-পুরুষ উভয়েই কিভাবে এই সংঘর্ষের সমাধান করে সাহিত্য বা জীবনে, তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এই অপেক্ষার মধ্যেই থাকবে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।[১]

কিন্তু তবু আজকের নারীর কাছে —

> *'নিছক প্রেমের সাফল্যের চাইতে বড় হয়ে উঠছে তাদের মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তাদের লড়াই, তাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান। সাম্প্রতিক কালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের "দহন" উপন্যাসটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ। চিরাচরিত নায়িকার অভিমানের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে সচেতন নারীর মনুষ্যত্বের অভিমান।'* [২]

তথাপি এ সোচ্চার উচ্চাহরণ একান্তই সত্য যে ভালোবাসা চিরসত্য, অপরাজেয় তবে কি না :

> *'কবি হওয়ার মত প্রেমিক হওয়ার জন্যও থাকে কিছু বিশেষ অন্তর্গঠন। কোনও-না-কোনও সময় প্রেম প্রত্যেকের জীবনেই ধরা দেয়। কিন্তু প্রেমকে অস্তিত্বে নিতে পারে কজন? প্রেম আনন্দের, প্রেম বেদনার, কিন্তু প্রেমই একমাত্র যা নিঃশর্তে অর্পণ করা যায়। প্রেমই একমাত্র যা শেষ পর্যন্ত শান্তি দিতে পারে।*
>
> *যা কিছু বলেছি আমি মধুর অস্ফুটে*
> *অস্থির অবগাহনে তোমারি আলোকে —*
> *দিয়েছ উত্তর তার নব পত্রপুটে*
> *বুদ্ধের মূর্তির মতো শান্তি দুই চোখে।*

গ্রন্থপঞ্জী: ষষ্ঠ অধ্যায়

১. তনিকা সরকার — দেশ: মার্চ: ১৯৯৯
২. পশ্চিমবঙ্গ — শিবনাথ শাস্ত্রী সংখ্যা: ১৪০৬
৩. রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন ১ এবং ২
৪. তসলিমা নাসরিন ও নারী — দেশ: ১৯৯৯
৫. বঙ্গের মহিলা কবি: যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৬. স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য — পশুপতি শাসমল
৭. সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান
৮. 'পূর্বকথা': প্রসন্নময়ী দেবী (সুবর্ণরেখা)
৯. 'পূর্বকথা': প্রসন্নময়ী দেবী (আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশন)
১০. 'ভারতী': আশ্বিন ১৩২৩
১১. 'কণকাঞ্জলি': মানকুমারী বসু
১২. বঙ্গ সাহিত্য অভিধান: হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
১৩. 'রেণু' — প্রিয়ম্বদা দেবী
১৪. 'শতগান' — সরলা দেবী
১৫. 'মর্মগাথা' — নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী
১৬. 'আলো ও ছায়া' — কামিনী রায়
১৭. 'শনিবারের চিঠি': ১৩৩৫
১৮. নারী জাগৃতি ও বাংলা সহিত্য — ড. জ্ঞানেশ মৈত্র
১৯. উনিশশতকে নারীমুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য — রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
২০. নারী প্রগতি — আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী — গোলাম মোরশেদ